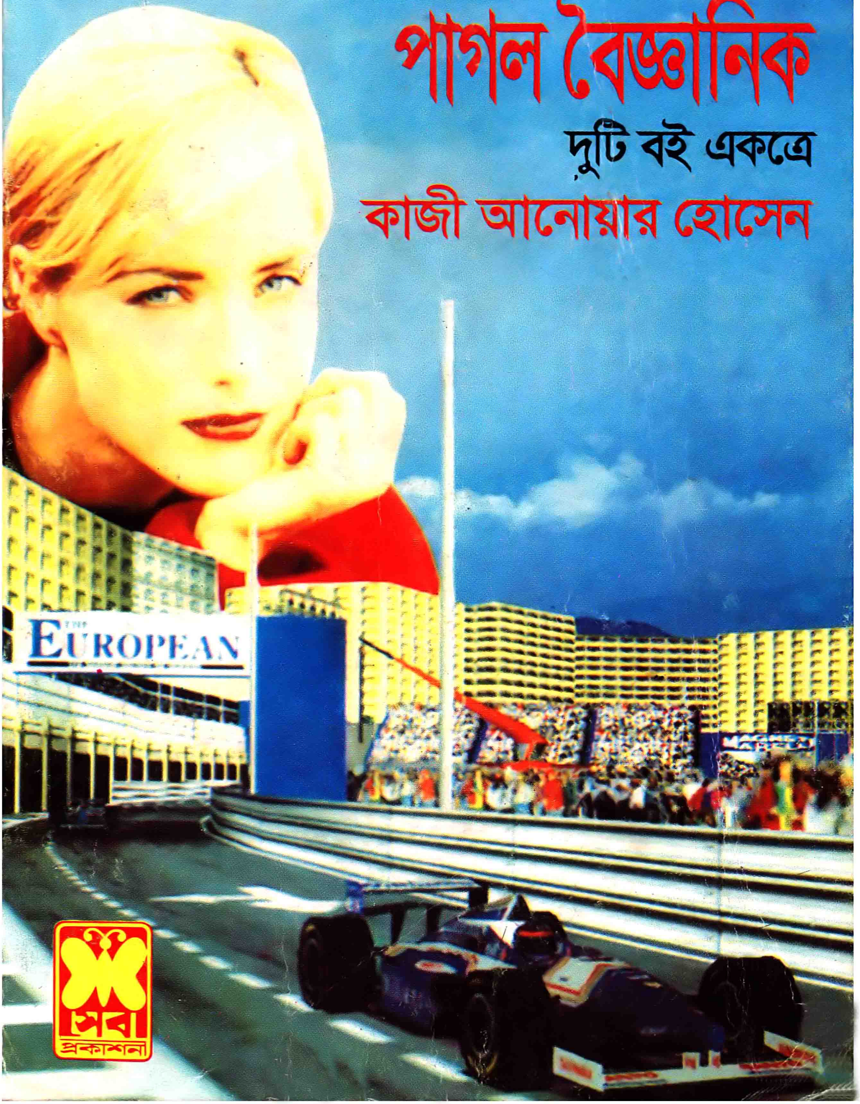
মাসুদ রানা

সতর্ক শয়তান

পাগল বৈজ্ঞানিক

দুটি বই একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

কাজী আনোয়ার হোসেনের

মাসুদ রানা

[দুটি বই একত্রে]

সতর্ক শয়তান

এক বোনের অনুরোধে রানা যোগ দিল গ্র্যান্ডপ্রিক্স রেসিং টীমে। পর পর ছ'টা বিজয়ের পরই শুরু হলো আক্রমণ। রানার মৃত্যু কামনা করছে কারা যেন। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হলো গভীর এক চক্রান্ত। ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। জগৎজোড়া খ্যাতির শিখর থেকে নেমে আবার হারিয়ে গেল জনসমুদ্রে।

পাগল বৈজ্ঞানিক

বহুদিন বিদেশে কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে দেশে ফিরে আসছিল রানা—পরদিন রিজার্ভ করা হয়েছে প্লেনের সীট। এমনি সময়ে ইলেকট্রনিকসের এক দোকানের সামনে দেখা পেল সে কবির চৌধুরীর। রানার চিরশত্রু কবির চৌধুরী। সেই আশ্চর্য প্রতিভাবান পাগল বৈজ্ঞানিক কবির চৌধুরী।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ৪১, ৪৬

সতর্ক শয়তান + পাগল বৈজ্ঞানিক

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

মাসুদ রানা

সতর্ক শয়তান

পাগল বৈজ্ঞানিক

(দুটি বই একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7609-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৬
দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭৮-১৯০২০৩

Masud Rana
SHATARKA SHAYTAN
PAGOL BOIGYANIC
Two Thriller novels
By: Qazi Anwar Husain

ছেচল্লিশ টাকা

মাসুদ রানার ভলিউম

১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৪/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৪/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৫০/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৪৬/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৬২/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫	আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৮-১৮৯-১৯০	শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৫৪/-
১৯১-১৯২	দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৯৫-১৯৬	ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
১৯৭-১৯৮	তিক্ত অবকাশ-১.২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০	ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২	আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২০৩-২০৪	অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭	জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৫৩/-
২০৮-২০৯	সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১	গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪	নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২১৭-২১৮	অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০	দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২	কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪	কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬	নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮	বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০	স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩	রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৩৪-২৩৫	অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭	ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯	নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১	সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২৪২-২৪৩-২৪৪	কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৪৫-২৪৬	নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৫৪-২৫৫	সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭	অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪	হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫	রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৬৯-২৮৫	বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১	অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩	মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫	প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৪৬/-
২৭৬-২৯১	মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪১/-
২৭৯-২৮২	মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৪৭/-
২৮০-২৮৯	ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭	আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪২/-
২৮৩-২৮৮	দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৩৮/-
২৮৪-৩১২	মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৯২-২৯৮	রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪	কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭	বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬	শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮	কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪০/-
৩০০-৩০২	বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-

সতর্ক শয়তান

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৭৭

এক

ক্লারমন্ট-ফেরাল্ড রেসট্র্যাকের পাশে উঠে বসল রক্তাক্ত মাসুদ রানা। সাদা ওভারলে রক্তের ছোপ।

দুপুরের কড়া রোদ। কিন্তু জোর বাতাস। লম্বা চুল বাতাসে উড়ে ঢেকে ফেলেছে ওর মুখের একাংশ। চকচকে পিকক-ব্লু হেলমেটটা লোহার দস্তানা পরা দুই হাতে এমন ভাবে চেপে ধরে আছে, মনে হচ্ছে দুমড়ে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে সে ওটাকে। থরথর কাঁপছে হাত দুটো, মাঝে মাঝে সর্বশরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে ঝাঁকুনি লেগে।

ব্লু অ্যাঞ্জেল পিটের কাছে চার হাত-পা শূন্যে তুলে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ওর গাড়িটা। চাকাগুলো ঘুরছে এখনও। সামান্য ধোঁয়া বেরোচ্ছে ইঞ্জিন থেকে, কিন্তু ইতিমধ্যেই ফায়ার এক্সটিঙ্গুইশারের ফেনা ঢেকে ফেলেছে ওটাকে—ফুয়েল ট্যাংকে আগুন লেগে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা নেই আর। দৈবগুণে উল্টাবার ঠিক আগের মুহূর্তে ঝাঁকি খেয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেছে সে গাড়ি থেকে।

সবচেয়ে আগে রানার কাছে পৌঁছল প্রবীণ সাংবাদিক জেমস মিচেল। দেখল, নিজের গাড়ি দেখছে না রানা—স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে দুশো গজ দূরে দাঁড়ানো একটা ফেরারীর দিকে। কমলা রঙের গ্র্যান্ডপ্রিক্স [ফরাসী উচ্চারণ গ্রাঁ-প্রি] ফর্মুলা ওয়ান রেসিং কারটাকে ঘিরে রেখেছে কমলা রঙের আগুন। ককপিটে খাড়া হয়ে বসে আছে আলফ্রেড গার্বার। মারা গেছে আগেই, এখন ভস্ম হয়ে যাচ্ছে দাউ দাউ চিতার আগুনে। বাতাসে আগুনের শিখা ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে কয়লার মত কালো পোড়া দেহটা। মাথায় হেলমেট। বুম শব্দে বিস্ফোরণ হলো। পরমুহূর্তে সাদা হয়ে গেল কমলা রঙের আগুন।

পাথরের মত জমে গেছে হাজার হাজার দর্শক। মন্ত্রমুগ্ধ। বিস্ফারিত আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সবাই জ্বলন্ত গাড়িটার দিকে। একটি টুঁ শব্দ নেই কারও মুখে। রেস-মার্শালদের পাগলের মত ফ্ল্যাগ নাড়তে দেখে থেমে গেছে প্রতিযোগীরা—আজকের মত রেস স্থগিত।

মাইক নিশ্চুপ। সাইরেন বাজিয়ে রেসট্র্যাকের উপর দিয়ে ছুটে এল অ্যাম্বুলেন্স, থেমে দাঁড়াল নিরাপদ দূরত্বে। মাথার উপরে চক্রাকারে ঘুরতে থাকা ফ্ল্যাশিং লাইটটা নিষ্প্রভ হয়ে গেল পিছনের তীব্র সাদা শিখার ঔজ্জ্বল্যে। ফায়ার-ব্রিগেডের কয়েকজন অ্যালুমিনিয়াম অ্যাসবেস্টস স্যুট পরে ফায়ার

এক্সটিঙ্গুইশার হাতে চেষ্টা করছে জ্বলন্ত গাড়িটার কাছে পৌঁছতে, পোড়া লাশটা বের করে আনতে। কাজটা নিঃসন্দেহে যুক্তিহীন এবং বিপজ্জনক—তবু চেষ্টা করছে। স্থির মস্তিষ্কে নেই কেউ এখন। আসলে অ্যাম্বুলেন্সের উপস্থিতিও এই মুহূর্তে অবান্তর। অনেক আগেই মারা গেছে আলফ্রেড গার্বার, কারও সাহায্যই কোন উপকারে আসবে না ওর এখন।

দৃষ্টিটা সরিয়ে রানার রক্তাক্ত মুখের দিকে চাইল মিচেল। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে রানা জ্বলন্ত গাড়িটার দিকে। হেলমেট চেপে ধরা হাত দুটো তেমনি কাঁপছে থরথর। রানার ধবধবে সাদা রেসিং ওভারলের কাঁধে হাত রাখল মিচেল, মৃদু ঝাঁকুনি দিল, কিন্তু কিছুই টের পেল না রানা। জখম হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করল মিচেল, শুনতেই পেল না সে। ভয় পেয়ে জোরে ঝাঁকি দিল সে রানার কাঁধে। চমকে মিচেলের দিকে চোখ ফেরাল রানা, চোখের পাতা ফেলল বার কয়েক—যেন দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল ওর এই মাত্র, প্রশ্নের উত্তরে মাথা নাড়ল।

একটা স্ট্রেচারের দু'মাথা ধরে দৌড়ে আসছিল অ্যাম্বুলেন্সের দু'জন লোক ওর দিকে, হাত নেড়ে বারণ করল রানা। উঠে দাঁড়াল। একটু টলে উঠতে দেখে চট করে ওর একটা হাত ধরে ফেলল মিচেল, ধীরে ধীরে এগোল ওরা ব্লু অ্যাঞ্জেল পিটের দিকে। অনিশ্চিত পদক্ষেপে এগোচ্ছে হতভম্ব রানা। রোগা, লম্বা, পক্বকেশ সাংবাদিক মিচেল চলেছে উদ্বিগ্ন বিচলিত পদক্ষেপে, চোখেমুখে উৎকণ্ঠা, বারবার রিমলেস চশমাটা ঠিক করছে নাকের উপর।

পিট থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল জুলিয়া, থমকে দাঁড়াল রানার সামনে, বিস্ফারিত চোখে দেখল রানাকে আপাদমস্তক। কিছু বলবে বলে মুখ খুলল কিন্তু কি ভেবে থেমে গেল। রানার একটা হাত ধরতে যাচ্ছিল জুলিয়া, ছাড়িয়ে নিল রানা। উদভ্রান্ত পদক্ষেপে এগোল পিটের দিকে।

পিটের মুখে একটা ফায়ার এক্সটিঙ্গুইশার হাতে দাঁড়িয়ে চীফ মেকানিক ব্রনসনকে দু'একটা সংক্ষিপ্ত আদেশ দিচ্ছিল ব্লু অ্যাঞ্জেল টীমের একাধারে মালিক ও ম্যানেজার কোটিপতি মাইকেল হ্যামার, রানাকে দেখে হাতের সিলিন্ডারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে এগিয়ে এল দু'হাত বাড়িয়ে। বিশাল চেহারার বৃদ্ধ জড়িয়ে ধরল রানাকে।

'স্টেডি, মাই বয়! স্টেডি! নার্ভটা ঠিক রাখো। দুর্ঘটনা রেসট্র্যাকে হবেই। বিচলিত হলে তো চলবে না, মরিস। সামলে নাও নিজেকে।'

কোন জবাব দিল না রানা। কাঁপা হাতে মৃদু ধাক্কা দিয়ে আলিঙ্গনমুক্ত হলো সে, ঢুকে পড়ল পিটের ভিতর। মাইকেল হ্যামার ছুটল উল্টানো গাড়িটার দিকে। চলায় চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতা। রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেছে সে কর্তব্যকর্মের জন্যে। অনেক কাজ পড়ে আছে তার। গত বিশটা বছর ধরে যোগ্যতার সাথে পরিচালনা করছে এই খেলোয়াড়-বৃদ্ধ ব্লু অ্যাঞ্জেল টীম, অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তুলেছে এটাকে পৃথিবীর সেরা টীম হিসেবে। বয়সকালে নিজেও ছিল একজন নামজাদা নির্ভীক

ড্রাইভার। নেশা বলতে শুধু দুটো জিনিস—গাড়ি আর বুড়ি। প্রত্যেকটা গ্র্যান্ডপ্রিক্সের পর পরই একবার করে মার্সেই ছুটে গিয়ে স্ত্রীকে দেখে আসা চাই। ভদ্রলোক নিঃসন্তান। ভয়ানক কড়া। হাতুড়ীর মতই শক্ত। কিন্তু তার কঠোর বর্মের নিচে যে একটা আশ্চর্য স্নেহপ্রবণ কোমল প্রাণের ফল্গুধারা রয়েছে সেটা চেষ্টা করেও চেপে রাখতে পারে না কিছুতেই—মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়ে যায়।

ব্লু অ্যাঞ্জেল পিটের এক কোণে রাখা একটা কাঠের বাক্সের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। মেকানিকদের জন্যে পোর্টেবল বার। বরফের বাক্সে কয়েক বোতল বিয়ার ও সেভেন আপ রয়েছে। একজোড়া শ্যাম্পেনের বোতলও রয়েছে এক পাশে। পর পর দুটো গ্র্যান্ডপ্রিক্সে জয়ী হলে বিজয়ীকে শ্যাম্পেনের জোড়া বোতল উপহার দিয়ে সম্বর্ধনার রেওয়াজ প্রচলিত আছে। আজও রানার জন্যেই রাখা ছিল ওগুলো। গত দুই মাসে পর পর ছ'টা গ্র্যান্ডপ্রিক্সে যে লোক বিজয়ী হয়েছে এবারও যে সে-ই এগুলো পাবে তাতে কারও মনেই কোন সন্দেহ ছিল না—মাঝখান দিয়ে ঘটে গেল এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা।

রানাকে একটা ব্র্যান্ডির বোতল তুলে নিতে দেখে আঁৎকে উঠল মিচেল ও জুলিয়া। কিন্তু কোনদিকে লক্ষ নেই রানার। কাঁপা হাতে গ্লাসে ঢালছে সে সোনালী তরল পদার্থ। বোতলের মুখটা বাড়ি খাচ্ছে গ্লাসের কানায়। বেশির ভাগই পড়ে গেল মাটিতে। গ্লাসটা অর্ধেক ভরে চুমুক দিল রানা। দুই হাতে ধরেছে গ্লাসটা কাঁপুনি কমাবার জন্যে। সামান্য একটু নামল ওর গলা দিয়ে, বেশির ভাগই পড়ে গেল কষা বেয়ে। খালি গ্লাসের দিকে চেয়ে রইল সে কয়েক সেকেন্ড, ধপ করে একটা বেঞ্চের উপর বসে আরও ব্র্যান্ডি ঢালছে গ্লাসে।

মেকানিকদের কাজ বুঝিয়ে দিয়েই ফিরে এল মাইকেল হ্যামার। রানার হাতে ব্র্যান্ডির বোতল দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। রক্তশূন্য হয়ে গেল সজীব, প্রাণবন্ত মুখটা। চট করে চাইল থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জেমস মিচেলের দিকে। ব্যাপার কি? মদ খাচ্ছে গ্র্যান্ডপ্রিক্স ড্রাইভার! অথচ গত দুটো মাসে সম্বর্ধনার সময় সবার সামনে শ্যাম্পেনের গ্লাসে এক-আধ চুমুক দেয়া ছাড়া অ্যালকোহল স্পর্শ করতে দেখেনি কেউ ওকে।

চট করে চারদিকটা দেখে নিল একবার মাইকেল হ্যামার। না, কেউ দেখে ফেলেনি। মিচেলকে দিয়ে ভয়ের কিছুই নেই, ব্লু অ্যাঞ্জেলের এত বড় বন্ধুর দ্বারা ওর কোন ক্ষতি হবে না। মিচেল না হয়ে যদি অন্য কোন সাংবাদিক হত তাহলে আজই খতম হয়ে যেত মরিস রেনারের ক্যারিয়ার, কানা হয়ে যেত ব্লু অ্যাঞ্জেল।

ভেঙে পড়ল নাকি ছেলেটা? এ-ও শেষ হয়ে গেল আর সবার মত? আগে হোক, পরে হোক ঘটবেই এটা। অনেক দেখেছে হ্যামার। যত সাহসীই হোক না কেন, যত শান্ত, যত দক্ষ ড্রাইভারই হোক, একটা সময়ে ভেঙে পড়তেই হবে। এটাই রেসট্র্যাকের ট্র্যাজেডি। যে যত ঠাণ্ডা, তার ভেঙে পড়াটা ততই মারাত্মক। অনেক বড় বড় গ্র্যান্ডপ্রিক্স ড্রাইভার নেমেছে মাঠে—কিন্তু

রেসট্র্যাকের তীব্র স্নায়বিক চাপে খোলসে পরিণত হয়েছে কয়েক বছরের মধ্যেই। হয় ক্র্যাশ করে মরেছে বা পঙ্গু হয়ে গেছে, নয়তো বাকি জীবন বয়ে বেড়িয়েছে নিজের খোলসটা। কিন্তু দুটো মাসও গেল না, এতই তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল এই হীরের টুকরো ছেলেটা?

মাইকেল হ্যামার দোষ দেয় না কারও। সব মানুষেরই সহ্যের একটা সীমা আছে। রেসট্র্যাকে কি প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে কাজ করতে হয় এদের জানা আছে তার। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, নিস্তার নেই ছেলেটার, আলফ্রেড গার্বারের পোড়া লাশ ঘুমোতে দেবে না ওকে বেশ অনেকদিন। চমকে জেগে উঠবে দুঃস্বপ্ন দেখে। কাটিয়ে উঠতে পারবে না মরিস ধাক্কাটা?

রানাকে ব্র্যান্ডির গ্লাসে চুমুক দিতে দেখে চোখ সরিয়ে নিল হ্যামার। মাথা নাড়ল এপাশ ওপাশ। মিচেলকে বেরিয়ে আসার ইঙ্গিত করে নিজেও বেরিয়ে গেল বাইরে। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অনেক কিছু আশা করেছিল সে এই ছেলেটার কাছে। পলের মৃত্যুর পর টীমটা যখন ধ্বংস হতে বসেছিল, সেই সময় উদয় হয়েছিল ওর। অনেক আপত্তির ঝড় ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছে ওকে গত দুটো মাস। আপত্তি উঠেছিল, মরিস রেনারের গাড়ি চালানোটা অন্যান্য ড্রাইভারদের জন্যে বিপজ্জনক, ওর বেপরোয়া ড্রাইভিং দেখে ভয়ে রাস্তা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে সবাই। ড্রাইভিং মিররে রেনারের নীল গাড়িটাকে দেখলেই সাইড দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে প্রত্যেকে। এরকম ভয়ঙ্কর লোককে বের করে দেয়া দরকার গ্র্যান্ডপ্রিক্স থেকে। কিন্তু কমিটির বৈঠকে এসব অভিযোগ কোনটাই টেকেনি। রেনারের গাড়ি চালনায় কোথাও কোন খুঁত দেখাতে পারেনি কেউ। সাইড দেয়ার প্রশ্নটাও অবান্তর বলে প্রমাণিত হয়েছে, কারণ বেশির ভাগ সময়েই বিজয়ের সহজ একটা নিয়ম অনুসরণ করে লোকটা—প্রথমেই সবাইকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং এগিয়ে থাকা। টার্নিঙের সময় লোকটা বেপরোয়া ঠিকই, কিন্তু সেখানে তার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছে সে, আর কারও নয়। 'ইস্পাতের স্নায়ু' বলে ডাকতে শুরু করেছিল ওকে ইদানীং সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা। আবার ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হ্যামার। তুলোর স্নায়ুতে পরিণত হতে যাচ্ছে ও এখন। নাকি সামলে নিতে পারবে এবারের মত?

তৃতীয়বার বোতলটা হাতে তুলে নিল রানা। একই ভাবে কাঁপছে ওর হাত। এবার আর গ্লাসে না ঢেলে বোতল থেকেই ঢোক গিলবার চেষ্টা করল সে। কাপড় ভিজে গেল ব্র্যান্ডি পড়ে। একটা বালতিতে করে পানি নিয়ে এল জুলিয়া। পানিতে স্পঞ্জ ডুবিয়ে রানার মুখের রক্ত পরিষ্কার করতে শুরু করল। নির্বিকার ভঙ্গিতে মদ খেয়ে চলল রানা, কে কি করছে কোনদিকে কোন খেয়াল নেই। সব ভুলে যাওয়ার পণ করেছে যেন ও।

জেমস মিচেলের সাথে চোখাচোখি হলো জুলিয়ার। এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে মুখ বিকৃত করল প্রবীণ সাংবাদিক। বেরিয়ে গিয়ে হাত রাখল মাইকেল হ্যামারের কাঁধে।

'চলো মাইক, এনকোয়েরি রিপোর্টটা দেখে আসা যাক।'

রওনা হয়ে গেল দু'জন। এতক্ষণে বৈঠক শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। ব্লু অ্যাঞ্জেলের প্রতিনিধির অনুপস্থিতি বেখাপ্পা ঠেকবে সবার চোখে।

'রিপোর্ট কি হবে সে তো জানাই আছে। তবু চলো। নিজের চোখে দেখা যাবে ঘটনাটা।'

অফিশিয়াল রেস এনকোয়েরির রিপোর্ট আবছা থাকে চিরকালই। কারও ঘাড়ে পুরো দোষ চাপাতে পারে না। সেটা সম্ভবও নয়। বছর কয়েক আগে এক দুর্ঘটনায় তেহাত্তর জন দর্শক মারা পড়ল—কিন্তু হাজার হাজার দর্শক যে-ব্যাপারটা নিজচোখে দেখেছিল, একবাক্যে সাক্ষ্য দিতে রাজি ছিল, নিঃসংশয়ে দোষী সাব্যস্ত করেছিল যাকে, সেই ড্রাইভারকেও নির্দ্বিধায় দোষী বলতে পারেনি তারা। যেখানে হাজারো কলকজা দিয়ে তৈরি একটা যন্ত্রদানব নিয়ে কারবার, সেখানে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। কয়েক মাস আগে এই ব্লু অ্যাঞ্জেল টীমেরই পল কার্টারেট মারা পড়ল, রেসট্র্যাক ছেড়ে গাড়ি নিয়ে গুঁতো খেল গিয়ে এক বিশাল উইলো গাছের সঙ্গে, পঙ্গু হয়ে গেল দু'জন দর্শক—কিন্তু দোষ পাওয়া যায়নি কারও।

এক্ষেত্রেও পুরো দোষ ইটালিয়ান ড্রাইভার মরিস রেনারের—এ ব্যাপারে যদিও হাজার হাজার দর্শকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, ওর বিরুদ্ধে চার্জ আনতে পারল না এনকোয়েরি কমিটি। সদস্যদের সামনে সাত-আট বার টি.ভি. রীলটা দেখানো হলো। পরিষ্কার দেখা গেল আধ মিনিটের ঘটনাটা।

তিনটে গ্র্যান্ডপ্রিক্স গাড়ি বেরিয়ে গেল সাঁ করে। টেলিস্কোপিক জুম লেন্স অনুসরণ করছে ওদের পিছন থেকে। রানার ব্লু অ্যাঞ্জেল এগিয়ে যাচ্ছে সামনের একটা ফেরারীকে ওভারটেক করবার জন্যে। গাড়িটা রানাকে পরাজিত করে যে আগে গেছে তা নয়, এক চক্কোর পিছনে পড়েছে বেচারা। রানার পিছনে রানার চেয়েও দ্রুত এগোচ্ছে আর একটা কমলা রঙের ফেরারী, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আমেরিকান ড্রাইভার আলফ্রেড গার্বারকে। সোজা সামনে ফাঁকা জায়গা পেয়ে গার্বারের বারো সিলিন্ডারের ফেরারী রানার আট সিলিন্ডারের ব্লু অ্যাঞ্জেলের চেয়ে দ্রুত যাবে সেটাই স্বাভাবিক। সেই সুযোগটাই নিতে যাচ্ছে গার্বার। স্পষ্ট বোঝা গেল রানাও জানে সেটা। মুহূর্তের জন্যে ব্রেক লাইট জ্বলে উঠল ব্লু অ্যাঞ্জেলের। সামনের ফেরারীকে ওভারটেক করবার চেষ্টা না করে গতি একটু কমাল রানা গার্বারকে সাইড দেয়ার জন্যে।

হঠাৎ, রানার ব্রেক লাইট নিভে যাওয়ার প্রায় সাথে সাথেই, ব্লু অ্যাঞ্জেল সরে গেল খানিকটা। মনে হচ্ছে যেন রানা হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছে গার্বার ওকে ওভারটেক করবার আগেই ও সামনের গাড়িটাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারবে। যদি ভুল হয়ে থাকে ঠিক এইখানেই ভুল হয়েছে রানার। কারণ, এর ফলে ব্লু অ্যাঞ্জেল চলে এল একশো আশি মাইল বেগে এগিয়ে আসতে থাকা ফেরারীর যাত্রা পথে। ব্রেক চাপা বা পাশ কাটা, কোনকিছু করবারই সুযোগ পেল না গার্বার।

ব্লু অ্যাঞ্জেলের পেটে গুঁতো মারল গার্বারের ফ্রন্ট হুইল। তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ, মারাত্মক ভাবে পাক খেতে শুরু করল ব্লু অ্যাঞ্জেল, ডিগবাজি খেতে শুরু করল পাগলের মত। আর গুঁতো মারবার সাথে সাথেই রাইফেলের গুলির আওয়াজ তুলে ফাটল ফেরারীর একটা চাকা। মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল ফেরারী! চিন্তাশক্তিবর্জিত মারাত্মক এক যন্ত্রদানবে পরিণত হয়েছে ওটা। সেফটি ব্যারিয়ারে গিয়ে ধাক্কা খেল, সেখান থেকে ক্যারম বোর্ডের গুটির মত ওপাশের সেফটি ব্যারিয়ারে গিয়ে ধাক্কা খেল পিছন দিকটা। তখনও গতি কমপক্ষে একশো মাইল ঘণ্টায়। আগুনের লকলকে শিখা দেখা যাচ্ছে গাড়ির চারপাশে। এবার ডিগবাজি খেতে শুরু করল ফেরারী, বার কয়েক পাক খেল এক চাকায় ভর দিয়ে, আরও দুটো ডিগবাজি খেয়ে দুশো গজ দূরে চার চাকার উপর থেমে দাঁড়াল। ককপিটে খাড়া হয়ে বসে আছে গার্বার। কয়েক সেকেন্ড পরেই সাদা হয়ে গেল কমলা রঙের আগুন। মারা গেল আলফ্রেড গার্বার।

গার্বারের মৃত্যুর ব্যাপারে কে দায়ী সে সম্পর্কে কারও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। চোখের সামনে দেখা গেল মৃত্যু ঘটেছে ওর মরিস রেনারের বেপরোয়া গাড়ি চালনার ফলেই। কিন্তু পর পর ছ'টা গ্র্যান্ডপ্রিক্সে যে লোক বিজয়ী হয়েছে তাকে গাফিলতির দায়ে দোষী করা এক কথায় অসম্ভব। সে যে পৃথিবীর সেরা ড্রাইভারদের একজন সেটা কারও বলে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই ব্যাপারটাকে অনিচ্ছাকৃত দৈব দুর্ঘটনা বলেই চাপা দেয়ার ব্যবস্থা হলো।

শুধু তিনজন জানল, ব্যাপারটা দৈব বা দুর্ঘটনা কোনটাই ছিল না। ছিল নিষ্ঠুর এক হত্যাকাণ্ড!

দুই

ঠিক দু'মাস আগের কথা।

রোম থেকে সালেহীনের ঝকঝকে ল্যান্সিয়াটা নিয়ে লেগহর্নের দিকে চলেছিল রানা। বেলা তিনটে। যাবে প্যারিস। উদ্দেশ্য: ফিলিপ কার্টারেট নামের এক খচ্চর বুড়োকে ভজিয়ে তার সাহায্য নিয়ে অ্যামস্টার্ডামে কিছু কাজ করা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে পাঠানো হয়েছে ওকে বুড়োর সহযোগিতা আদায় করবার জন্য। ভদ্রলোক আগে ছিল ফ্রান্সের ডুক্সেম ব্যুরোর চীফ। কিন্তু রিটায়ার করবার সাথে সাথেই আরও দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার কাঁধে। বুড়ো এখন ইন্টারপোলের নারকোটিক সেকশনের চীফ। নেপাল এবং বার্মা থেকে বাংলাদেশ হয়ে বে-আইনী মাদকদ্রব্যের বিরাট সব কনসাইনমেন্ট চালান যাচ্ছে বাইরে। এদিকের ট্র্যাফিক চ্যানেল জানা হয়ে গেছে, কিন্তু এদেশ থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়ে, কাদের সাহায্যে, কিভাবে জিনিসগুলো সারা দুনিয়ায় ছড়াচ্ছে বোঝা যাচ্ছে

না। নেদারল্যান্ডে গিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। পুরো দলটাকে ধরতে না পারলে শুধু বাংলাদেশে জনাকয়েককে গ্রেপ্তার করে লাভ নেই। আবার একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করে নেবে ওরা, ভিন্ন কোন পদ্ধতিতে চলতেই থাকবে এই চোরাচালান।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, নেদারল্যান্ডে গিয়ে বাংলাদেশের এজেন্টের পক্ষে কাজ করবার তেমন কোন সুবিধে নেই। ওখানকার স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের ঘনিষ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা দরকার হবে। সেটা চাইতে পারে না বাংলাদেশ। কোন দেশই পারে না। ওদের যোগ্যতার প্রতি কোনরকম কটাক্ষ করা যায় না। একমাত্র ইন্টারপোল কিছুটা সুবিধে পেয়ে থাকে জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্ত যে কোন দেশে কাজ করবার ব্যাপারে।

কাজেই ঘুরপথে যেতে হচ্ছে রানাকে। যদি ফিলিপ কার্টারেটের সহযোগিতা পাওয়া যায় তাহলেই শুধু কাজ করা সম্ভব হবে অ্যামস্টার্ডামে। যদিও সাহায্য পাওয়ার আশা খুবই কম, কট্টর বুড়ো নাকি পেরেকের চেয়েও শক্ত, কোন রকম বেখাপ্পা আবদার-অনুরোধ-উপরোধের ধার ধারে না। রানার আগেও এসেছিল একজন বাংলাদেশ থেকে, ফিরে গেছে বিফল হয়ে—তবু চেষ্টা করে দেখবার জন্যে পাঠানো হয়েছে রানাকে। চাওয়াটা সাদামাঠা কিছু হলে তেমন কোন অসুবিধে ছিল না, কিন্তু মেজর জেনারেল রাহাত খান যেভাবে কাজটা করাতে চান তাতে ইন্টারপোলকে রাজি করানো রীতিমত কঠিন হবে। নিয়মের বাইরে যেতে চাইবে না তারা কিছুতেই।

সহজ ভঙ্গিতে গাড়ি চালাচ্ছে রানা আর মনে মনে প্ল্যান আঁটছে কিভাবে রাজি করাবে বুড়োকে। এটা না হলে ওটা, ওটা না হলে সেটা—একের পর এক প্ল্যান আসছে ওর উর্বর মস্তিষ্কে, কিন্তু টিকছে না কোনটাই। কিছুতেই যখন বুড়োকে বাগে আনা যাচ্ছে না, রানার গলদঘর্ম হওয়ার জোগাড়, এমনি সময়ে চমকে উঠল সে কানের কাছে হর্নের শব্দ শুনে।

চট করে নিজের স্পীডমিটারের দিকে চাইল রানা। একশো কিলোমিটার। ওর জানা আছে, এটাই এ রাস্তার সর্বাধিক গতিসীমা। তাহলে আবার সাইড চাইছে কেন? রিয়ার ভিউ মিররে কিছুই দেখা গেল না, পাশাপাশি চলে এসেছে গাড়িটা। ঝকঝকে নীল এক অ্যাস্টন মার্টিন। সাঁ করে এগিয়ে গেল।

একটা মেয়ে চালাচ্ছে।

এক ঝলক দেখতে পেল রানা কেবল। অপূর্ব এক সুন্দরী। সোনালী চুল হাওয়ায় উড়ছে পতাকার মত। রানার দিকে চেয়ে মুচকি হাসল, তারপর এগিয়ে গেল ওকে পিছনে ফেলে।

মুহূর্তে খাড়া হয়ে বসল মাসুদ রানা। মস্ত এক ল্যাঙ খেয়েছে ওর আত্মসম্মান। ফিলিপ কার্টারের চিন্তা উড়ে গেল বেমালুম। একটা মেয়ে যদি মুচকি হেসে ওকে ওভারটেক করে চলে যেতে পারে, তাহলে এ জীবনটা থাকলেই কি, না থাকলেই বা কি? মরুক ব্যাটা খচ্চর বুড়ো। ফ্লোর বোর্ডের

সাথে চেপে ধরল রানা অ্যাক্সিলারেটার, স্টিয়ারিং হুইলের উপর হাতদুটো রয়েছে সোয়া নয়টার ভঙ্গিতে। ঠোঁটের কোণে 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি' হাসি।

তুফান বেগে ছুটল ল্যান্সিয়া। স্পীডমিটারের লালকাঁটা একশো দশ, বিশ, ত্রিশ কিলোমিটারের ঘর ছাড়িয়ে গেল। কিন্তু তবু দূরত্ব কমল না। পাঁচশো গজ সামনে নীল পরীর মত উড়ে চলেছে অ্যাস্টন মার্টিন।

ল্যান্সিয়ার বাপ তুলে দুটো মোক্ষম গালি দিল রানা—কিন্তু দেড়শো কিলোমিটার পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়ে গেল কাঁটা, নড়বার লক্ষণ নেই! কিন্তু অ্যাস্টন যে খুব একটা এগিয়ে যাচ্ছে তা নয়, ওটারও দৌড় প্রায় শেষ। রানা বুঝল, বাঁক নেবার সময় দূরত্ব কমাতে হবে ওর, এ মেয়েকে ওভারটেক করবার আর কোন উপায় নেই। সোজা রাস্তায় তেমন কোন সুবিধে করা যাবে না।

গতি কমাচ্ছে মেয়েটা—সামনে বাঁক। গজ পঞ্চাশেক এগিয়ে এল রানা। বাঁক ঘুরেই আবার ফুলস্পীড দিল মেয়েটা, কিন্তু বিপজ্জনক টার্ন নিয়ে আরও পঞ্চাশ গজ দূরত্ব কমিয়ে ফেলল রানা।

রানার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেই গতি বাড়িয়ে দিল মেয়েটা। একশো আশি কিলোমিটারে তুলে ফেলল স্পীড সামনে সোজা ফাঁকা রাস্তা পেয়ে। কালো হয়ে গেল রানার মুখটা। হাসি মুছে গেছে। বুঝতে পেরেছে, ল্যান্সিয়া নিয়ে ওকে হারানো যাবে না। অনেক বেশি শক্তিশালী গাড়ি অ্যাস্টন মার্টিন। হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল রানা, এমনি সময় মনে পড়ল ড্যাশবোর্ডের গায়ে বসানো একটা বোতামের কথা। গাড়িটা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের রোম এজেন্ট সালেহীনের। ছেলেটা গাড়ির পোকা। নানান ধরনের কায়দা-কৌশল করেছে এই গাড়িতে। ব্যাক অ্যাকসেলের রেশিও বদলে করেছে থারটিন ইজটু ফরটি, কার্বুরেটার পাল্টে ফেলেছে, আর্নট সুপারচার্জার লাগিয়েছে। ম্যাগনেটিক ক্লাচের ছোট্ট বোতামটা দেখিয়ে বারবার রানাকে অনুরোধ করেছে, তেমন জরুরী অবস্থায় না পড়লে যেন ওই বোতামটা ব্যবহার না করে—ক্র্যাকশ্যাফট বিয়ারিং এই বাড়তি লোড সহ্য করতে নাও পারে, টেস্ট করে দেখা হয়নি এখনও।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। এটা একটা ভয়ানক জরুরী অবস্থা। মেয়েটাকে পিছনে ফেলতে না পারলে মান-সম্মান আর থাকবে না কিছুই, নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাবে সে নিজে। বোতামটা টিপে দিল সে। যেন লাফ দিল শিকল খুলে দেয়া ব্লাড হাউন্ড। এঞ্জিনের আওয়াজ বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। দশ সেকেন্ডের মধ্যে স্পীড উঠে গেল একশো পঁচানব্বইয়ে। একেবারে হালকা হয়ে গেছে স্টিয়ারিং—মনে হচ্ছে চাকাগুলো মাটি স্পর্শ করছে না আর। রেভকাউন্টারের কাঁটা বিপদ সীমা ছাড়িয়ে সোয়া চার হাজারে গিয়ে ঠেকল। কিন্তু ঘাবড়াল না রানা, অয়েল প্রেশারের হেরফের না দেখে টিপে ধরে রাখল অ্যাক্সিলারেটার ফ্লোরবোর্ডের সাথে।

এইবার! একগজ, দু'গজ করে কমে আসছে দূরত্ব। অল্পক্ষণেই একশো গজের মধ্যে চলে এল নীল গাড়িটা। তারপর পঞ্চাশ, চল্লিশ, ত্রিশ, বিশ গজ।

সামনের গাড়ির রিয়ার ভিউ মিররে দেখতে পাচ্ছে রানা একজোড়া বিস্মিত চোখ। কিন্তু ওভারটেক করা গেল না। গতি কমাতে বাধ্য হলো সে। সামনে বাঁক, তারপরেই গ্রসেটো শহরে ঢুকবে ওরা। মেয়েটার আশ্চর্য সুন্দর টার্নিং দেখে অবাক হলো রানা, মনে মনে বাহবা না দিয়ে পারল না। একেবারে পুরুষ মানুষের মত চালাচ্ছে মেয়েটা। মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠছে ব্যাক লাইট, গিয়ার নামাচ্ছে একধাপ, অ্যাক্সিলারেটার পেডাল থেকে পা না তুলেই সাঁই করে ঘুরে যাচ্ছে।

শহরটা ছাড়িয়ে শয়তানী শুরু করল মেয়েটা, মন্টে পেসক্যালি পর্যন্ত কিছুতেই সাইড দিল না রানাকে। মুচকি হাসল রানা। তারপর? সিসিনা পর্যন্ত একটানা রাস্তায় কি করে ঠেকাবে ওকে? চেষ্টার ত্রুটি করল না মেয়েটা, কিন্তু বিশ মাইলের মধ্যেই ওকে ওভারটেক করল রানা দুশো কিলোমিটার স্পীডে, পাশ ফিরে মুচকি হেসে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। আধ মাইল এগিয়ে গিয়ে বোতামটা টেনে অফ করে দিল রানা—ল্যান্সিয়ার স্বাভাবিক গতিতে চলল খুশি মনে।

রানা আশা করেছিল আবার চেষ্টা করবে মেয়েটা ওকে ছাড়িয়ে যেতে, কিন্তু না, পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে মেয়েটা, রানার পাঁচ-ছয়শো গজ পিছনে লক্ষ্মী মেয়ের মত একশো কিলোমিটার বেগে আসছে।

লেগহর্নে পৌঁছে রাস্তার পাশে একটা বারের সামনে থামল রানা। বাচ্চা একটা ছেলে দৌড়ে আসতেই অর্ডার দিল সেভেন আপের। তিন মিনিটের মধ্যেই রিয়ার ভিউ মিররে দেখা গেল নীল অ্যাস্টন মার্টিনটাকে। সোজা এসে রানার পাশে পার্ক করে দাঁড়াল অ্যাস্টন মার্টিন। রানার দিকে না চেয়ে সেভেন আপের অর্ডার দিল মেয়েটা গম্ভীর ভাবে।

একটা সিগারেট ধরাল রানা। হাসল নিঃশব্দে।

'হয়েছে, হয়েছে! আর টিটকারি মারতে হবে না!' হঠাৎ ঝট করে ফিরল মেয়েটা রানার দিকে। পরিষ্কার ফরাসী ভাষায় বলল, 'ওরকম সুপারচার্জার লাগানো থাকলে সবাই বাহাদুরি করতে পারে। লজ্জা করে না?'

এবার জোরে হেসে উঠল রানা।

'না, করে না,' বলল সে। 'অ্যাস্টন মার্টিন নিয়ে ল্যান্সিয়াকে চ্যালেঞ্জ করতে আপনার যদি লজ্জা না লাগে, হারিয়ে দিতে আমার লজ্জা কিসের? জব্দ হয়ে গিয়ে রাগ দেখানো সহজ।'

'ঠিক আছে!' চোখ পাকাল মেয়েটা। 'ল্যান্সিয়ার ম্যাক্সিমাম স্পীড হচ্ছে ওয়ান-ফিফটি। আপনি যদিও ডি ডায়ন অ্যাক্সেলের সুবিধে পাচ্ছেন, তবু দেড়শোর বেশি স্পীড তুলব না আমি। দেখা যাক এবার কার কি ক্ষমতা।'

'অলরাইট।' চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল রানা।

দুটো সেভেন আপের দাম দিতে যাচ্ছিল রানা, প্রবল আপত্তি জানাল মেয়েটা।

'উহুঁ, অসম্ভব। আপনি অন্যায় ভাবে হারিয়েছেন আমাকে, আপনার

সেভেন আপ খাব না আমি।'

'ঠিক আছে,' হাসল রানা ওর ভুবনজয়ী হাসি। 'জেনোয়া পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। এবার যদি ন্যায় ভাবে হারাতে পারি, ডিনার খেতে হবে আমার সাথে। রাজি?'

কয়েক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল মেয়েটা, তারপর বলল, 'রাজি। কিন্তু যদি হেরে যান, আমি খাওয়াব ডিনার। কোন আপত্তি চলবে না।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার পয়সা খরচ হবে না।'

'নিজের ওপর আস্থা থাকা ভাল, কিন্তু অতটা বোধহয় ভাল না,' বলল মেয়েটা। 'চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবার আগে আপনাকে জানিয়ে দেয়া উচিত, নইলে পরে আবার দোষ দেবেন: আই অ্যাম দ্য ফাস্টেস্ট গার্ল অফ ইউরোপ। গত বৎসরের মহিলা গ্র্যান্ডপ্রিক্স চ্যাম্পিয়ান।'

'ওরেব্বাপ!' সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখল রানা মেয়েটাকে। তারপর ছোট্ট একটু নড করে বলল, 'স্টিল আই অ্যাকসেপ্ট দ্য চ্যালেঞ্জ।'

ছুটল ওরা।

'আপনি এত অপূর্ব গাড়ি চালান, গ্র্যান্ডপ্রিক্সে কমপিট করেন না কেন?'

'প্রথম কারণ, আমি কতটা ভাল গাড়ি চালাই, আদৌ ভাল চালাই কিনা জানা ছিল না আমার—আজই প্রথম শুনলাম আপনার মুখে,' বলল রানা। 'দ্বিতীয় কারণ, আমি সম্পূর্ণ অন্য লাইনের লোক, এবং খুবই ব্যস্ত লোক। এসব কথা ভাববার সময় পাইনি কোনদিন, পাবও না।'

'কি ধরনের কাজ করেন আপনি?'

'ব্যবসা। ইমপোর্ট, এক্সপোর্ট, ইন্ডেন্টিং।'

'প্যারিসে যাচ্ছেন কি কাজে, না ছুটিতে?'

'কাজ। খুব জরুরী।'

'আজই রওনা হবেন?'

'নাহ। ভাবছি রাতটা এই হোটেলেই কাটিয়ে কাল রওনা হব ভোরে।' শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিল রানা। 'আপনি?'

'আমিও থাকছি। কাল দুপুরের আগে মার্সেই পৌঁছলেই চলবে।'

'মার্সেইতে আপনি কি...'

'চাকরি করি,' বলল জুলিয়া। 'গ্র্যান্ডপ্রিক্স রেসিং কোম্পানীতে কাজ করি আমি। ব্লু অ্যাঞ্জেল টীম। তিন মাস আগেও পৃথিবীর সেরা টীম ছিল আমাদেরটা।'

'নেমে গেল কেন? অ্যাক্সিডেন্ট?'

'হুম।' মাথা ঝাঁকাল জুলিয়া। 'আমাদের সেরা ড্রাইভার পল মারা গেল রেসট্র্যাকের এক দুর্ঘটনায়। ওর মৃত্যুতে পঙ্গু হয়ে গেল ব্লু অ্যাঞ্জেল।' রানার চোখের উপর চোখ রাখল জুলিয়া। 'অবাক ব্যাপার কি জানেন? আপনার ড্রাইভিং হুবহু পলের মত। তেমনি নিপুণ, তেমনি ধীরস্থির, তেমনি বেপরোয়া।

তাই জিজ্ঞেস করছিলাম গ্র্যান্ডপ্রিক্সে কমপিট করবার ইচ্ছে আছে কিনা। করলে আমার বিশ্বাস, তিন মাসে পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে যাবেন আপনি।'

হো-হো করে হেসে উঠল রানা। কারও মুখের কথাতেই যদি ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান হয়ে যাওয়া যায়, আপত্তি নেই ওর। রেসট্র্যাকে নামতে হচ্ছে না যখন। কথোপকথন চালু রাখবার জন্যে বলল, 'ঠাট্টা করছেন।'

'মোটর রেসিং নিয়ে ঠাট্টা করতে অভ্যস্ত নই অমি। যা সত্যি তাই বলছি।'

'তাই নাকি? তাহলে তো এতবড় কমপ্লিমেন্টের জন্যে আপনাকে আমার ধন্যবাদ দেয়া উচিত।'

স্যুপ দিয়ে গেল ওয়েটার। এক চামচ মুখে দিয়ে রানার একটা হাত স্পর্শ করল জুলিয়া।

আপনি যদি গ্র্যান্ডপ্রিক্সে যোগ দিতে চান, আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'সে কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দিচ্ছি আমি আপনাকে।'

'অর্থাৎ, আপনি এ লাইনে আসতে চান না? সত্যি বলুন তো কত টাকা পান আপনি ব্যবসা থেকে?'

'খুব বেশি কিছু না। কেন?'

'আমি আপনার রোজগার সম্পর্কে কিছু না জেনেও বিনা দ্বিধায় বলে দিতে পারি, যা পান তার অন্তত একশো গুণ বেশি পাবেন আপনি গ্র্যান্ডপ্রিক্সে যোগ দিলে। আমি বললেই নিয়ে নেবে আপনাকে ব্লু অ্যাঞ্জেল। এই ব্যাপারে আমি সব রকম সাহায্য করতে পারি আপনাকে। আসবেন?'

মৃদু চাপ দিল রানা ওর হাতে।

'খুশি হতাম,' বলল সে, 'আপনার সাথে কাজ করবার সুযোগ পেলে। কিন্তু দুঃখিত। কেবল টাকা নয়, বেশ কিছুটা দায়িত্বও দেয় আমাকে আমার প্রতিষ্ঠান। আমার কাজের উপর অনেকখানি নির্ভর করে গোটা কোম্পানী। ইচ্ছে হলেই ওদের পথে বসাতে পারি না। তাছাড়া জব-স্যাটিসফ্যাকশন রয়েছে—যে কাজে আছি সেটা আমার মনের মত কাজ, হঠাৎ করে লাইন পরিবর্তন করবার কোন ইচ্ছে বা আগ্রহ নেই।'

দপ করে নিভে গেল মেয়েটা। যেন মস্ত কোন আশা ভঙ্গ হয়েছে ওর। রানার রাজি হয়ে যাওয়াটা মনে মনে কত বেশি করে চেয়েছিল জুলিয়া বুঝতে পেরে একটু অবাক হলো রানা। ভাবল, একেই বলে ডেডিকেশন! নিজের লাইনের প্রতি এই রকম নিষ্ঠা না থাকলে কাউকে দিয়ে কিছু হয় না। লক্ষ করল, খাওয়ার উৎসাহেও ভাঁটা পড়েছে জুলিয়ার। অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল রানা। টুকিটাকি নানান ধরনের গল্প হলো খেতে খেতে। কিন্তু মেয়েটির অন্যমনস্ক ভাবটা কাটল না। যে উৎসাহ নিয়ে খাওয়া শুরু করেছিল ওরা, খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই নিভে গেল সেটা। প্রায় নীরবে শেষ করল ওরা

সাত কোর্সের ডিনার।

বিল নিয়ে এল ওয়েটার। সেটা চুকিয়ে দিয়ে জুলিয়ার দিকে ফিরল রানা।

'আসুন, দুটো ঘর বুক করে ফেলা যাক। তারপর ইচ্ছে করলে সমুদ্রের ধারে খানিক হাওয়া খেতে পারেন, কিংবা ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারেন। যা খুশি।'

রিসেপশন ডেস্কে গিয়ে দুটো কামরা বুক করল রানা। গাড়ির চাবি দিল পোর্টারকে, কামরায় লাগেজ পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিল। তারপর বেরিয়ে পড়ল বাইরে চাঁদের আলোয়। সাথে এল জুলিয়া। মস্ত বড় বড় ছাতা গেঁথে দিয়েছে হোটেল কর্তৃপক্ষ সী বীচে, তার নিচে টেবিল চেয়ার পেতে দিয়েছে। জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে নারী-পুরুষ। মিষ্টি একটা বাজনা বাজছে করুণ সুরে। ওরা দু'জন বসল একটা খালি টেবিলে মুখোমুখি। সিগারেট ধরাল রানা হাওয়া বাঁচিয়ে, হুইস্কি দিয়ে গেল ওয়েটার অর্ডার পেয়ে।

'রেস ড্রাইভারদের মদ খাওয়া নিষেধ। আপনি খুব বেশি মদ খান বুঝি?' বলল জুলিয়া।

'না তো! বেশির ভাগ দিনই খাই না। মাসে দু'মাসে এক আধবার। যেদিন মনটা ভাল থাকে, সেদিন।'

'আজ এত ভাল লাগছে কেন? আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন তাই?'

'ঠিক তা নয়,' বলল রানা। 'হারিয়ে দিয়ে খারাপ যে লেগেছে তা অবশ্য নয়, কিন্তু আসলে প্রতিযোগিতাটা উপভোগ করেছি আমি। চার-পাঁচটা বিপজ্জনক টার্নিং ছাড়া মোটামুটি ভালই চালিয়েছি আজ। খুশি লাগছে সেই জন্যে।'

'গাড়ির সাথে এতটা একাত্ম হয়ে গাড়ি চালাতে আমি খুব কম মানুষকেই দেখেছি। গাড়িটাকে যদি নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত ব্যবহার করা না যায় তাহলে আর কিসের ড্রাইভার?'

রানা দেখল, আবার গ্র্যান্ডপ্রিক্স এসে যাবে আলোচনার মধ্যে। কাজেই চট করে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা-মা কোথায় আপনার?'

'মা নেই। বাবা থাকেন প্যারিসে। সরকারী চাকরি করতেন, এখন রিটায়ার্ড।'

'রেসিং টীমের চাকরিটা কি ধরনের আপনার?'

'আপাতত কাজ তেমন কিছুই না—সেক্রেটারিয়েল। সিজন এলে আমার ভূমিকা হবে ট্রেনারের—মেয়ে ড্রাইভারদের কোচ করতে হবে।'

'অনেক টাকা বেতন পান বুঝি?'

'হ্যাঁ। অনেক। আমার প্রয়োজনের চেয়ে বহুগুণ বেশি। এবার আমার কথা থাক। আপনার কথা শোনা যাক। আপনি তো বাঙালী।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। বলল, 'আমার শোনাবার মত তেমন কোন কথা আসলে নেই। আমি একজন সাধারণ মানুষ। এমন কোন বিষয়ে আমার এমন কোন কৃতিত্ব নেই যা মানুষকে বিশিষ্ট করে তোলে। কচুরিপানার মত ভেসে

বেড়াচ্ছি আমি এখান থেকে ওখানে। কোন পিছুটান নেই। বাবা-মা-ভাই-বোন কেউ নেই, বিয়েও করিনি যে বৌ-ছেলে-মেয়ের বাঁধন থাকবে। খোদাই ষাঁড়।'

'বিশিষ্ট হওয়ার যোগ্যতা কিন্তু রয়েছে আপনার মধ্যে।'

এই রে! আবার শুরু হতে যাচ্ছে গ্র্যান্ডপ্রিক্স। কিন্তু এবার আর এড়িয়ে না গিয়ে সরাসরি মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিল রানা।

'আপনি কার-রেসিঙের কথা বলছেন তো? দুঃখের বিষয় ওদিকে আমার কোন উৎসাহ নেই।'

'পৃথিবী-জোড়া খ্যাতির সম্ভাবনা আপনাকে আকর্ষণ করে না? টাকার লোভ না থাকতে পারে, কিন্তু খ্যাতি? দেশের মুখ উজ্জ্বল করবার সৌভাগ্য ক'জনের হয়? দায়িত্বের কথা বলে আমার মুখ বন্ধ করে দিলেন আপনি তখন। কিন্তু এমন কি গুরু দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন আপনি যেটা শেষ করে গ্র্যান্ডপ্রিক্সে যোগ দিতে পারেন না? আমার তো বিশ্বাস, সব জানিয়ে ছুটি চাইলে খুশি হয়ে ছুটি দেবে আপনাকে আপনার প্রতিষ্ঠান।'

'তা হয়তো দেবে। কিন্তু আপনি এমনভাবে কথা বলছেন, যেন আমি ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান হয়ে বসে আছি, খাতায় শুধু নামটা লেখানোর অপেক্ষা।'

'তাই তো!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। 'ইশ্‌শ্‌! কি করে বোঝাই! আপনি জানেন না আপনার মধ্যে কি ক্ষমতা রয়েছে! ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান হওয়া আপনার পক্ষে কতটা সহজ তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'কি করে পারব, বলুন?' হাসল রানা। 'জীবনে যে লোক রেসিংকার চালানো তো দূরের কথা, দেখেছে কিনা সন্দেহ; তার মাথায় এমন অসম্ভব উদ্ভট কল্পনা আসবে কি করে?'

'একেবারে সহজ,' বলল মেয়েটা। খানিক ঝুঁকে এল সামনের দিকে। আমি শিখিয়ে দেব। আধঘণ্টাও লাগবে না আপনার শিখে নিতে। আসবেন?'

'আমার সম্পর্কে এতটা ভাল ধারণা পোষণ করায় আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমাকে আপনাদের টীমে নেয়ার ব্যাপারে আপনার এত প্রবল উৎসাহের কারণটা না জেনে আগ্রহ বোধ করতে পারছি না।'

'আমি চাই আমাদের টীম এবারও ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান হোক।'

'এ ছাড়াও আরও কোন কারণ আছে। তাই না?'

একটু ইতস্তত করে মেয়েটা বলল, 'আছে। কিন্তু আপনার সম্মতি না পেলে সেটা কিছুতেই ভেঙে বলতে পারব না।'

'আমি কিছুটা আঁচ করতে পারছি।'

'কি আঁচ করতে পারছেন?'

সুখটান দিয়ে ফেলে দিল রানা সিগারেটটা। সরাসরি চাইল জুলিয়ার চোখে।

'গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ান পলের সাথে আপনার ঘনিষ্ঠ কোন সম্পর্ক

ছিল। ঠিক?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল জুলিয়া।

'কে ছিল পল? । প্রেমিক?'

'আপন ভাই।'

ঠোঁট দুটো গোল করে ছোট্ট একটা শিস দিল রানা। নিচের ঠোঁটটা-কামড়ে ধরে মাথা ঝাঁকাল। তারপর অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ভূমধ্যসাগরের বুকে ঝিলিমিলি চাঁদের আলোর দিকে। আর এক পেগ হুইস্কি রেখে গেল ওয়েটার। কিন্তু গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে রানা, স্পর্শ করল না গ্লাসটা। পাঁচ মিনিট চুপচাপ বসে রইল ওরা। তারপর মুখ খুলল মেয়েটা।

'কি? একেবারে চুপ হয়ে গেলেন যে? আমি উত্তরের অপেক্ষা করে আছি। আসবেন? আমার ভাইয়ের বদলে? আমার বড় ভাই নেই, আপনারও ছোট বোন নেই—আসুন না, ভাই-বোন হয়ে যাই আমরা?'

আধ মিনিট চুপ করে থেকে তারপর মুখ খুলল রানা।

'আপনার ধারণা, পলের মৃত্যুটা সাধারণ কোন দুর্ঘটনা নয়?'

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল জুলিয়া। সরাসরি রানার চোখের দিকে চাইল। 'সম্মতি জানাবার আগেই কিন্তু আপনি কথা আদায়ের চেষ্টা করছেন।'

'ঠিক বলেছেন। আমার অন্যায় হয়েছে। দুঃখিত। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই জানাতে পারছি না আমি আপনাকে। আপনাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারলে আমি সুখী হতাম, কিন্তু আপাতত প্যারিসে না পৌঁছে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। যদি দ্রুত কাজ সারতে পারি, আর যদি ছুটি পাই, তাহলে মার্সেইর ব্লু অ্যাঞ্জেল টীমে যোগাযোগ করব আমি আপনার সাথে।'

'তার মানে, সাহায্য পাচ্ছি না আপনার,' হতাশ কণ্ঠে বলল জুলিয়া। কিন্তু সাথেসাথেই যোগ করল, 'তাই বলে আপনাকে দোষ দিচ্ছি তা কিন্তু ভুলেও ভাববেন না। আমি জানি, এরকম উদ্ভট প্রস্তাবে হুট করে রাজি হওয়া যায় না।' বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে মায়াময় সাগরের ঢেউ ভাঙা দেখল দু'জন, তারপর কথা বলে উঠল জুলিয়া, 'কিছু যদি মনে না করেন…'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' বলল রানা। 'উঠতে পারেন আপনি। আমিও খুব ক্লান্তি বোধ করছি। আপনি যান, বিশ্রাম করুন গিয়ে। আমিও উঠব খানিক বাদেই। সো লঙ!'

চলে গেল মেয়েটা। রাত দশটা পর্যন্ত চুপচাপ একা বসে দেখল রানা সাগরের ঢেউ ভাঙা, শুনল অনন্ত কল্লোল। হাওয়া খেল, আরও গোটা তিনেক সিগারেট খেল, সেই সাথে আরও পেগ তিনেক জনি ওয়াকার। চমৎকার একটা ঘুম ঘুম ঝিমুনি নিয়ে ফিরে গেল সে হোটেলে, নিজের কামরায়।

পরদিন বেলা নয়টায় ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট সারল রানা। খোঁজ নিয়ে জানল চলে গেছে জুলিয়া। একটা চিঠি রেখে গেছে রিসেপশন কাউন্টারে। তাতে নিটোল হস্তাক্ষরে লেখা: যা হবার নয় সে ব্যাপারে অতিরিক্ত চাপাচাপি

করে হয়তো বিরক্তই করে ফেলেছি আপনাকে। আমি অনুতপ্ত। চলে যাচ্ছি। একটি অপূর্ব সন্ধ্যার জন্যে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। ইতি—ছোট বোন।

বিষণ্ন মনে চলল রানা নিস শহরের দিকে। আজ আর গাড়ি চালানোয় কোন উত্তেজনা নেই, মজা নেই। নিরুত্তাপ, একঘেয়ে ভঙ্গিতে একটানা দেড়শো মাইল গাড়ি চালানো রীতিমত শাস্তির মত মনে হলো ওর কাছে। বার বার মনে এল মেয়েটার কথা। আশ্চর্য এক আকর্ষণ আছে মেয়েটার মধ্যে। রক্তে নাচন ধরিয়ে দেয়ার মত নয়। অন্য রকম। যদি কোন ভাবে মেয়েটাকে সাহায্য করতে পারত তাহলে সত্যিই খুশি হত সে। পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করতে পারলেও ভাল লাগত। কিন্তু ঠিক কি যে চাইছে বোঝা গেল না পরিষ্কার। ভাই-বোন কাজ করত ব্লু অ্যাঞ্জেল রেসিং টীমে, ভাইটা মারা গেছে দুর্ঘটনায়। সেরা ড্রাইভার ছিল পল। কিন্তু রানা যতদূর জানে, রেস-ড্রাইভিং অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ, যে কোন ড্রাইভার মারা যেতে পারে যে কোন সময়। এর মধ্যে ঘাপলাটা কোথায়? ওর কাছে কি সাহায্য আশা করছিল জুলিয়া? শেষদিকে চেপে গেল কোন্ গোপন তথ্য? সবটা ব্যাপার রহস্যই রয়ে গেল রানার কাছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই কোন উপকারে আসতে পারবে না সে খুব সম্ভব। কাজেই ওসব চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দেয়াই ভাল।

কিন্তু কিছুতেই দূর করা গেল না। প্রতিটা বাঁক নেয়ার সময়েই এক লাফে রানার মনের পর্দায় এসে হাজির হচ্ছে মেয়েটা। মনে পড়ে যাচ্ছে মেয়েটার হতাশ, বিষণ্ন মুখটা। সত্যিই কি ওর মধ্যে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জনের ক্ষমতা রয়েছে? সম্ভাবনাটার কথা ভাবতে বেশ ভাল লাগছে ওর। যদিও ভাল করে জানা আছে ওর, ও জাত-স্পাই—খ্যাতি বা এসপিওনাজ এ দুটোর মধ্যে যে কোন একটা বেছে নিতে বললে শেষেরটাই বাছবে সে। দশ বছর আগে হলেও তাই করত, দশ বছর পরেও তাই করবে। তবু কেউ যদি বলে : তোমার মধ্যে বিরাট কোন সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে—ভাল লাগে বৈ কি।

নিসে পৌঁছে সমুদ্রের তীরে একটা খোলা রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ সেরে নিচ্ছিল রানা এমনি সময়ে এল দ্বিতীয় প্রস্তাব। বুড়ো এক ভদ্রলোক, লম্বা, রোগা, পরনে অত্যন্ত দামী পোশাক, বিনয়ের সাথে অনুমতি চাইল সামনের চেয়ারে বসবার। খানিক উশখুশ করে বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায় পরিচয় দিল নিজের।

'আমি জুলিয়ার বাবা। টেলিফোনে তোমার কথা শুনে ছুটে এসেছি প্যারিস থেকে।'

প্রায় চমকে উঠল রানা ভিতর ভিতর। ব্যাপার কি! ওর সাথে দেখা করবার জন্যে প্যারিস থেকে কেন ছুটে আসে জুলিয়ার বাবা? নিশ্চয়ই প্লেনে এসেছে। কেন?

'আপনিও কি আমাকে গ্র্যান্ডপ্রিক্সে যোগদানের অনুরোধ করবেন?'

'ঠিক। সেজন্যেই এসেছি। কিন্তু প্রস্তাব দেয়ার আগে কেন তোমাকে আমরা এই উদ্ভট অনুরোধ করছি সেটা তোমার জানা দরকার। আমার আর

জুলিয়ার বিশ্বাস, পলের মৃত্যুটা দুর্ঘটনা নয়, খুন করা হয়েছে ওকে। সাধারণ কোন দুর্ঘটনায় মারা পড়েনি সে, বিরাট কোন ষড়যন্ত্র রয়েছে এর পেছনে। ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যান করে হত্যা করা হয়েছে ওকে। কিন্তু কোন প্রমাণ নেই। আমরা আঁচ করছি, ভয়ঙ্কর একটা কিছু চলছে গ্র্যান্ডপ্রিক্সকে কেন্দ্র করে। সেই রহস্য উদঘাটনের জন্যেই তোমার সাহায্য আমাদের দরকার।'

'কি ধরনের সাহায্য?' অবাক হয়ে চাইল রানা বৃদ্ধের মুখের দিকে। 'গোয়েন্দাগিরি?'

'না, তা ঠিক নয়, মিস্টার মাসুদ রানা,' রানা চটে যেতে পারে ভেবে বিচলিত হয়ে উঠল বৃদ্ধ। 'তোমাকে যে কাজের অনুরোধ করব, সেটা কোন গোয়েন্দাকে দিয়ে করানো সম্ভব নয়। আমাদের দরকার গ্র্যান্ডপ্রিক্সে প্রতিযোগিতা করবার যোগ্যতা আছে এমন একজন বিশ্বস্ত যুবকের। বুঝতেই পারছ এরকম যুবক টাকায় ষোলোটা পাওয়া যায় না।'

'আমার বিশ্বস্ততার কি প্রমাণ আছে আপনাদের হাতে?'

'কোন প্রমাণ নেই। প্রথম দর্শনে যে ধারণা হয় তার ওপর নির্ভর করে কাজ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই আমাদের। তবে প্রথম ধারণাটাকে ছোট করে দেখো না কোনদিন। এরও একটা বিরাট মূল্য আছে। এটা আসে অতীত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে। খামোকা কাউকে প্রথম দর্শনে কেউ ভাল বলে না। এই ধরো, তোমাকে প্রথম দেখেই আমি বুঝে নিয়েছি দুর্দান্ত সাহসী ছেলে তুমি, তোমার অন্তরটা সৎ, তোমার ওপর নির্ভর করা যায়। তেমনি তুমি আমার দিকে এক নজর চেয়েই বলে দিতে পারবে, বাজে কথার লোক নই আমি, অত্যন্ত দায়িত্বশীল এবং সৎ। কারও কাছে কোন কারণে হাত পাততে অভ্যস্ত নই। কি হে, মিথ্যে বলেছি?' হাসল বৃদ্ধ। মনে মনে বুড়োর কথা স্বীকার না করে পারল না রানা। নিজের কথার খেই ধরল বৃদ্ধ। 'যা বলছিলাম। আমাদের দরকার ভেতরের লোক। গাড়ি চালানোর পারদর্শিতা ছাড়া ধরতে গেলে তোমার সম্পর্কে আমরা আর কিছুই জানি না। জুলিয়ার কাছে শুধু শুনেছি, কোন একটা এক্সপোর্ট, ইমপোর্ট এবং ইন্ডেন্টিং ফার্মের তরফ থেকে প্যারিসে যাচ্ছ তুমি বিশেষ কাজে। প্যারিসে আমার প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। সরকারী বেসরকারী, সব মহলে। তুমি জুলিয়াকে বলেছ কাজ সেরে সময় পেলে সাহায্য করবে। ইচ্ছে করলে তুমি তোমার ব্যবসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপিয়ে দিতে পারো, বাবা। তুমি যদি ব্লু অ্যাঞ্জেলে যোগ দাও, তোমার ব্যবসা আমি দেখব। কি ব্যবসা, কিসের এক্সপোর্ট কিছু না জেনেই বিনা দ্বিধায় বলে দিতে পারি—তুমি যতটা পারবে, তার চেয়ে অনেক সহজে অনেক সুষ্ঠুভাবে করে দিতে পারব আমি তোমার কাজটা।'

মনে মনে হাসল রানা। কাজটার নমুনা জানতে পারলে এক্ষুণি হার্টফেল করত বুড়ো। কাঁটা চামচে বিঁধিয়ে এক টুকরো পনির তুলল মুখে। এই উটকো ঝামেলা কিভাবে ভদ্রতার সাথে কাটিয়ে দেয়া যায় ভাবছিল, এমনি সময় প্রচণ্ড

এক হোঁচট খেল সে বৃদ্ধের পরবর্তী কথায়।

'আমার নাম ফিলিপ কার্টারেট। আমাকে তোমার চিনবার কথা নয়, বাবা। কিন্তু আমি জীবনে মিথ্যে কথা বলিনি। আমি পারি না এমন কাজ খুব কমই আছে। আমার ওপর ভার চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবে তুমি। আমার কাজটা যদি করো, আমি তোমারটা করে দেব। আমার একমাত্র ছেলে ছিল পল কার্টারেট। ওর হত্যাকারীদের শায়েস্তা করতে না পারলে মরেও শান্তি হবে না আমার। প্লীজ, মিস্টার মাসুদ রানা, দয়া করে একজন বুড়ো বাপের মুখ চেয়ে রাজি হয়ে যাও।'

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে রানা। কপাল একেই বলে। যার কাছে চলেছে সে সাহায্য পাবে কি পাবে না সে-ব্যাপারে দ্বিধা আর দ্বন্দ্বে, আশা-নিরাশায় দুলতে দুলতে, সেই প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, দোর্দণ্ডপ্রতাপ লোকটাই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তার কাছে এসে হাজির। নিজের পরিচয় এবং উদ্দেশ্য আপাতত চেপে রাখাই স্থির করল সে। আগে এই বুড়োর কাজ উদ্ধার করে তারপর ভাঙবে সে আসল কথা। তখন আর না বলবার উপায় থাকবে না ব্যাটার। কিন্তু···এলোক সেই লোকই তো? আর কোন ফিলিপ কার্টারেট নয় তো?

'বুঝলাম,' বলল সে দ্বিধান্বিত কণ্ঠে। 'কিন্তু পুলিসের সাহায্য না নিয়ে এতসব ঝামেলার মধ্যে যেতে চাইছেন কেন? এসব খুন-খারাবি পুলিসের ব্যাপার। আমি আপনাকে এ ব্যাপারে যে ঠিক কি সাহায্য···'

'শোনো, বাবা। ছ'মাস আগে পর্যন্ত আমি ছিলাম ফ্রান্সের ডুক্সেম ব্যুরোর চীফ। এখন যদিও রিটায়ার করেছি—(ঘড়েল বুড়ো ইন্টারপোলের ব্যাপারটা চেপে গেল বেমালুম—মনে মনে হাসল রানা।)—কিন্তু আমি কড়ে আঙুলের ইশারা করলে এখনও ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার নিজ হাতে তৈরি এক হাজার এজেন্ট যে-কোন কাজে। দশ হাজার পুলিস লেগে যাবে আদাজল খেয়ে। কিন্তু এটা ওদের কাজ নয়। হলে তোমার কাছে হাত পাততাম না, পুলিসের সাহায্যে শায়েস্তা করা যাবে না ওদের। একেবারে ভেতরে ঢুকতে না পারলে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না।' রানার হাতের উপর নিজের হাতটা রাখল বৃদ্ধ। 'গত দুটো মাস ঘুমাতে পারিনি আমি, বাবা। একটা বুড়ো মানুষ, তোমার হাত ধরছে···'

'ধরে নিন, রাজি হয়ে গেছি আমি,' বলল রানা চট করে। 'আগেই হয়তো রাজি হয়ে যেতাম, যদি জুলিয়া সবটা ব্যাপার খুলে বলত। আমার দ্বারা যদি কোন সাহায্য হবে বলে মনে করেন, আমি আছি আপনাদের সাথে। কিন্তু নেহায়েত সাদামাঠা অনভিজ্ঞ লোক আমি, জীবনে কোনদিন রেসিংকার চালাইনি; যে ধরনের কাজের আভাস দিচ্ছেন, জীবনে করিনি সে রকম কাজ—আমি কি সত্যিই কোন কাজে আসতে পারব আপনাদের? আমাকে নেবেই বা কেন কেউ কোন টীমে?'

স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল বৃদ্ধের উদ্বিগ্ন ভাঁজ ভাঁজ মুখে।

'সে ব্যাপারে কোন চিন্তা নেই তোমার। জুলিয়ার চোখ ভুল দেখে না। ব্লু অ্যাঞ্জেল টীমে তোমার ভর্তির ভার ওর ওপর ছেড়ে দিতে পারো। বাকিটুকু ছেড়ে দাও আমার ওপর। উহ্! বাঁচালে, বাবা! এবার তোমার ব্যবসার কথাটা বলে ফেল। কিসের ব্যবসা করছ তুমি।'

'আগে আপনার ঝামেলাটা চুকে নিক,' বলল রানা। 'আমার তাড়াহুড়ো নেই। সাহায্য দরকার হলেই ঠিক সময় মত জানাব আপনাকে।'

'কিন্তু এদিকের ঝামেলা শেষ হতে বেশ কিছুদিন দেরি হয়ে যেতে পারে, বাবা।'

'তা হোক। আর একটা কথা—আপনার প্রস্তাবে রাজি হচ্ছি আমি, কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

'কি শর্ত?'

'মিথ্যে পরিচয়ে কাজ করব আমি। ছদ্মবেশে। জাল পাসপোর্ট সংগ্রহ করে দিতে হবে একটা।'

'অতি সহজ কাজ। কোন্ দেশের পাসপোর্ট চাও?'

'ইটালিয়ান হলেই বোধহয় ভাল হবে, কি বলেন?'

'অলরাইট। নাম?'

'যে কোন একটা নাম দিলেই চলে···ধরুন, মরিস রেনার?'

'ভেরিগুড। কিন্তু ছদ্ম-পরিচয় চাইছ কেন?'

'আমার কোম্পানীকে জানতে দিতে চাই না যে, কাজ ফেলে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছি আমি সারা ইউরোপময়।'

'ঠিক আছে। আজ বিকেলের মধ্যেই সব হয়ে যাবে।' পকেট থেকে এক বান্ডিল নোট বের করল বৃদ্ধ। 'মার্সেই গিয়ে হোটেল স্প্লেন্ডিডে উঠবে তুমি তোমার নতুন পরিচয়ে। দু'জন লোক দেখা করবে তোমার সাথে— একজন মেকাপম্যান, একজন ফটোগ্রাফার। বিকেল বেলা পেয়ে যাবে তুমি পাসপোর্ট। ততক্ষণ ঘর থেকে বেরিয়ো না।' উঠে দাঁড়াল ফিলিপ কার্টারেট।

নোটের তোড়াটা রানার হাতে গুঁজে দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু রানা নিল না সেটা।

'কাজটা আপনার আর জুলিয়ার মুখ চেয়ে করছি আমি, টাকার মুখ চেয়ে নয়। আমার কাছে যথেষ্ট টাকা আছে এখনও—যদি দরকার পড়ে চেয়ে নেব পরে। ভাল কথা, আপনার সাথে যোগাযোগ হচ্ছে কিভাবে? কি করতে হবে সেসব জানব কি করে?'

'আমি তোমার কাছাকাছিই থাকব, বাবা। চলি এখন।' রানার হাতটা শেক করে চোখে চোখ রাখল বৃদ্ধ। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার মাসুদ রানা। চিরঋণী করলে তুমি আজ আমাকে!'

ঠিক ছ'টার সময় টোকা পড়ল দরজায়। জুলিয়া ব্যাগ থেকে পাসপোর্ট বের করে দিল।

'ও মা! এখনও তৈরিই হওনি! নাও, রেডি হয়ে নাও। চলো, আলাপ করিয়ে দিই!'

'কার সাথে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মিস্টার মাইকেল হ্যামার। ব্লু অ্যাঞ্জেলের মালিক ও ম্যানেজার। খুব ভাল মানুষ, তোমার ভাল লাগবে।'

রানা কাপড় পরতে শুরু করল, বক বক করে চলল জুলিয়া।

'পাসপোর্টে তোমার ছবিটা না দেখলে চিনতেই পারতাম না তোমাকে। আচ্ছা, মাসুদ ভাই, তোমার পেছনে বাবাকে লেলিয়ে দেয়ায় রাগ করোনি তো আমার ওপর? এ ছাড়া আর কি করতে পারতাম বলো?'

'বরং খুশিই হয়েছি। তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। দায়িত্ব ছিল কাঁধে, কিন্তু তোমার বাবা যেচে সব দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নেয়ায় খুশি মনে সাহায্য করব এবার আমি তোমাদের। কিন্তু সত্যিই বলো তো, নেবে ওরা আমাকে। গ্র্যান্ডপ্রিক্সে গাড়ি চালানো তো আর মুখের কথা নয়, রীতিমত প্রফেশনাল জব। যে-কেউ যোগ দিতে চাইলেই নেবে?'

'চলোই না। যে-কেউ যোগ দিতে চাইলেই নেবে না, তা ঠিক। কিন্তু তুমি তো যে-কেউ নও। তোমাকে রিকমেন্ড করছে গত বছরের মহিলা চ্যাম্পিয়ান। বুড়ো একটু আঁইগুঁই করবে হয়তো, কিন্তু তাকে ভজাতে বেশি সময় লাগবে না।'

বাঘের চোখে আপাদমস্তক দেখল রানাকে কোটিপতি মাইক হ্যামার। তারপর মাথা নাড়ল।

'তা হয় না, জুলি। বিশ বছর আছি আমি এই লাইনে, আজ পর্যন্ত এমন ঘটনার কথা শুনিনি। রাস্তাঘাটে একটু ডেয়ারিং গাড়ি চালানো, আর গ্র্যান্ডপ্রিক্সে প্রতিযোগিতা করার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে। পলের মৃত্যুর পর আমি পঙ্গু হয়ে গেছি ঠিকই, কিন্তু তাই বলে খড়-কুটো যা সামনে পড়বে তাকেই আঁকড়ে ধরতে পারব না।'

'এক্ষুণি আপনাকে আঁকড়ে ধরতে কে বলছে?' খেপে উঠল জুলিয়া। 'আমার ওপর এতটুকু ভরসাও নেই আপনার? একটা গাড়ি আমি পেতে পারি না ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে? যদি কিছু নষ্ট হয় তার দাম না হয় কেটে নেবেন আমার বেতন থেকে।'

'হয়েছে, হয়েছে। আর মেজাজ দেখাতে হবে না। গাড়ি চাও নিয়ে যাও—খানিক হাওয়া খাইয়ে আনো তোমার বন্ধুকে। তবে মনে রেখো, পিটালেই সবাই মানুষ হয়ে যায় না। যারা মানুষ, তারা জন্ম থেকেই মানুষ।'

'সেই কথাই তো বলছি আপনাকে সেই থেকে! ও জানে না, ও একজন বর্ন ড্রাইভার।'

'এই রকম কোন জীবের নাম শুনেছ তুমি, জেমস?' টেবিলের ওপাশে বসা প্রবীণ সাংবাদিক জেমস মিচেলের দিকে ফিরল মাইকেল হ্যামার, হাসল,

তারপর হাতের ইশারায় তাড়াল রানা ও জুলিয়াকে। 'বর্ন ড্রাইভার! যাও, ভাগো! তোমার ড্রাইভার নিয়ে ভাগো এখন। হাতী-ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল!'

রানা ও জুলিয়া বেরিয়ে যেতেই জেমস মিচেল বলল, 'ছোঁড়াকে দেখে কিন্তু বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হলো, মাইক। জুলিয়া যখন এত করে বলছে, হয়তো গুণ থাকতেও পারে।'

'আছে,' চোখ টিপল হ্যামার। 'এক নজরেই পছন্দ হয়ে গেছে ছেলেটাকে আমার। জুলিকে তুমি চেনো না। ও যখন বলছে ছেলেটার মধ্যে গুণ আছে, তখন না থাকতে পারার প্রশ্নই ওঠে না—আছে। কিন্তু কতটা আছে দেখতে হবে আমাদের।' উঠে দাঁড়াল। 'বেশ খানিকটা খেপিয়ে দেয়া গেছে, এবার চলো আড়াল থেকে দেখা যাক সত্যিই ব্লু অ্যাঞ্জেলের ভাগ্য ফিরল কিনা।'

দুই বন্ধু বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে। বিশাল মাইকেল হ্যামারের পাশে রুগ্ন সাংবাদিক জেম্‌স মিচেলকে মনে হচ্ছে ঝাঁটার কাঠি। কিন্তু ভদ্রলোকের কলমের বিক্রম সিংহকেও হার মানায়। আগে ছিল রাজনৈতিক প্রতিবেদক, কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই গ্র্যান্ডপ্রিক্সের সেরা সাংবাদিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে লোকটা নিজেকে। শ্রদ্ধা অর্জন করেছে মাইকেল হ্যামারের মত ডাকসেটে লোকেরও।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে রেসট্র্যাকের উপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ব্লু অ্যাঞ্জেল। ককপিটের যন্ত্রপাতি বুঝিয়ে দিচ্ছে জুলিয়া মরিস রেনারকে। থেকে থেকে মাথা ঝাঁকাচ্ছে রেনার। এক চক্কোর ঘুরে এল ওরা দু'জন। চালাচ্ছে জুলিয়া। নিজের অজান্তেই হাতে ধরা স্টপ ওয়াচটা চালু করল হ্যামার। ফিরে এল গাড়িটা। স্টপ ওয়াচের দিকে চেয়ে মুখ বাঁকা করল সে।

এবার নেমে গেল জুলিয়া। ব্লু অ্যাঞ্জেলটাকে বার কয়েক সামনে পিছনে করে আন্দাজটা বুঝে নিল রেনার। তারপর জুলিয়ার শূন্যে তুলে ধরা হাতটা বিদ্যুৎবেগে নিচে নেমে আসতেই চিতাবাঘের মত লাফ দিল ব্লু অ্যাঞ্জেল সামনের দিকে।

'দ্যাটস গুড!'

আপনাআপনি বেরিয়ে গেল কথাটা হ্যামারের মুখ দিয়ে। স্টপ ওয়াচের চাবি টিপে দিয়েছে সে অভ্যস্ত হাতে। রেনারের স্টার্ট নেয়াটা পছন্দ হয়েছে তার। অধীর আগ্রহে ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করছে সে। দূর থেকে নীল গাড়িটাকে উল্কাবেগে এগিয়ে আসতে দেখে ঈষৎ বিস্ফারিত হয়ে গেল তার চোখজোড়া। স্টপ ওয়াচের দিকে এক নজর চেয়ে ছানাবড়া হয়ে উঠল চোখ দুটো। নিজের অজান্তেই আড়াল ছেড়ে ছুটে এগোতে যাচ্ছিল, টেনে ধরল ওকে জেমস মিচেল। সাঁ করে পেরিয়ে গেল গাড়িটা স্টার্টিং পয়েন্ট, দুশো গজ দূরে গিয়ে দাঁড়াল, গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে আসছে।

খুশির চোটে তড়াক তড়াক লাফাচ্ছে জুলিয়া।

'টু পয়েন্ট ওয়ান!' তাজ্জব হয়ে চেয়ে রয়েছে হ্যামার স্টপ ওয়াচের

দিকে। আশ্চর্য! প্রথম ল্যাপেই রেকর্ড ব্রেক করেছে। টু পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড! নট এ ম্যাটার অব জোক!' এক ঝট্‌কায় মিচেলের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পাগলের মত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সে থেমে দাঁড়ানো ব্লু অ্যাঞ্জেলের দিকে।

মাথা থেকে হেলমেটটা খোলার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে রানার উপর জুলিয়া। ব্যাপারটা কি ঘটেছে বুঝতে পারল না রানা, প্রলাপের মত কি কি সব বকছে আর অবিরাম চুমো খাচ্ছে জুলিয়া ওর চিবুকে গালে কপালে।

দুই হাতে দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করল মাইকেল হ্যামার। রানার কজি চেপে ধরে টানল।

'চলো, এক্ষুণি কন্ট্রাক্ট সই করবে।'

'আসছি...গাড়িটা...'

'চুলোয় যাক গাড়ি!' গর্জে উঠল হ্যামার। 'জুলি নিয়ে আসবে ওটা। তুমি চলো আমার সাথে।'

কিছুতেই রানার হাত ছাড়ল না হ্যামার। পাছে আর কোন কোম্পানী ওকে দখল করে নেয়! প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিজের অ্যাস্টন মার্টিনের কাছে নিয়ে গেল সে রানাকে। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে বের করল কাগজ-পত্র।

'নাও, সই করো। টাকার অঙ্কের জায়গায় যা খুশি বসিয়ে দাও, আমার আপত্তি নেই। এখন থেকে তুমি ব্লু অ্যাঞ্জেলের।'

বনেটের উপর কন্ট্রাক্ট ফর্ম রেখে নিচে সই করে দিল রানা। বলল, 'টাকা পয়সার ব্যাপারটা আমার চেয়ে আপনিই ভাল বুঝবেন। কত চাইতে হয় তাই আমার জানা নেই। আপনি যা দেবেন, নেব।'

ধুমধাম করে রানার পিঠ চাপড়ে দিল মাইকেল হ্যামার। হাসি গিয়ে ঠেকেছে দুই কানে। সবদিক থেকেই খুশি হয়েছে সে রানার উপর।

'ভেরি গুড বয়! ভেরি গুড বয়! আজ থেকে তুমি ব্লু অ্যাঞ্জেলের সবচেয়ে দামী ড্রাইভার। তোমাকে দারুণ কয়েকটা টেকনিক শিখিয়ে দেব আমি। এসো সবার সাথে আলাপ করিয়ে দিই আগে তোমার।'

তিন

ফরাসীদের মত মার্জিত, নম্র, ভদ্র জাতি পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু ভাবাবেগের আতিশয্য এমনভাবে নাড়া দিয়েছে ওদের যে, কারমন্ট-ফেরান্ড রেসট্র্যাকের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল ওরা রানাকে ব্লু অ্যাঞ্জেল পিট থেকে বেরোতে দেখেই। দুই হাত শূন্যে ছুঁড়ছে, আর তারস্বরে চিৎকার করছে সবাই। বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে হাজার হাজার দর্শক। আরও একটা দুর্ঘটনা ঘটে না যায়, সেজন্যে ষাট-সত্তর জন পুলিস পাহারা দিচ্ছে এদিকটা। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, সামান্য একটা স্ফুলিঙ্গ পেলেই জ্বলে উঠবে আগুন দাউ দাউ করে—ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে ওরা মরিস রেনারকে। কারও মনে কোন

সন্দেহ নেই যে এই লোকটাই আলফ্রেড গার্বারের হত্যাকারী।

স্খলিত পদে, অবনত মস্তকে, ব্র্যান্ডির বোতলটা বগলে চেপে নিজের গাড়ির দিকে এগোচ্ছিল রানা—থমকে দাঁড়াল ভয়াবহ চিৎকার শুনে। দৌড়ে এগিয়ে এল একজন পুলিস ইন্সপেক্টার, পিটে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত করল। রানা বুঝতে পারছে না দেখে প্রায় জোর করে ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল ওকে। আবার বেঞ্চিতে বসে কাঁপা হাতে বোতলটা তুলল সে মুখের কাছে। কয়েক সেকেন্ড ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে চেয়ে থেকে ঝট করে পিছন ফিরে বেরিয়ে গেল ইন্সপেক্টার।

মারমুখী ভঙ্গিতে হুবার্ট হ্যানসিঙ্গার ও মার্কাস কাপলানকে ব্লু অ্যাঞ্জেল পিটের দিকে এগোতে দেখে কয়েক পা এগিয়ে গেল মাইকেল হ্যামার ও জেমস্ মিচেল। পথ রোধ করে দাঁড়াল। কটমট করে চাইল কাপলান হ্যামারের মুখের দিকে।

'সরে যান। কোথায় সেই হারামজাদা? আজকে ওর একদিন কি আমার একদিন!'

'গোলমাল কোরো না, মার্কাস। নিজের পিটে যাও,' শান্ত কণ্ঠে বলল হ্যামার।

'কেন গোলমাল করব না?' রুখে উঠল ফোরস্টার টীমের সেরা ড্রাইভার মার্কাস কাপলান। 'কী পেয়েছেন আপনারা? অ্যাক্ট অফ গড। যা খুশি বললেই হলো? এটা ক্লীন মার্ডার। আমি যেমন জানি, আপনিও জানেন। খুন! গার্বারকে খুন করেছে রেনার।'

'না, না,' মাথা নাড়ল হ্যামার। 'দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এত বছর ধরে গাড়ি চালাচ্ছ, হঠাৎ মাথা বিগড়ে গিয়ে যে কোন গাড়ি এরকম কাণ্ড করে বসতে পারে, সেটা নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার? গত দুই বছরে পাঁচজন মারা গেছে না গ্র্যান্ডপ্রিক্স ট্র্যাকে?'

'তাই বলে এটাকেও আপনি দৈব দুর্ঘটনা বলে চালাবেন, আর তাই মানতে হবে আমাদের?' এবার কথা বলল হুবার্ট হ্যানসিঙ্গার। ব্লু অ্যাঞ্জেলের দুই নম্বর ড্রাইভার সে—রানার পরই ওর স্থান। 'গুড গড! আমরা সবাই দেখেছি ব্যাপারটা স্ক্রীনে। একবার নয়—পাঁচবার। ব্রেক ছেড়ে দিয়ে ইচ্ছে করে নিয়ে এসেছে ও গাড়িটা গার্বারের সামনে। দৈব দুর্ঘটনা! পর পর ছ'টা গ্র্যান্ডপ্রিক্স জিতলে সজ্ঞানে মানুষ খুনও হয়ে যায় আকস্মিক দুর্ঘটনা। যে লোক ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান হতে যাচ্ছে, তাকে সরিয়ে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

'কি বলতে চাও, হুবার্ট?'

'আপনি ভাল করেই জানেন আমি কি বলতে চাই। বড় বড় কোম্পানী রয়েছে এই রেসের পিছনে। কোটি কোটি ডলার জড়িত এর সাথে। রেনারকে হারালে তাদের ক্ষতি হয়ে যাবে। গ্র্যান্ডপ্রিক্সের সেরা ড্রাইভারকে দোষী সাব্যস্ত করলে বন্ধ হয়ে যাবে খেলা—যারা বিপজ্জনক বলে আপত্তি জানাচ্ছে কয়েক বছর ধরে, সেই সব দেশ ছুতো পেয়ে যাবে গ্র্যান্ডপ্রিক্স বর্জন করবার।

তাই রেনার নির্দোষ।'

'ম্যানিয়াক!' বলল সবুজ ওভারঅল পরা কাপলান। 'সবাই জানে ও একটা ম্যানিয়াক। দুই দুইবার আজ আমাকে রাস্তা ছেড়ে সরে যেতে বাধ্য করেছে। গার্বার না হয়ে আজ আমিও পুড়ে মরতে পারতাম। আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, মিস্টার হ্যামার, আমাদের পেছনে একটা ম্যানিয়াক লেলিয়ে যদি মনে করেন চ্যাম্পিয়ান হবেন—আমরাও তার ব্যবস্থা করব। জি. পি. ডি.এর মীটিং ডেকে ওকে ব্যান করবার ব্যবস্থা করব আমি।'

'সেটা ঠিক হবে না,' বলল হ্যামার শান্ত গলায়। 'অন্তত তোমার পক্ষে উচিত হবে না, কাপলান।' কাপলানের কাঁধের উপর হাত রাখল হ্যামার। 'রেনারকে বের করে দেয়া হলে কে চ্যাম্পিয়ান হচ্ছে এ বছর?'

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল কাপলান হ্যামারের মুখের দিকে।

'আপনি···আপনি বলতে চান, সেইজন্যে আমি নালিশ করছি?'

'না আমি তা মনে করি না। কিন্তু অন্যেরা তাই মনে করবে।'

কথাটার সত্যতা টের পেয়ে থ হয়ে গেল কাপলান কয়েক মুহূর্ত। একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সে। আমতা আমতা করে বলল, 'ও একটা ম্যানিয়াক। খুনী। দেখবেন, ও আরও খুন করবে।' কথাটা বলেই কাঁধের উপর থেকে মাইকেল হ্যামারের হাতটা সরিয়ে দিয়ে নিজের পিটের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে।

হেলমেটের স্ট্র্যাপ ধরে ওটাকে ঘুরাতে ঘুরাতে হ্যানসিঙ্গার এগিয়ে গেল ব্লু অ্যাঞ্জেলের চীফ মেকানিক হুগো ব্রনসন ও তার সহকারী হ্যারি আর জ্যাকিউসের দিকে। রানার গাড়িটাকে চার চাকার উপর দাঁড় করিয়ে সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা করছে ওরা এখন।

'ওরা নেহায়েত মিথ্যে বলেনি, মাইক,' বলল সাংবাদিক জেমস মিচেল। 'রেনারের ড্রাইভিং সত্যিই ভয়ঙ্কর। যতই দিন যাচ্ছে, ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ছেলেটা। আর সবাই ওকে যমের মত ভয় পেতে শুরু করেছে।'

'আমিও তাই লক্ষ করছি, জেমস্,' বলল মাইকেল হ্যামার। শোরগোল করতে করতে চলে যাচ্ছে দর্শকরা—সেদিকে চেয়ে বলল, 'ওর ড্রাইভিং দেখলে মনে হয় আত্মহত্যার প্রবণতা আছে ওর মধ্যে। যদিও ড্রাইভিং-এর ভুল ধরবার সাধ্য কারও নেই, কোথাও এতটুকু ত্রুটি দেখাতে পারেনি কেউ আজ পর্যন্ত, কিন্তু ওর ওই ম্যানিয়াকের মত দুর্দান্ত ড্রাইভিং কাঁপুনি ধরিয়ে দেয় অন্যান্য ড্রাইভারের প্রাণে। ওর সাথে রেসট্র্যাকের কয়েক গজ জমি নিয়ে ঝগড়া না করে নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদটাই বেশি করে অনুভব করে ওরা। রিয়ার ভিউ মিররে রেনারের গাড়ি দেখতে পেলেই সাইড দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই। স্নায়ু বলে কোন জিনিস নেই ওর মধ্যে।'

'নেই না বলে বলো ছিল না,' বলল মিচেল। ঘাড় ফিরিয়ে ব্লু অ্যাঞ্জেল পিটে পানরত রানার দিকে চাইল সে। 'খুব সম্ভব ভেঙে পড়ল তোমার লৌহমানব। ভবিষ্যতে আর কোন রেস জিততে পারবে কিনা সন্দেহ।'

মাথা ঝাঁকাল মাইকেল হ্যামার। মুখটা কালো হয়ে গেল।

'আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছি, জেমস। ঠিক এই কথাটাই। যখন ভেঙে পড়ে, ঠিক এইভাবেই চুর হয়ে যায় বড় বড় ড্রাইভার। গত দুটো মাস যাকে এক ঢোক অ্যালকোহল খেতে দেখা যায়নি, কোথায় নেমেছে সে!' মস্ত বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাইকেল হ্যামার। 'চলো, দেখা যাক ব্রনসন কি বলে।'

ব্রনসন জার্মান টেকনিশিয়ান। গাড়ির জগতে এক বিস্ময়কর প্রতিভা। বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করছে ব্লু অ্যাঞ্জেলে। চীফ মেকানিক। একহারা, লম্বা, শক্ত সমর্থ—হাসি নেই মুখে। কাজ করে ভূতের মত—ক্লান্ত হতে দেখেনি ওকে কেউ আজ পর্যন্ত।

'রেনারকে নিশ্চয়ই দায়ী করা হয়নি?' কাছে এসে দাঁড়াতেই সোজা হ্যামারের চোখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল ব্রনসন। 'খালাস পেয়ে গেছে?'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে খালাস না পেলেই ভাল হত?'

'না। আমি বলতে চাই, এত কোটি কোটি ডলার এই রেসের সাথে জড়িত যে রেনারকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। গার্বারের মৃত্যুর কারণ কি নির্ধারিত হলো? মেকানিকাল ট্রাবল?'

কোন জবাব না দিয়ে গাড়িটা দেখল হ্যামার চারপাশে ঘুরে। এটা ওটা পরীক্ষা করল, স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে দেখল হালকা চাপেই ঘুরছে। সোজা হয়ে চাইল ব্রনসনের দিকে।

'ওটা আমিও দেখেছি,' বলল ব্রনসন। 'এ গাড়ির প্রত্যেকটা নাট-বল্টু আমার নিজের হাতে জোড়া। ঠিকই ছিল ওটা।'

কাঁধ ঝাঁকাল হ্যামার।

'জানি, ব্রনসন। জানি, সবকিছু পরীক্ষা না করে ট্র্যাকে নামাবে না তুমি কোন গাড়ি। যাই হোক, চলতে চলতে যে কোন গাড়ি যে কোন সময় বিগড়ে যেতে পারে। কতক্ষণ লাগবে তোমার?'

'এখুনি শুরু করতে বলেন?'

'হ্যাঁ, এক্ষুণি।'

'চারঘণ্টা লাগবে,' বলল ব্রনসন। 'বড়জোর ছয় ঘণ্টা। ছয় ঘণ্টা পর রিপোর্ট দিতে পারব।'

'ভেরি গুড।'

জেমস মিচেলের কনুই জড়িয়ে ধরে নিজের অ্যাস্টন মার্টিনের দিকে এগোল মাইকেল হ্যামার। ক্লান্ত ভঙ্গি। একবার রানার দিকে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। 'চলো, হোটেলে ফিরে খানিক জিরিয়ে নেয়া যাক। ডিনারের আগেই রিপোর্ট পাওয়া যাবে ব্রনসনের।' এদিক ওদিক চাইল। 'জুলিয়া গেল কোথায়?'

আশেপাশে কোথাও দেখা গেল না জুলিয়াকে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, লম্বা গ্যারেজটা। দশ বারোটা ঝুলন্ত স্পটলাইটের আলোয়

আরও ঝকঝকে দেখাচ্ছে। গভীর মনোযোগ দিয়ে ব্লু অ্যাঞ্জেলের ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করছিল হুগো ব্রনসন, দরজায় ক্যাঁচ করে আওয়াজ হতেই সোজা হয়ে চাইল পিছন ফিরে। মাইকেল হ্যামার এবং মিচেলকে ঘরে ঢুকতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার নিজের কাজে মন দিল সে।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এদিক ওদিক চাইল জেমস মিচেল।

'আর সব মেকানিক কোথায়? হ্যারি···জ্যাকিউস···'

'এতদিনে তো তোমার জেনে যাওয়ার কথা,' বলল হ্যামার। 'ক্র্যাশ সংক্রান্ত কোন কাজে হেলপারকে বিশ্বাস করে না ব্রনসন। সব করে একা। বলে, আসল কারণ এড়িয়ে যায় ওদের চোখ। শুধু তাই না বোকার মত এটা ওটা ঘেঁটে সব প্রমাণ নষ্ট করে ফেলে।'

হাইড্রলিক ব্রেক লাইনের একটা কানেকশন আঁটছে ব্রনসন। কপালে ঘাম।

চুপচাপ পাশে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছে ওরা দু'জন। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে ব্রনসনের প্রতিটা কার্যকলাপ লক্ষ করছে একটা এইট মিলিমিটার মুভি ক্যামেরার চোখ। মাথার উপর একটা উন্মুক্ত স্কাইলাইটের ফাঁকে দুটো হাত ধরে রেখেছে ক্যামেরাটা। এক বিন্দু কাঁপছে না হাত দুটো। পাথরের মূর্তির হাতের মতই স্থির। হাত দুটো মাসুদ রানার।

তিন মিনিট পর উঠে দাঁড়াল ব্রনসন, কোমরে হাত রেখে মুখ বিকৃত করল। ঘাম মুছল ইউনিফরমের হাতায়।

'কি দেখলে?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল হ্যামার।

'কিছুই না। কিচ্ছু না। ইঞ্জিন, ট্রান্সমিশন, সাসপেনশন, ব্রেক, স্টিয়ারিং, টায়ার—সব ঠিক আছে। কোথাও কোন গোলমাল নেই।'

'কিন্তু স্টিয়ারিংটা···'

'ওটা ইমপ্যাক্ট ফ্র্যাকচার। এ ছাড়া আর কিছুই না। গার্বারের সামনে যখন চলে এল তখনও ঠিকই ছিল ওটা কোন সন্দেহ নেই। কোন ধাক্কা নয়, কিছু না, হঠাৎ স্টিয়ারিংটা সেই মুহূর্তে গোলমাল করে বসল, এটা হতেই পারে না। এক কথায় অসম্ভব। দৈবের কথা বলেও এরকম একটা ব্যাপার মেনে নেয়া যায় না।'

'তার মানে, কেন কি হলো বোঝা গেল না কিছুই।'

'আমার যা বোঝার আমি বুঝে নিয়েছি। জলের মত পরিষ্কার। আপনারা বুঝতে চাইছেন না হাজারো স্বার্থের গ্রন্থি রয়েছে বলে। আমি জানি, এটা আর কিছুই নয়, চালকের ত্রুটি।'

'ড্রাইভিং এরর!' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল হ্যামার। 'গত দুটো মাস ওর গাড়ি চালানো দেখছি আমরা। সামান্যতম ত্রুটিও ধরতে পারেনি কেউ।'

'প্রথম বার বলে একটা কথা আছে। স্যার,' বলল ব্রনসন। 'যাই হোক, গার্বারের প্রেতাত্মা ছাড়া আর কারও পক্ষেই বলা সম্ভব নয় ঠিক কি হয়েছিল তখন।'

কয়েক সেকেন্ড ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল হ্যামার ব্রনসনের মুখের দিকে, তারপর বলল, 'ঠিক আছে। চলো এবার। খাওয়া হয়নি তোমার। হোটেলে চলো।' মিচেলের দিকে ফিরল। 'খিধে নেই, তবু যাহোক কিছু মুখে দেয়া দরকার। তারপর দেখতে হবে মরিসের কি অবস্থা।'

'বেহেড মাতাল অবস্থা,' বলল ব্রনসন। 'ভাবছি, মদ খেয়ে মাঠে নেমেছিল কিনা। নইলে...'

ঝট করে ব্রনসনের দিকে ফিরল হ্যামার।

'এ ধরনের সন্দেহ তোমাকে অন্তত সাজে না, হুগো। তোমার মনে রাখা উচিত, ছ'টা গ্র্যান্ডপ্রিক্সের বিজয়ী সম্পর্কে কথা বলছ। ব্লু অ্যাঞ্জেলের সেরা ড্রাইভার সম্পর্কে কথা বলছ।'

'অর্থাৎ থাকছে ও টীমে। তাই না?'

'অন্য কিছু হলে তুমি খুশি হতে বলে মনে হচ্ছে?'

জবাব না দিয়ে অ্যাপ্রনটা খুলে বেসিনের ধারে চলে গেল ব্রনসন। হাত ধুচ্ছে। সাবান মাখতে মাখতে পিছনে না ফিরে বলল, 'আমার খুশিতে কিছুই এসে যায় না, স্যার। আপনি মালিক। আপনার খুশিটাই আসল কথা।'

হাত-মুখ মুছে এগিয়ে এল ব্রনসন। তিনজন এগিয়ে গেল দরজার দিকে, গ্যারেজের সমস্ত বাতি নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

চৌচালা গ্যারেজের ছাত থেকে দেখল রানা, আলোকিত রাস্তা ধরে চলে গেল ওরা তিনজন। ওরা একটা বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হতেই খোলা স্কাইলাইটের মধ্যে দিয়ে গলে শরীরটা গ্যারেজের মধ্যে নিয়ে এল রানা। এদিক ওদিক পা বাড়িয়ে পেয়ে গেল একটা ক্রসবীম। সেই কড়িকাঠের উপর ভর দিয়ে দুই হাত দু'পাশে ছড়িয়ে ভারসাম্য ঠিক করল। তারপর একটা টর্চ বের করল পকেট থেকে। প্রায় বারো ফুট নিচে সান বাঁধানো মেঝে। নিচটা দেখে নিয়ে শুয়ে পড়ল রানা কড়িকাঠের উপর, দু'হাতে ওটা শক্ত করে ধরে ঝুলে পড়ল লম্বা হয়ে, তারপর ছেড়ে দিল হাত। হালকা ভাবে নেমে এল সে নিচে। নেমেই এগোল দরজার দিকে। বাতি জ্বেলে দিয়ে চলে এল বিধ্বস্ত ব্লু অ্যাঞ্জেলের পাশে। দুই কাঁধে দুটো ক্যামেরা ঝুলছে ওর। একটা আট মিলিমিটারের মুভি, দ্বিতীয়টা ফ্লাশগান ফিট করা খুব ছোট একটা থার্টিফাইভ মিলিমিটার স্টিল ক্যামেরা।

মেঝে থেকে একটা তেল মাখা কাপড়ের টুকরো তুলে নিয়ে গাড়ির কয়েকটা পার্টস পরিষ্কার করল রানা। ডানদিকের সাসপেনশন, একটা ফুয়েল লাইন, স্টিয়ারিং লিংকেজ আর একটা কার্বুরেটার ন্যাকড়া দিয়ে মুছে প্রত্যেকটার দুটো করে ছবি তুলল সে। তারপর দ্রুত হাতে ন্যাকড়াটা মেঝেতে ঘষে আর একটু নোংরা করে সেটা দিয়ে পার্টস্গুলো ডলে আগে যেমন ছিল তেমনি করে দিল। কাপড়টা একটা টিনের ক্যানেস্তারায় ফেলে এগিয়ে গেল সে দরজার দিকে।

হ্যান্ডেলে চাপ দিয়েই বোঝা গেল বাইরে থেকে তালা মেরে দিয়ে গেছে ব্রনসন। এপাশ থেকে তালা খোলার চেষ্টা করে বিফল হলো রানা। চট্ করে চোখ গেল গ্যারেজের চারপাশে। মোটা একগাছি দড়ি রাখা আছে একদিকে। গাড়ি টো করবার কাজে লাগে ওটা। তোলার চেষ্টা করে দেখল রানা, অতিরিক্ত ভারী, ওটা ছুঁড়ে বারো-তেরো ফুট উপরে পাঠানো যাবে না। একটা কাঠের মই আগেই চোখে পড়েছিল ওর, কিন্তু ওটা ক্রসবীমের গায়ে লাগানো থাকলে বোঝা যাবে কেউ ঢুকেছিল গ্যারেজে, কাজেই ওটা ব্যবহারের চিন্তা বাতিল করে দিয়েছিল। এবার দুটোকেই একসাথে কাজে লাগাল সে। মইটা কড়িকাঠের গায়ে লাগিয়ে মোটা কাছির এক মাথা হাতে নিয়ে উঠে গেল উপরে। কাছিটা কড়িকাঠে বেঁধে নেমে এসে মইটা রেখে দিল যেখানে ছিল সেখানে। বাতি নিভিয়ে দিয়ে টর্চ হাতে চলে এর রানা কড়িকাঠ থেকে ঝুলন্ত কাছিটার কাছে, অনায়াসে উঠে গেল উপরে। তারপর রশি খুলে ফেলে দিল যথাস্থানে। দুই হাত দু'পাশে ছড়িয়ে অনেকদূর হেঁটে খোলা স্কাইলাইটের কাছে পৌঁছল। টর্চ জ্বেলে ভিতরটা আর একবার দেখে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল উপরের অন্ধকারে।

হ্যামার ও মিচেল বসে আছে লাউঞ্জ-বারে কোণের এক টেবিলে। ওয়েটার দু'গ্লাস স্কচ রেখে গেল। একটা গ্লাস তুলে নিয়ে ছোট্ট চুমুক দিল হ্যামার। হাসল প্রাণশূন্য হাসি।

'উপায় নেই, জেমস! এখন পর্যন্ত রেনারকেই বলতে হবে গ্র্যান্ডপ্রিক্সের সেরা ড্রাইভার।'

'ব্রনসনের বক্তব্য জানার পরও?'

'হ্যাঁ। তার পরও।'

'অর্থাৎ, মন স্থির করেছ তুমি—থাকছে রেনার। আর একটা মৃত্যু ঘটলে?'

'তখন আবার নতুন করে ভাবা যাবে।'

প্রায় দৌড়ে এগিয়ে চলেছে রানা জনশূন্য রাস্তা ধরে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'জন লোক আসছে এইদিকে। একমুহূর্ত ইতস্তত করে চট করে সরে গেল সে একটা বন্ধ দোকানের প্রবেশ পথের অন্ধকার ছায়ায়। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে দুই মিনিট। নিজেদের মধ্যে নিচুগলায় কথা বলতে বলতে চলে গেল লোক দু'জন। একজন হচ্ছে ব্লু অ্যাঞ্জেলের হুবার্ট হ্যানসিঙ্গার, দ্বিতীয় জন ফোরস্টারের মার্কাস কাপলান। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে অত্যন্ত জরুরী কোন কথা বলছে ওরা। কান খাড়া করল রানা, কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। দু'জনের কেউই দেখতে পায়নি ওকে। চলে গেল। মাথাটা সামনে বাড়িয়ে এপাশ-ওপাশ রাস্তার দু'পাশই দেখল রানা। ওরা গ্যারেজের দিকে বাঁক নিতেই আবার ছুটল জনশূন্য রাস্তা ধরে।

গ্লাস শেষ করে মিচেলের দিকে চাইল হ্যামার।

'ওঠা যাক, কি বলো? ছেলেটার কি অবস্থা একটু দেখা দরকার।'

'চলো,' উঠে দাঁড়াল মিচেল। 'ভাল কথা, তোমার স্ত্রীর আর কোন খবর পেলে?'

মাথা নাড়ল হ্যামার বিমর্ষ বদনে। বিশাল শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'কোন খবর নেই। ওদিকে ওই অবস্থা, এদিকে এই অবস্থা—আমি পাগল হয়ে যাব মনে হচ্ছে জেমস। জ্ঞাতসারে তো কোন পাপ করিনি, কেন যে এই মুসিবৎ চাপাল খোদা আমারই উপর...'

বারম্যানের দিকে মাথা ঝাঁকাল হ্যামার। বেরিয়ে গেল দু'জন।

বেশ কিছুটা কমে গেছে রানার চলার গতি। রাস্তা পেরিয়ে হোটেলের দিকে এগোল দীর্ঘ পদে। সদর দরজা দিয়ে না ঢুকে হোটেলের বাম পাশের গলি ধরে এগোল সে, ডানদিকে মোড় নিয়ে পেয়ে গেল ফায়ার-এসকেপের সিঁড়ি। একেক বারে দুই ধাপ করে টপকে উপরে উঠতে শুরু করল সে। মাতলামির কোন লক্ষণই নেই ওর চাল চলনে। চোখ দুটো সতর্ক।

চারশো বিয়াল্লিশ লেখা একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল মাইকেল হ্যামার ও জেমস মিচেল। বার কয়েক টোকা দিয়েও কোন সাড়া পাওয়া গেল না ভিতর থেকে।

আরও জোরে টোকা দিল হ্যামার। ভুরু কুঁচকে দেখল লাল হয়ে গেছে আঙুলের গিঠ। একবার মিচেলের ভাবলেশহীন মুখের দিকে চেয়ে আবার টোকা দিল সে জোরে।

পাঁচতলার প্ল্যাটফর্মে উঠে এল রানা। রেলিং টপকে কার্নিসের উপর এক পা রেখে ধরল একটা খোলা জানালার চৌকাঠ। লাফ দিল সেই সাথে চাপ দিল হাতের উপর—নিরাপদে ঢুকে পড়ল খোলা জানালা দিয়ে।

ছোটখাট একটা হোটেল-কক্ষ। মেঝের উপর একটা খোলা সুটকেস—জিনিসপত্র এদিক-সেদিক ছড়ানো। বেড সাইড টেবিলে একটা পাঁচ ওয়াটের বাতি জ্বলছে, তার পাশেই একটা আধখালি ব্র্যান্ডির বোতল। জানালাটা বন্ধ করে দিল রানা। দরজার গায়ে প্রবল বেগে টোকা পড়ছে। হ্যামারের রাগত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'দরজা খোল, মরিস! হয় খোল: নয়তো ভেঙে ঢুকব! কি হলো? দরজা খোল! মরিস!'

ক্যামেরা দুটো খাটের নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে গায়ের কালো চামড়ার জ্যাকেট আর পুলওভার খুলে ফেলল রানা দ্রুত হাতে। ও দুটোও খাটের নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে বোতল থেকে খানিকটা ব্র্যান্ডি হাতের তালুতে নিয়ে দুই হাত ঘষল, মুখে মাখল, তারপর ঝপাং করে পড়ল বিছানার উপর।

দড়াম করে খুলে গেল দরজা মাইকেল হ্যামারের প্রচণ্ড লাথি খেয়ে। হুড়মুড় করে ঢুকল সে। পিছু পিছু জেমস মিচেল। দেখা গেল জুতো পরা অবস্থায় উল্টোপাল্টা ভঙ্গিতে শুয়ে আছে মরিস রেনার। একটা হাত ঝুলছে খাটের বাইরে, আরেক হাতে ধরা রয়েছে ব্র্যান্ডির বোতল। গভীর ঘুমে

অচেতন।

এগিয়ে এল হ্যামার। সারা ঘরে উৎকট মদের গন্ধ। নিচু হয়ে ঝুঁকে বোতলটা কেড়ে নিল সে রানার অসাড় হাত থেকে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চাইল মিচেলের দিকে।

'চেয়ে দেখো—ব্লু অ্যাঞ্জেলের সেরা ড্রাইভার!'

'ওই দেখো!' আঙুল তুলে আরেকটা বোতলের দিকে দেখাল মিচেল। টেবিলের উপর চার ভাগের তিন ভাগ খালি একটা হুইস্কির বোতল। 'গোপনে মদ খাচ্ছে ও আজকাল।'

মুখ বিকৃত হয়ে গেল হ্যামারের—যেন ছুরি ঢুকে গেছে বুকের মধ্যে। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল বোতলটা—সুটকেস ঘেঁটে বের করল আস্ত আরেকটা বোতল।

'জেমস! প্লীজ! এসব কথা যেন পেপারে না ওঠে। এটা আমার বিশেষ অনুরোধ।'

তিনটে বোতলই বগলদাবা করতে দেখে মিচেল বলল, 'সে না হয় হলো, কিন্তু এগুলো নিয়ে যাচ্ছ, টের পেয়ে যাবে তো!'

'টের পেয়ে কি কচু করবে ও আমার?' কটমট করে চাইল সে ঘুমন্ত রানার মুখের দিকে। 'ওর সাধ্য আছে কারও কাছে নালিশ করবার?' একটু সামলে নিয়ে বলল, 'ওর সামনে থেকে প্রলোভন দূর করা দরকার।'

'ও কচি খোকা নাকি? চাকরি যাওয়ার ভয়ে নালিশ হয়তো করবে না, কিন্তু আরও বোতল সংগ্রহ করায় বাধা কোথায়? এভাবে ঠেকানো যাবে ওকে?'

'জানি, জেমস। কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে। ছেলেটাকে এভাবে নষ্ট হয়ে যেতে দিতে পারি না আমরা। তাই না? আমার নিজের ছেলে হলে কানটা ছিঁড়ে ফেলতাম। পরের ছেলে বলে যে ছেড়ে দেব, তা নয়। দরকার হলে গোয়েন্দা লাগাব আমি ওর পেছনে।'

বোতলগুলো বগলদাবা করে ধুপধাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল বৃদ্ধ। করিডরে বেরিয়ে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল মিচেল।

ওদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই উঠে বসল রানা। বাথরূম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়ল আলো নিভিয়ে।

চার

একের পর এক গ্র্যান্ডপ্রিক্স হারতে শুরু করল রানা। সেই দুর্ঘটনার পর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছে সে। একেবারে একা হয়ে গেছে। কারও সাথে কোন কথা নেই। মাতলামির লক্ষণও দেখা গেছে ওর মধ্যে, যদিও সবার সামনে মদ খেতে দেখা যায়নি ওকে আর।

আলফ্রেড গার্বারের মৃত্যুর পর থেকে যেন অন্য এক মানুষ হয়ে গেছে সে। সবাই—ভক্ত, সমালোচক, শুভাকাঙ্ক্ষী—বুঝে নিয়েছে শেষ হয়ে গেছে মরিস রেনার। ভেঙে গেছে ওর ইস্পাতদৃঢ় মনোবল, দুর্দমনীয় সাহস, শান্ত স্নায়ু। জুলিয়া পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে ওর এই পরিবর্তনে। কিসের যেন ঘোরে রয়েছে মাসুদ রানা।

ইংল্যান্ডের গ্র্যান্ডপ্রিক্সে প্রথম ল্যাপেই আউট হয়ে গেল সে; কেউ আহত বা নিহত হয়নি, কিন্তু যেটা চালাচ্ছিল সেই ব্লু অ্যাঞ্জেলটা বাতিল হয়ে গিয়েছে চিরদিনের জন্যে। দুটো চাকাই বার্স্ট করেছিল। আন্দাজ করা হয়, অন্তত একটা চাকায় লিক ছিল রেস শুরু হওয়ার আগেই নইলে চলতে চলতে হঠাৎ পাগলের মত ব্যবহার শুরু করবার আর কোন কারণ নেই। অবশ্য সবাই একথা মেনে নিতে পারেনি। ব্রনসনের ধারণা, দোষটা গাড়ির নয়—চালকের। অর্থাৎ মরিস রেনারের।

দশ দিন পর জার্মান গ্র্যান্ডপ্রিক্স তেইশ জনের মধ্যে বাইশ নম্বর হলো রানা। বিজয়ী হলো হ্যানসিঙ্গার। এতে মাইকেল হ্যামারের খুশি হওয়ার কথা—ব্লু অ্যাঞ্জেলই জয়ী হয়েছে; কিন্তু তার প্রিয় মরিসের জন্যে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে উঠল বৃদ্ধ; ফোঁস ফোঁস দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বেড়াল সারাটা দিন। একবার জুলিয়াকে ধরে বকা দেয়ার চেষ্টা করল, বোঝাবার চেষ্টা করল রেনারের এই অধঃপতন ঠেকাবার দায়িত্ব তার—কিন্তু জুলিয়ার চোখ দুটো অশ্রু সজল হয়ে উঠতে দেখে চট করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল।

রানার এই পরিবর্তনে ঘাবড়ে গেছে জুলিয়াও। সে-ও টের পেয়েছে গোপনে মদ খাচ্ছে রানা। কি ঘটছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না, কিছু জিজ্ঞেস করবারও উপায় নেই। কাজে যোগ দেয়ার পর দিনই রানা কথা আদায় করে নিয়েছিল ওর কাছ থেকে। বলেছিল যতদিন পর্যন্ত না তোমার ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে একটা কিছু সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে, এসব ব্যাপারে নাক গলানো তো দূরের কথা কোন প্রশ্নও করতে পারবে না। এটা পুরুষ মানুষের ব্যাপার, এর মধ্যে জড়াতে পারবে না কিছুতেই। তুমি আড়ালে থাকবে। আড়ালেই আছে সে। রানাকে কি কাজ দিয়েছে ওর বাবা, কতদূর এগিয়েছে ওরা—কিছুই জানে না সে। আড়াই মাস পার হয়ে গেল, দুর্ঘটনায় মারা গেল গার্বার, জনপ্রিয় মরিস রেনার জর্জরিত হলো প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে, হারতে শুরু করল, ভেঙে পড়ল, একঘরে হয়ে গেল—এখনও কি সে পলের মৃত্যুর কারণ খুঁজছে, নাকি নিজের ব্যক্তিগত পরাজয়ের গ্লানি নিয়েই ব্যস্ত? বাবাই বা কি করছে? সবাই চুপচাপ কেন?

হাজার হোক জুলিয়া নিজে একজন চ্যাম্পিয়ান। হেরে যাওয়ার কেমন কষ্ট জানা আছে ওর। সুনামের শিখর থেকে নেমে আসতে বাধ্য হলে কি অসহ্য যন্ত্রণা হয় জানা আছে। ও-ই আবিষ্কার করেছিল রানাকে, রানার জয়কে এতদিন নিজের জয় বলে মনে করেছে সে। একটা মোহ আচ্ছন্ন করেছিল ওকে এতদিন। রেসের নেশা। ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই

গিয়েছিল একের পর এক বিজয়ে। এখন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে সে সব চিন্তা। রানার কি মনে আছে, কেন ওকে বাধ্য করা হয়েছিল গ্র্যান্ডপ্রিক্সে যোগ দিতে? মনে আছে কাজের কথা?

রানাকে নিয়ে গোপনে হাসাহাসিটা কিছুতেই সহ্য হয় না ওর। জার্মান গ্র্যান্ডপ্রিক্সে বাইশ নম্বর হয়ে যুক্তি দেখিয়েছিল রানা—হাই রেভে পাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে না। ব্রনসনের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, অদ্ভুত ব্যাপার, মাঝে মাঝে পুরোদমে চলছে, মাঝে মাঝে কিছুতেই এগোতে চাইছে না। আড়ালে হাসাহাসি করছে সবাই ব্যাপারটা নিয়ে। ব্রনসন নিজে চালিয়ে দেখেছে গাড়িটা, হ্যামার নিজে চালিয়েছে, কিন্তু রানার বক্তব্য অনুযায়ী পাওয়ারের কমবেশি পাওয়া যায়নি। অবশ্য তাদের পক্ষে রানার সমান স্পীডে গাড়ি চালানো সম্ভব হয়নি, হয়তো ম্যাক্সিমাম স্পীডে এই ঘটনাটা ঘটতেও পারে—এই বলে ব্যাপারটা চাপা দেয়া হয়েছে।

এর ঠিক দশ দিন পর অস্ট্রিয়ান গ্র্যান্ডপ্রিক্সেও বিজয়ী হলো হ্যানসিঙ্গার। রানা কিছুই হলো না। শুরুটা চমৎকার হয়েছিল ওর। এক ঝটকায় এগিয়ে গিয়েছিল সে সবার আগে। পঞ্চম ল্যাপ পর্যন্ত এগিয়ে থেকে ষষ্ঠ ল্যাপে হঠাৎ ফিরে এল সে ব্লু অ্যাঞ্জেল পিটে। সহজ ভঙ্গিতে নেমে এল ককপিট থেকে। কোন রকম উদ্বেগ বা উত্তেজনার প্রকাশ নেই চেহারায়। কিন্তু হাত দুটো ঢোকানো রয়েছে ওভারলের পকেটে। যেন কিছু গোপন করছে।

ছুটে এল অনেকে, পকেট থেকে একটা কম্পিত হাত বের করে সবাইকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করল রানা, তারপর চট করে আবার পুরল হাতটা পকেটের মধ্যে। দিশেহারা উন্মাদিনীর মত ছুটে এল জুলিয়া।

'ঘাবড়িয়ো না, জুলিয়া,' বলল রানা চাপা গলায়। 'ঠিকই আছি আমি। অত ব্যস্ত হবারও কিচ্ছু নেই। ফোর্থ গিয়ারটা নষ্ট হয়ে গেছে।' ট্র্যাকের দিকে চেয়ে রইল সে।

মাইকেল হ্যামার ছুটে এল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করল রানাকে। লক্ষ করল পকেটের ভিতরেও কাঁপছে ওর হাত। মিচেলের দিকে চাইল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। তারপর বলল, 'হুবার্টকে ফিরিয়ে আনব? তুমি ওর গাড়িটা চালাতে পারো।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল রানা। একটা ইঞ্জিনের শব্দ এগিয়ে আসছে কাছে। ট্র্যাকের দিকে ইঙ্গিত করল সে মাথা ঝাঁকিয়ে। সবাই চাইল সেদিকে। নীল একটা ব্লু অ্যাঞ্জেল বেরিয়ে গেল সাঁ করে কিন্তু তবু ঘাড় ফিরাল না রানা, এক হাজার এক, এক হাজার দুই করে গুনে গেল এক হাজার পনেরো পর্যন্ত। তারপর ফোরস্টার টীমের মার্কাস কাপলানের সবুজ গাড়িটা দেখা গেল। এবার ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা হ্যামারের দিকে।

'ওকে ফিরিয়ে আনা কি ঠিক হবে? খেপেছেন? আমি আউট হয়ে যাওয়ায় হুবার্ট এখন পনেরো সেকেন্ড আগে রয়েছে। কিছুতেই হারতে পারে না এখন আর। পর পর দুটো গ্র্যান্ডপ্রিক্সের গৌরব অর্জন করতে যাচ্ছে ও আজ জীবনের

প্রথম। ওকে ফিরিয়ে আনলে আপনাকে বা আমাকে ও জীবনে ক্ষমা করতে পারবে বলে মনে করেন?'

কথাটা বলে আর দাঁড়াল না রানা। ল্যান্সিয়ার দিকে ওকে এগোতে দেখে রানার হাত ধরবার চেষ্টা করল জুলিয়া, চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গেছে ওর, আশাভঙ্গ হওয়ায় ম্লান হয়ে গেছে মুখটা। কিন্তু এসব কিছুই দেখল না রানা, এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুতপায়ে এগোল ওর গাড়ির দিকে। কিছু একটা বলবার জন্যে মুখ খুলেছিল হ্যামার, রানার পিছু পিছু কয়েক পা এগিয়ে থেমে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ ঘুরে রওনা হলো পিটের দিকে। জেমস মিচেলও গেল ওর সাথে। লোকজনের থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরেই থেমে দাঁড়াল হ্যামার, ফিরল মিচেলের দিকে।

'কি বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল হ্যামার।

'কি ব্যাপারে?'

'লক্ষ করোনি তুমি?' আবার প্রশ্ন করল হ্যামার।

'ওর হাত?'

'হ্যাঁ। কি রকম কাঁপছিল খেয়াল করেছ? এ আর কিচ্ছু না—নার্ভাস ব্রেক ডাউন। কোন সন্দেহ নেই জেমস, শেষ হয়ে গেছে ছেলেটা। তোমাকে আগেই বলেছিলাম…যত শান্ত হোক, যত সাহসী হোক, যতই থাকুক স্নায়ুর জোর, এক সময় না এক সময় ভেঙে পড়বেই— প্রমাণ পেলে এখন? দুর্দান্ত একটা ছেলে পেয়েছিলাম। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, যে যত শক্ত, তার ভাঙনটা আসে ততই আকস্মিক ভাবে। গেল ছেলেটা। এখন ফিরে গিয়ে আবার বোতল টানবে।'

'এখনও চলছে নাকি? তুমি না বলেছিলে গোয়েন্দা লাগাবে ওর পিছনে?'

'লাগিয়েছি। তার পরেও তিন-চারটে বোতল সরাতে হয়েছে আমার ওর ঘর থেকে। কখন ওসব সংগ্রহ করে কেউ জানে না। নিয়মিত খাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'প্রমাণ আছে কোন?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল মিচেল হ্যামারের চোখের দিকে। রিমলেস চশমা ঠিক করল নাকের উপর।

একটু ইতস্তত করল বৃদ্ধ। 'কেউ দেখেনি খেতে। আমিও না। কিন্তু আমি যখন আধ খাওয়া বোতল পেয়েছি ওর ঘরে তখন এটাকে প্রমাণ হিসেবে ধরতে পারো অনায়াসে।'

'এর পরেও ওকে রেসট্র্যাকে নামতে দিচ্ছ? জি. পি. ডি. এ. টের পেলে কি অবস্থা হবে কল্পনা করতে পারো? তাছাড়া অন্যান্য ড্রাইভারের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ওকে আটকানো উচিত তোমার। ওলফ্যাক্টরি এভিডেন্স নিয়ে বরখাস্ত করা উচিত।'

'সেটা আমার করতে হবে না,' বলল হ্যামার বিষণ্ণ হাসি হেসে। 'ওরাই ব্যবস্থা করছে। আগামী গ্র্যান্ডপ্রিক্সে নামার আগে রক্ত পরীক্ষা না করে ছাড়বে না ওকে। কানাঘুষোয় শুনতে পেলাম।'

'যদি রক্তে অ্যালকোহল পাওয়া না যায়?'

'তবু খুব সম্ভব আগামী গ্র্যান্ডপ্রিক্সই ওর জীবনের শেষ গ্র্যান্ডপ্রিক্স। যার নার্ভ শেষ হয়ে গেছে, তাকে অযথা মাঠে নামাবার কোন মানে হয় না। অনেক ভেবে আমি মনস্থির করেছি—আর একটা গ্র্যান্ডপ্রিক্স দেখব।

দর্শকের গ্যালারিতে বিরক্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল একজন বেঁটে খাটো মোটাসোটা লোক, রুডলফ গুন্থার। অত্যন্ত দামী পোশাক পরিচ্ছদ, ঠোঁটে মোটা চুরুট। গুন্থারকে উঠে দাঁড়াতে দেখেই বেশ কিছুটা দূরে দূরে বসা আরও তিনজন লোক উঠে দাঁড়াল যন্ত্রের মত।

কোনদিকে না চেয়ে নিজের রোলসরয়েসের দিকে এগোল রুডলফ গুন্থার। স্যালিউট করে গাড়ির দরজা মেলে ধরল শোফার। গাড়ির কাছে গিয়ে পিছন ফিরল গুন্থার। সেই তিনজন পৌঁছে গেছে।

'শয়তানী শুরু করেছে রেনার,' বলল গুন্থার। 'গাড়ি আজ ঠিকই ছিল। আমি হোটেলে ফিরছি টমাস। তুমি, বর্গ, আর গুস্তাভ, তিনজন মিলে যেখান থেকে যেমন ভাবে পারো তুলে নিয়ে আসবে ওকে। আমার হোটেলে না—গুস্তাভের ওখানে। এনে ফোন করবে আমাকে। আমি কথা বলতে চাই ওর সাথে। কাজেই শুধু প্রাণ থাকলে চলবে না, দেখো জ্ঞানও যেন থাকে।'

'ইয়েস, স্যার।' অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল টমাস মুলার।

গাড়িতে উঠে বসল রুডলফ গুন্থার। চলতে শুরু করল গাড়িটা।

ওরা তিনজন ছুটল পার্কিং লটে দাঁড়ানো একটা তোবড়ানো শেভ ইম্পালার দিকে।

রেসট্র্যাকের কাছেই এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন টীমের বিশাল সব ট্র্যান্সপোর্টার। এগুলোর মধ্যে করেই রেসিংকার এবং স্পেয়ার পার্টসের বড় বড় বাক্সগুলো বয়ে নেয়া হয় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আবছা অন্ধকারে আরও বিশাল মনে হচ্ছে ওগুলোকে।

অন্ধকার আর একটু ঘন হয়ে আসতেই সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল রানা ওই দিকে। কাঁধে একটা ক্যানভাসের ব্যাগ, আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ফেরারী লেখা একটা ট্র্যান্সপোর্টারের পিছনে এসে থামল সে। ফোরস্টারের ট্রাক। গোটা কয়েক উদ্ভট আকৃতির চাবি দিয়ে চেষ্টা করতেই খুলে গেল দরজাটা। ভিতরে ঢুকে আবার চাবি লাগিয়ে দিল সে, চাবিটা রেখে দিল গর্তের মধ্যে। প্রথম পাঁচ মিনিট এ জানালা ঘুরে বাইরেটা পরীক্ষা করল সে। কেউ ওকে দেখে ফেলেনি সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে টর্চটা বের করে শুরু করল সার্চ। একে একে প্রত্যেকটা গাড়ি, প্রত্যেকটা বাক্স পরীক্ষা করছে সে গভীর মনোযোগের সাথে।

বিশ মিনিট পর একটা স্পেয়ারের বাক্স খুলে ঝুঁকে ভিতরটা পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। কান পাতল। চট করে টর্চটা নিভিয়ে দিয়ে একটা জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। আবছা চাঁদের আলোয় দেখা গেল

দু'জন লোক এগিয়ে আসছে। সোজা ব্লু অ্যাঞ্জেল ট্র্যান্সপোর্টারের দিকে চলছে ওরা। আরেকটু কাছে আসতেই চিনতে পারল রানা—মাইকেল হ্যামার আর হুগো ব্রনসন। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে এগোচ্ছে।

দরজার কাছে ফিরে এসে চার ইঞ্চি ফাঁক করল রানা একটা কপাট. এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ব্লু অ্যাঞ্জেল ট্র্যান্সপোর্টারের পিছন দিকটা। চাবি ঢোকাল হ্যামার তালায়।

'কোনই সন্দেহ নেই তাহলে?' বলছে সে ব্রনসনকে। 'মিথ্যে বলেনি রেনার। ফোর্থ গিয়ার সত্যিই ভাঙা?'

'একেবারে।'

'তোমার অভিযোগ ফিরিয়ে নিতে রাজি আছ তাহলে?' একটা খুশি খুশি ভাব হ্যামারের কণ্ঠে। 'মেনে নিচ্ছ, দোষটা রেনারের নয়?'

'ফোর্থ গিয়ার ভেঙে ফেলবার বেশ কয়েকটা সহজ কায়দা আছে, স্যার।' ব্রনসনের বক্তব্য অর্থপূর্ণ।

'তা আছে, তা আছে। এসো, দেখা যাক গিয়ার বক্সের অবস্থাটা।'

ট্র্যান্সপোর্টারের ভিতরে চলে গেল ওরা দু'জন। বাতি জ্বলে উঠল। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠল রানার। আবার কাজে মন দিল সে। গাড়িগুলো দেখা হয়ে গেছে। একের পর এক বাক্স খুলছে সে এখন, ভিতরটা পরীক্ষা করছে, তারপর সযত্নে বন্ধ করছে ডালা। অত্যন্ত দ্রুত কাজ করছে সে। পাঁচ মিনিট পর বাইরে খুটখাট আওয়াজ পেয়ে আবার জানালার ধারে এসে দেখল ব্রনসন আর হ্যামার নেমে আসছে। ব্লু অ্যাঞ্জেল ট্র্যান্সপোর্টার থেকে। চলে গেল ওরা কথা বলতে বলতে।

আর তিন চারটে বাক্স বাকি আছে। হাঁফ ছেড়ে কাজে মন দিল রানা আবার।

সিকি মাইল দূরে পার্ক করা রয়েছে রানার ল্যান্সিয়া। ক্যানভাসের ব্যাগটা সীটের উপর ফেলে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল, এমনি সময়ে গাড়ির ওপাশ থেকে উঠে দাঁড়াল একটা আবছা ছায়ামূর্তি।

'খবরদার! টু শব্দ করবে না!'

হাতে ধরা পিস্তলটা দেখল রানা, পিছনে মশ মশ পায়ের শব্দে টের পেল আরও লোক আছে। কাজেই টু শব্দ না করে মাথার উপর হাত তুলল সে। দপ করে জ্বলে উঠল একটা গাড়ির হেডলাইট, এগিয়ে এল কাছে। শেভ ইম্পালা।

'ভয় নেই,' পিছন থেকে কথা বলে উঠল একজন। 'হাত নামাও মাথার ওপর থেকে। ওঠো এই গাড়িতে। বস্ কথা বলতে চায় তোমার সাথে। গোলমাল না করলে মারধোর করব না। উঠে পড়ো।'

'কিসের কথা? কে বস্ তোমাদের?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ধাঁই করে কনুই পড়ল রানার পাঁজরের উপর। পর মুহূর্তে লাথি পড়ল কোমরে। ছিটকে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা শেভ ইম্পালার গায়ে। দাঁত

চেপে শূকর সংক্রান্ত বাংলা গালি দিল সে।

'আর একটা কথাও শুনতে চাই না,' বলল পিছনের লোকটা। 'ওঠো!'

বিনা-বাক্য-ব্যয়ে পিছনের সীটে উঠে বসল রানা। ওর দু'পাশে উঠল দু'জন পিস্তলধারী। তুফান বেগে ছুটল গাড়ি। এরাস্তা ওরাস্তা, এগলি ওগলি হয়ে প্রায়ান্ধকার একটা ছোট্ট একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা। ড্রাইভার নেমে গিয়ে তালা খুলে কপাট দুটো হাঁ করে দিতেই পিস্তল দিয়ে রানার পেটে গুঁতো মারল একজন। নেমে পড়ল রানা।

ভিতর দিকের একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। একটা চেয়ারের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল তিনজন। বাঁধন পরীক্ষা করল রানা। চেষ্টা করলে খোলা যায়। কিন্তু চেষ্টা না করে অপেক্ষা করাই স্থির করল সে মনে মনে।

ঠিক দশ মিনিট পর ঘরে ঢুকল সেই সুবেশী বেঁটে মোটা লোকটা— দাঁতের ফাঁকে চুরুট। এমন ভাবে ঢুকল, যেন কুষ্ঠ রোগীর কুঁড়ে ঘরে ঢুকছে। সাথে আসছিল বাকি তিনজন, কিন্তু লোকটা হাতের অসহিষ্ণু ইশারা করতেই বাইরে গিয়ে দরজা ভিড়িয়ে দিল।

ঘরের চারিপাশে চেয়ে একটা গদিআঁটা চেয়ার টেনে নিয়ে এল লোকটা রানার সামনে। বসল বিরক্ত ভঙ্গিতে, ঘরের চারপাশে চাইল লোকটা, যেন নোংরা আবর্জনা দেখছে। সেই একই দৃষ্টি শেষ পর্যন্ত স্থির হলো রানার মুখের উপর এসে।

'আমি রুডলফ গুন্থার,' বলল লোকটা। 'খুব সম্ভব আমার নামটা জানা আছে আপনার?'

মাথা নাড়ল রানা। সত্যিই শোনেনি এ নাম। বলল, 'আমাকে এভাবে ধরে নিয়ে আসার কারণ?'

'বলছি। তার আগে জবাব দিন, আজকের রেসটা বর্জন করলেন কেন।'

'ফোর্থ গিয়ারটা ভেঙে গেল। আমি···'

'ওটা আপনি ইচ্ছে করে ভেঙেছেন। ইচ্ছে করে আজ আপনি আমার প্ল্যান-প্রোগ্রাম নষ্ট করেছেন।'

'দেখুন,' বলল রানা, 'আপনি কে তাই আমার জানা নেই, আমার রেস বর্জনের সাথে আপনার প্ল্যান-প্রোগ্রামের কি সম্পর্ক সেটাও জানি না, জানার ইচ্ছেও নেই। তবে গ্র্যান্ডপ্রিক্সের রেস সম্পর্কে একটু খোঁজ খবর নিলেই জানতে পারবেন গত কয়েকটা রেসে ভাগ্যদেবী মোটেই সাহায্য করছেন না আমাকে। আমি ভাবতে শুরু করেছি, শুধু ভাগ্যদেবীই নয় এর পিছনে কোন মানুষের হাত থাকাও বিচিত্র নয়। ফ্রান্সে তো মারাই পড়ল একজন, ইংল্যান্ডে ফেটে গেল চাকা, জার্মানীতে গোলমাল শুরু করল পাওয়ার ট্র্যান্সমিশন···'

'এ সবই জানা আছে আমার। এক বাক্যে মেনে নেব: দোষ ছিল গাড়িতে। কিন্তু আজ? আজ তো কোন দোষ ছিল না, মিস্টার রেনার—ইচ্ছে করেই নষ্ট করেছেন আজ আপনি গিয়ারটা। আমি জানতে চাই—কেন?'

কোন জবাব না দিয়ে লোকটার চোখের দিকে চেয়ে রইল রানা। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না।

'ভয় পেয়েছেন?' রানার জবাব না পেয়ে আবার বলল গুন্থার। হাসল। 'সেক্ষেত্রে আপনাকে দোষ দেয়া যায় না। গত কয়েকটা রেসে পর পর যার ভাগ্য বিপর্যয় হয় তার পক্ষে ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। হয়তো আশা করেছিলেন, আজও কিছু একটা ঘটবে। মারাত্মক কিছু ঘটবার আগে নিজেই গিয়ারটা ভেঙে ফিরে এলেন পিটে। তাই না?'

'আজ দোষ ছিল না সেটা আপনি এত জোর দিয়ে কি করে বলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এবং তাই যদি বলতে পারি তাহলে এটাও নিশ্চয় জানি যে এর আগের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দোষটা ছিল গাড়ির, আপনার নয়। কি করে জানলাম? বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়, মিস্টার রেনার। অত সময় আমার হাতে নেই। আমি সবই জানি।'

'আপনার জ্ঞানের বহর দেখাবার জন্যে নিশ্চয় ধরে আনা হয়নি আমাকে?'

'না। বিশ হাজার ডলার পাবেন; গাড়িতে কোন গোলমাল থাকবে না—মনযা ট্র্যাকে জিততে হবে আপনার। আজ ক্ষতি হয়েছে আমার। আগামী গ্র্যান্ডপ্রিক্সে হয় এ ক্ষতি পূরণ করে দেবেন, নয়তো ওটাই আপনার জীবনের শেষ গ্র্যান্ডপ্রিক্স হবে। বুঝতে পেরেছেন?'

'কিছুই বুঝতে পারিনি। আমার হারজিতের উপর আপনার লাভ ক্ষতি কিভাবে নির্ভর করছে...'

'বুঝতে পারছেন না।' রানার বক্তব্য শেষ করল গুন্থার। 'না বোঝাই আপনার জন্যে মঙ্গলজনক হবে। আমার পরিচয় জানা থাকলে এত প্রশ্ন করবার ধৃষ্টতা আসত না আপনার মধ্যে। যেহেতু জানা নেই, ক্ষমা করে দিচ্ছি আমি আপনাকে। শুধু জেনে রাখুন, আজ থেকে মনযা গ্র্যান্ডপ্রিক্সের দিন পর্যন্ত আপনার প্রতিটা গতিবিধির উপর নজর রাখবে আমার লোক, ছায়ার মত লেগে থাকবে আপনার সাথে। আমার আদেশের অন্যথা হলে পরদিন আপনার লাশ পাওয়া যাবে রাস্তার ধারে। কেউ বাঁচাতে পারবে না আপনাকে।'

উঠে দাঁড়াল রুডলফ গুন্থার।

'আমার ক্ষমতা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই আপনার, মিস্টার রেনার। আমার কোপদৃষ্টি পড়লে আপনাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আমার আদেশ অমান্য করে পুলিসের কাছে গিয়ে লাভ নেই—আপনার অভিযোগ শুনে প্রাণ খুলে হাসবে ওরা। যে সে লোক আমি নই। মনে রাখবেন: আগামী গ্র্যান্ডপ্রিক্সে কোন ত্রুটি থাকবে না গাড়িতে, জিততে হবে আপনাকে, জিতলে বিশ হাজার ডলার পাবেন। আর যদি হারেন...' ডান চোখটা বন্ধ করে হাত দিয়ে কঁাকাটার ভঙ্গি করল গুন্থার। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে কারও উদ্দেশে বলল, 'ওকে যেখান থেকে এনেছ সেইখানে ছেড়ে দিয়ে এসো, টমাস।'

বিশ সেকেন্ড পর একটা রোলসরয়েসের এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল রানা।

ঘরে ঢুকল সেই তিনজন।

পাঁচ

হোটেল করোন্যাডোর বিশেষ আমন্ত্রণে গ্র্যান্ডপ্রিক্স টীমগুলো খুশিমনে আতিথ্য গ্রহণ করল ওদের। মিলান থেকে দশ মাইল উত্তরে মন্‌যা শহরের উপকণ্ঠে এই বিশাল হোটেল। খাওয়া-থাকা ফ্রী। এতবড় বিজ্ঞাপনের সুযোগ পেয়েই ধন্য হয়ে গেছে হোটেল কর্তৃপক্ষ।

'রেনারকে দেখছি না?' বলল মিচেল। নড়ে বসল আর্মচেয়ারে।

'নতুন গাড়িটার সাসপেনশন আর গিয়ার রেশিও অ্যাডজাস্ট করবার জন্যে খুব পরিশ্রম করছে গত দু'দিন থেকে। হয়তো টের পেয়েছে এটাই ওর শেষ সুযোগ।'

'কিন্তু…গাড়িটা ওকে না দিয়ে হ্যানসিঙ্গারকে দিলে ভাল হত না?'

'অসম্ভব। তুমি তো প্রোটোকলের ব্যাপারটা জানো। ব্লু অ্যাঞ্জেলের এক নম্বর ড্রাইভারকে দিতেই হবে ওটা। পয়েন্টের দিক থেকে রেনারই এখন পর্যন্ত আমাদের সেরা ড্রাইভার।'

'ওর মানসিক অবস্থার কথা স্পনসারদের জানালেও কি ওরা চাপাচাপি করবে?'

'রেসের সাথে তো শুধু স্পনসাররাই জড়িত নয়, জেমস। পাবলিক ওপিনিয়ন বলেও একটা ব্যাপার রয়েছে। পাবলিকের চোখে এখনও হিরো আমাদের মরিস। গাড়ি কোম্পানীর মালিকরা কি চায়? বিজ্ঞাপন। অত বিরাট করে গাড়ির গায়ে কোম্পানীর নাম লেখা হয় কেন? কোনও কোম্পানীর রেসিং কার গ্র্যান্ডপ্রিক্স বিজয়ী হওয়া মানেই যে সেই কোম্পানীর সাধারণ গাড়িগুলোও ভাল হতে হবে তার কোন মানে নেই। কিন্তু জনসাধারণ তো আর সেটা বোঝে না। ওরা ওই কোম্পানীর সেডান, সেলুন, কুপে কিনেই খুশি। হুকুম, নতুন গাড়ি দিতে হবে মরিস রেনারকে। ওদের আদেশ মানতে আমরা বাধ্য।'

খানিক চুপ করে রইল মিচেল, তারপর বলল, 'অবশ্য বলা যায় না কিছুই। ইটালিয়ান গ্র্যান্ডপ্রিক্সে হয়তো বাজি মাত করে বসতে পারে রেনার—বলা যায় না।'

'তাহলে আধ ঘণ্টা আগে ওর ঘর থেকে যে বোতলগুলো পাওয়া গেল, তার কি ব্যাখ্যা?' কঠোর হয়ে গেল বৃদ্ধ হ্যামারের মুখটা। 'তুমি বলতে চাও, ও খাচ্ছে না, আপনিই বাতাসে উড়ে গিয়ে খালি হয়ে যাচ্ছে বোতলগুলো?'

জিভ দিয়ে চুক চুক আওয়াজ করল জেমস মিচেল। রিমলেস চশমাটা ঠিক করে বসাল নাকের উপর। তারপর প্রসঙ্গান্তরে গেল।

'কোন খবর পেলে মাইক? মার্সেই ...?'

'উঁহুঁ। আশা ছেড়ে দিয়েছি আমি, জেমস। আড়াই মাস হয়ে গেল কোন খবর বের করা গেল না এলিনার। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকলে জানা যেত। এ বয়সে আর কারও সাথে ভেগে যাবে, সে সম্ভাবনা নেই। কিডন্যাপ হলে টাকা চেয়ে চিঠি আসত। এসব কিচ্ছু না। হাওয়া। কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। ডুবে টুবে গেলে...কিন্তু তাহলে লাশটা তো ভেসে উঠত।'

'স্মৃতিভ্রংশ বা ওই রকম কিছু...'

'যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে বলতে হয়, কোটিপতি মাইকেল হ্যামারের স্ত্রী এলিনা হ্যামারের পক্ষে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে বা মাথার গোলমাল হয়ে হারিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ওখানে এত লোকে চেনে ওকে যে কারও না কারও চোখে পড়তই। ওই এলাকায় আমরা শুধু বড়লোকই নই, জেমস, পরিচিতও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন করল মিচেল। এলিনা হ্যামারের পক্ষে এভাবে হারিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। হঠাৎ আজকের রিসেপশনের কথা মনে হতেই সচকিত হয়ে উঠল।

'মেয়রের রিসেপশনের কথা সবাইকে জানানো হয়েছে তো? যাচ্ছে সবাই?'

'রেনার ছাড়া সবাইকে জানানো হয়েছে। ও এসে পৌঁছলেই তাগাদা দেয়া যাবে সবাইকে।' কথা বলতে বলতে চোখ তুলেই দেখতে পেল সে রানাকে। ডাইনে বাঁয়ে কারও দিকে না চেয়ে সোজা এগিয়ে আসছে এদিকে। 'ওই দেখো, আজ বোধহয় পেটে কিছু পড়েনি, নইলে যমের মত এড়িয়ে যেত আমাকে।'

ঘরভর্তি সবাই চেয়ে আছে ওর দিকে, টের পাচ্ছে রানা, কিন্তু কোনদিকে না চেয়ে এগিয়ে এল সে হ্যামার ও মিচেলের টেবিলের দিকে।

'শুনলাম রিসেপশন দিচ্ছে আজ মেয়র?'

'হ্যাঁ। তার আগে শোনা যাক নতুন ব্লু অ্যাঞ্জেল কেমন চলছে? কি বুঝছ?'

'প্রায় রেডি হয়ে গেছে রেসের জন্যে। দু'দিন দেরি আছে তো...তার আগেই ঠিক হয়ে যাবে। ব্রনসন শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছে রেশিয়োর সামান্য পরিবর্তন দরকার।'

'তোমার কোন কমপ্লেন নেই তাহলে?'

'না। গাড়িটা চমৎকার। আমাদের সেরা গাড়ি। খুব চালু'

'কতটা চালু?'

'এখনও বলা যাচ্ছে না। রেকর্ড ব্রেক করতে পারিনি এখনও, কিন্তু শেষ দু'বার ল্যাপ-রেকর্ড ধরে ফেলেছি।'

'দ্যাট্স গুড!' ঘড়ি দেখল হ্যামার। 'এবার তৈরি হয়ে নাও। জলদি। আধ ঘণ্টার মধ্যে রওনা হব আমরা।'

'আমি যাচ্ছি না সেই কথাটাই বলতে এসেছি। ক্লান্তি লাগছে। এখন

স্নান সেরে ঘুমাব ঝাড়া দুটো ঘণ্টা, তারপর ডিনার খেয়ে আবার ঘুম দেব।'

'বলে কি!' অবাক হয়ে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল হ্যামার। 'তুমি যাচ্ছ না রিসেপশনে?'

'না, শরীরটা ভাল লাগছে না।'

'তুমি মেয়রের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করছ? অনেক হোমড়া-চোমড়া লোক আসবে আজ শুধু তোমার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্যে। তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে এই ধরনের নিমন্ত্রণ পেলে যাওয়াটাই রেওয়াজ।'

'জানা আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু শরীর খারাপ থাকলে যে কেউ যে কোন রেওয়ায ভাঙতে পারে। আমি যাচ্ছি না। গ্র্যান্ডপ্রিক্সের জন্যে এসেছি আমি এখানে। উঁচু সমাজে মেলামেশার জন্যে নয়।'

কথাটা বলেই আর দাঁড়াল না রানা। একেক বারে তিন ধাপ করে সিঁড়ি টপকে চলে গেল উপরে।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাঁধ ঝাঁকাল মাইকেল হ্যামার।

ঘরের চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে খুশি হয়ে উঠল রানা। বোতলটা নেই। কার্পেটের নিচ থেকে আরেকটা চ্যাপ্টা বোতল বের করে বাথরুমের বেসিনে ঢেলে ফেলল অর্ধেক, বোতলের মুখে আঙুল চেপে মিলাদের গোলাপ পানির মত ঘরময় ছিটাল খানিকটা, তারপর মুখ এঁটে রেখে দিল ওটা বালিশের নিচে।

শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে দশ মিনিট ভিজল, সারাদিনের ক্লান্তি দূর করে তোয়ালে জড়িয়ে চলে এল সে ওয়ারড্রোবের সামনে। ভাঁজ করা ধোয়া স্যুট ঘুমাবার পোশাক নয়, কিন্তু তাই পরল রানা। জুতো-মোজা-টাই এঁটে নিয়ে আরাম কেদারায় বসল আরাম করে। সিগারেট ধরাল একটা।

'গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা। এক কাজে এসে বিভিন্ন ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে সে। কোন সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছানো তো দূরের কথা, দিনের পর দিন জটিলতর হচ্ছে সবটা ব্যাপার। এসেছিল পল কার্টারেটের হত্যা-রহস্য উদঘাটন করতে। আঁচ করা গেছে অনেক কিছুই, কিন্তু তেমন কোন আদালত-গ্রাহ্য তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যেই বার কয়েক ওর প্রাণের ওপর হামলা এসে গেছে। সে সবের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, কিন্তু এলিনা হ্যামারের গায়েব হয়ে যাওয়াটা? মার্কাস কাপলানের অতিরিক্ত ব্যয়ের ব্যাপারটা? তার সাথে যোগ হয়েছে রুডলফ্ গুন্থারের ব্যক্তিগত প্লট। সব মিলিয়ে একটা জগাখিচুড়ী অবস্থা দাঁড়িয়ে গেছে। তবে আজ হয়তো একটা কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যাবে। রানার অনুমান যদি সত্য হয়—এসবের পিছনে অত্যন্ত শক্তিশালী কোন দলের জটিল এক চক্রান্ত রয়েছে। বোঝা যাবে আজই। আজকের এই সুযোগের জন্যে অনেকদিন প্রতীক্ষা করেছে রানা। আজকের সুযোগটা সদ্ব্যবহার করতে পারলেই এক হপ্তার মধ্যে সব ঝামেলা চুকিয়ে দিয়ে নিজের কাজে যেতে পারবে সে।

মিনিট বিশেক পর একটা ভারী এঞ্জিনের গুরুগম্ভীর স্টার্ট নেয়ার শব্দে

সচকিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল রানা। বাতি নিভিয়ে দিয়ে জানালার সামনে চলে এল। পর্দা সরিয়ে নিচের দিকে চাইল কাঁচ ভেদ করে।

একটা লম্বা বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে গেটের বাইরে। বিভিন্ন টীমের ড্রাইভার, ম্যানেজার, চীফ মেকানিক উঠছে বাসে। সাংবাদিকও রয়েছে কয়েকজন। যাদের যাদের অনুপস্থিতি চাইছে আজ ও, তারা প্রত্যেকে গাড়িতে উঠল কিনা লক্ষ করল রানা। উঠেছে। মিচেল, ব্রনসন, হ্যানসিঙ্গার, কাপলান, জুলিয়া, হ্যামার—সবাই উঠল বাসে। বার দুই হর্ন দিয়ে আরও দু'মিনিট অপেক্ষা করল বাসটা, তারপর ছেড়ে দিল।

পাঁচ মিনিট পর ঠোঁটের কোণে সিগারেট ঝুলিয়ে নেমে এল রানা নিচে, গিয়ে দাঁড়াল রিসেপশন কাউন্টারের সামনে। সুন্দরী রিসেপশনিস্ট চোখ তুলে চাইতেই মিষ্টি করে হাসল রানা।

'গুড ইভনিং।'

'গুড ইভনিং, মিস্টার রেনার,' পৃথিবীর সেরা ড্রাইভারের সাথে কথা বলবার সুযোগ পেয়ে একেবারে গদগদ হয়ে গেল মেয়েটা। কৃতার্থ হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি সাহায্য করতে পারি, স্যার?' রানার ধোপ দুরস্ত বেশবাস দেখে মলিন হয়ে গেল হাসিটা। 'হায়, হায়! ছেড়ে দিয়েছে বাসটা!'

'আমার নিজস্ব ট্রান্সপোর্ট রয়েছে,' বলল রানা।

'ও, হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিলাম। লাল ল্যান্সিয়াটা। কিছু লাগবে আপনার, স্যার?'

'হ্যাঁ। চারজনের রুম নাম্বার দরকার আমার। মাইকেল হ্যামার, মার্কাস কাপলান, হুবার্ট হ্যানসিঙ্গার, আর হুগো ব্রনসন। ওদের নাম্বারগুলো দিতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই,' বলল মেয়েটা। 'কিন্তু ওঁরা তো এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।'

'আমি জানি। ওরা বেরিয়ে গেছে জেনেই চাইছি নাম্বারগুলো। ওদের বেরিয়ে যাবার অপেক্ষাতেই ছিলাম।'

'ঠিক বুঝলাম না, স্যার,' কেমন একটু হতচকিত হয়ে গেল মেয়েটা।

'ওদের দরজার নিচে দিয়ে একটা করে কাগজ ঢুকিয়ে দিতে চাই। এটা আমাদের একটা প্রচলিত পুরানো রেওয়ায।'

'আচ্ছা!' বুঝে গেল মেয়েটা। 'জুয়াড়ীদের মত আপনারাও কুসংস্কার মেনে চলেন তাহলে!' যেন মরিস রেনারের সাথে নির্দোষ গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এমনি একটা ভাব এসে গেল ওর মুখে, চেহারায়। নিচু গলায় বলল, 'নম্বরগুলো হচ্ছে তিনশো আটাশ, উনচল্লিশ, সাতান্ন, আর তেরো।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' ঠোঁটের উপর তর্জনী রাখল রানা। 'রেসের আগে কাউকে বলবেন না কিন্তু কিছু। কাউকে না।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' হাসল আবার মেয়েটা।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল রানা উপরে। সোজা এসে ঢুকল নিজের ঘরে। সুটকেস থেকে বের করল মুভি ক্যামেরাটা, পিছনের একটা স্ক্রু খুলে ঢাকনি

সরাল। চৌকোণ একটা ফাঁকা জায়গা থেকে বের করে আনল সিগারেটের প্যাকেটের সমান একখানা মিনিয়েচার স্টিল ক্যামেরা। ফ্ল্যাশ কিউব বসানো তার মাথায়। ক্যামেরাটা পকেটে ঢুকিয়ে মুভি ক্যামেরার ঢাকনিটা লাগিয়ে রেখে দিল সুটকেসে। ক্যানভাসের ব্যাগটার দিকে চাইল একবার, স্থির করল, ওটার দরকার পড়বে না আজ। দরজায় তালা মেরে দিয়ে করিডর ধরে এগোল সে তিনশো আটাশ নম্বর কামরার দিকে। পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করে পছন্দসই একটা চাবি বেছে নিয়ে ঢুকাল গর্তের মধ্যে। খুলল না দরজা। আরেকটা মাস্টারকী বাছাই করে প্যাঁচ দিতেই ক্লিক শব্দে খুলল তালা। চাবিটা বের করে চোখের সামনে তুলে ধরে ভালমত চিনে নিয়ে পকেটে ফেলল গোছাটা। ঢুকল ভিতরে।

মাইকেল হ্যামারের ঘর। সারাটা ঘর তন্ন তন্ন করে সার্চ করল রানা। সুটকেস, ওয়ারড্রোব, কাবার্ড, জামা কাপড়—বাদ দিল না কিছুই। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করবার পর পেয়ে গেল যা চাইছিল। হরিণের চামড়া মোড়া দামী একটা ব্রীফকেস। খাটের তোষকের নিচে সযত্নে লুকানো।

একটা চেয়ারে বসে দুই হাঁটুর উপর ব্রীফকেসটা রেখে খোলার চেষ্টা করল রানা। তালা মারা। আবার বের করল সে চাবির গোছাটা, দু'মিনিটেই খুলে হাঁ করে গেল ব্রীফকেসের ডালা।

ভিতরটা একখানা ছোটখাট ভ্রাম্যমান অফিস। দরকারী কাগজপত্রে ঠাসা। রসিদ, ইনভয়েস, কন্ট্রাক্ট ফরম, চেকবই, সরু একটা স্ট্যাপলার, কিছু আলপিন ও জেমস ক্লিপ, ইরেযার, লাল-নীল পেন্সিল—সব আছে। এক নজরেই বোঝা যায় ব্লু অ্যাঞ্জেলের মালিক নিজেই টীমের শুধু ম্যানেজার নয়, অ্যাকাউন্ট্যান্টও। সবকিছুর উপরেই নজর বুলাল রানা, কিন্তু হাতে তুলে নিল রাবার-ব্যান্ড জড়ানো পাঁচ-ছ'টা পুরানো পাতা-শেষ-হয়ে যাওয়া চেক বই।

দ্রুত পাতা উল্টাতে উল্টাতে একটা জায়গায় এসে থেমে গেল রানার হাত। নিঃশব্দে শিস দেয়ার ভঙ্গি করল সে শেষ পৃষ্ঠায় প্রত্যেকটা চেকের তারিখ, নম্বর ও অঙ্ক লেখা রয়েছে। ক্যামেরা বের করে দুটো ছবি তুলল সে পাতাটার। আরও একটা চেক বইয়ের শেষ পাতার ছবি তুলল দুটো। তারপর যেটা যেখানে যেমন ভাবে ছিল রেখে দিয়ে তালা মেরে দিল ব্রীফকেসে। বেরিয়ে এল বাইরে।

জনশূন্য করিডর ধরে তিনশো ঊনচল্লিশ নম্বর কামরার সামনে এসে দাঁড়াল এবার রানা। সেই একই চাবিতে খুলে গেল এ ঘরটাও। কাপলানের ঘর। লোকটার খরচের হাত যে খুবই বড় সেটা বোঝা যায় দামী জামাকাপড় ও সৌখিন জিনিসপত্রের দিকে একনজর চাইলেই। শুধু সুটকেসটারই দাম হবে কমপক্ষে আড়াই হাজার টাকা।

একটা লাল নোট বই পাওয়া গেল সুটকেসের পকেটে। পাতা উল্টে দেখা গেল অনেকগুলো ঠিকানা লেখা রয়েছে। প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা ছেড়ে দিয়ে তারপর শুরু হয়েছে লেখা। অবশ্য ওগুলো ঠিকানা কিনা বোঝার উপায়

নেই—সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা। নামের জায়গায় শুধু একটা অক্ষর, পরের দু'লাইন হযবরল ভাবে অক্ষর সাজানো। ক্যামেরা বের করে প্রত্যেকটা পৃষ্ঠার দুটো করে ছবি তুলল রানা। তারপর চলে গেল হ্যানসিঙ্গারের ঘরে।

হ্যানসিঙ্গারের খুলে রাখা কোটের পকেটে কাপলানেরই মত একটা নোটবই পাওয়া গেল। সুটকেসে পাওয়া গেল একটা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়ার ডিপোজিট বুক। দশ বারোটা ছবি তুলে যথাস্থানে সবকিছু রেখে ব্রনসনের ঘরের দিকে এগোল রানা।

ব্রনসনের সুটকেসে পাওয়া গেল একটা ব্যাঙ্কের পাসবুক। টাকার অঙ্কগুলো দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল রানার। একজন চীফ মেকানিক হিসেবে যা রোজগার করবার কথা তার চেয়ে অন্তত একশো গুণ বেশি রোজগার করছে ব্রনসন। পাসবুকের প্রথম তিনটে পৃষ্ঠার ছবি তুলল রানা, গোটাকয়েক ঠিকানা পাওয়া গেল একটা কাগজে, সেগুলোর ছবি তুলল, তারপর সুটকেসটা যেমন ছিল তেমনি সাজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এমনি সময় করিডরে পায়ের শব্দ পেয়ে থমকে দাঁড়াল দরজার সামনে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা, পরমুহূর্তে আহত চিতাবাঘের মত লাফ দিয়ে সরে গেল পায়ের শব্দটা দরজার বাইরে এসে থামতেই। চাবি ঢুকিয়ে দরজার তালা খুলছে কে যেন। চট্ করে লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে সাঁৎ করে ঢুকে পড়ল রানা ওয়ারড্রোবের মধ্যে। ওয়ারড্রোবের ডালা দুটো বন্ধ হওয়ার আগে সামান্য ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল রানা খুলে যাচ্ছে দরজাটা!

খুট করে শব্দ হলো বাতি জ্বালার। কিন্তু ওয়ারড্রোবের ভিতর নিকষ কালো অন্ধকার। পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে রানা, ঘরের মধ্যে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে কেউ। কি করছে বোঝার উপায় নেই একটু আগে ও যা করছে, এই লোকটাও ঠিক তাই করছে? ব্রনসন নয়—এত তাড়াতাড়ি রিসেপশন থেকে ফিরে আসা সম্ভব না। এই লোকটা যেই হোক, যদি ওয়ারড্রোব খোলে তাহলেই ধরা পড়ে যাচ্ছে সে। চিনে ফেললে আজকে এত পরিশ্রম করে যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে সব ভেস্তে যাবে।

আলগোছে পকেট থেকে রুমালটা বের করে আনল রানা। আন্দাজে ভর করে ভাঁজ খুলে তিন কোনা করে ভাঁজ করল সেটাকে। সোজা দিকটা চোখের নিচে ধরে মাথার পিছনে গিঠ দিল রুমালের দুই প্রান্ত। তারপর এক ঝটকায় ওয়ারড্রোবের ডালা খুলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল বাইরে। হাত দুটো সামনে বাড়ানো, শরীরটা একটু ঝুঁকে রয়েছে সামনে—যে কোন অবস্থার জন্যে প্রস্তুত।

আঁৎকে উঠল চশমা পরা প্রকাণ্ড চেহারার এক মাঝবয়সী মহিলা। চেম্বার মেইড। সবে মাত্র বিছানার চাদর বদলে নোংরা চাদরটা বগলদাবা করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় সাদা মুখোশ আঁটা ভয়ঙ্কর চেহারার এক ডাকাত দেখেই আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গেল তার। চোখ দুটো একপাক খেয়ে কপালে উঠল। বিশাল শরীরটা দুলে উঠল, তারপর টুঁ শব্দটি না করে

ঢলে পড়তে শুরু করল।

মেঝেতে আছড়ে পড়ার আগেই বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে এসে ধরে ফেলল রানা। যেটুকু বা জ্ঞান ছিল, রানা চেপে ধরতে সেটুকুও লোপ পেল। চাদরটা পোঁটলা করে বালিশের মত মহিলার মাথার নিচে দিয়েই করিডরের খোলা দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। রুমালটা মুখ থেকে খুলে যেসব জায়গা ছুঁয়েছে সেগুলো মুছতে শুরু করল সে দ্রুত হাতে। সম্ভাব্য সমস্ত জায়গা থেকে আঙুলের ছাপ মুছে ক্রেডল থেকে টেলিফোন রিসিভারটা নামিয়ে টেবিলের উপর রাখল। বাইরেটা একবার দেখে নিয়ে দরজা আধ-ভেজানো অবস্থায় রেখে বেরিয়ে গেল বাইরে।

সিঁড়িঘর পর্যন্ত দ্রুতপায়ে এগোল রানা, তারপর ধীরে সুস্থে নেমে এল নিচে। বারে গিয়ে অর্ডার দিল ডবল জিনের। অর্ডার শুনে ভড়কে গেল বারম্যান।

'কি দেব, স্যার?'

'ডাবল জিন অ্যান্ড টনিক,' কড়া গলায় বলল রানা। 'এবার বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ, হাঁ…নিশ্চয়ই! দিচ্ছি, মিস্টার রেনার।'

বিস্ময় চেপে রাখল বারম্যান নিজের মধ্যেই। কিন্তু বেশিক্ষণ যে চেপে রাখতে পারবে না, ব্লু অ্যাঞ্জেলের এক নম্বর ড্রাইভারকে যে সে নিজের হাতে জিন পরিবেশন করেছে—এবং বে-আইনী ভাবে সে যে তা খেয়েছে, এই খবর রাষ্ট্র করে দেবে লোকটা প্রথম সুযোগেই। তাই চায় রানা। একটা পাতাবাহারের টবের পাশে বসে জিনের গ্লাস হাতে লবির ওপাশে টেলিফোন অপারেটারকে লক্ষ করছে সে এখন। বেশ খানিকটা বিরক্ত ও উত্তেজিত মনে হচ্ছে মেয়েটাকে। সুইচবোর্ডের একটা লাইট বারবার জ্বলছে আর নিভছে, কিন্তু জবাব দিলে কোন কথা বলছে না কেউ। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে একটা বয়কে ডেকে নিচু গলায় কি যেন বলল মেয়েটা। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল পেজ বয়।

যখন ফিরল প্রায় উড়ে নেমে এল সে নিচে। তিন লাফে লবি পেরিয়ে অপারেটারের কানে কানে কিছু বলল। তড়াক করে সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, দৌড়ে ঢুকে গেল কাউন্টারের ওপাশের একটা দরজা দিয়ে। আধ মিনিটের মধ্যেই এলোপাতাড়ি পা ফেলে ছুটে এল ম্যানেজার। ধুপধাপ দ্রুতপদে উঠছে সিঁড়ি বেয়ে।

ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছে রানা, গ্লাসে চুমুক দেয়ার ভান করছে। টের পাচ্ছে, লবিতে বসা খরিদ্দারদের প্রত্যেকেই লক্ষ করছে ওকে—বিখ্যাত লোকদের যেমন লক্ষ করে সবাই। ওরা নিশ্চয়ই ভাবছে লেমোনেড বা সোডা ওয়াটার খাচ্ছে মরিস রেনার।

দৌড়ে নেমে এল ম্যানেজার। দুই চোখ বিস্ফারিত। ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল কানে। এতক্ষণে লবির প্রত্যেকটা লোক কৌতূহলী হয়ে উঠল।

সবাই টের পেয়েছে বিশেষ কিছু ঘটেছে। উৎসুক নেত্রে লক্ষ করছে ম্যানেজারের কার্যকলাপ। সুযোগ পেয়ে চট্ করে গ্লাসটা উপুড় করল রানা পাতাবাহারের টবে। মিছেমিছি চুমুক দেয়ার ভঙ্গি করল বার কয়েক, তারপর ঢক ঢক করে গ্লাসটা নিঃশেষ করবার ভঙ্গি করে ঠক্ করে নামিয়ে রাখল সেটা টেবিলে।

সামনে রিভলভিং ডোরের দিকে রওনা হলো রানা। ম্যানেজারের পাশ দিয়ে যেতে গিয়েও থেমে দাঁড়াল। ম্যানেজারের উত্তেজিত চোখমুখ পরীক্ষা করে সহানুভূতির সাথে জিজ্ঞেস করল, 'কোন ফ্যাসাদ?'

'ফ্যাসাদ বলে ফ্যাসাদ? মহা ফ্যাসাদ, মিস্টার রেনার!' কানেকশনের অপেক্ষায় কানে রিসিভার ধরে দাঁড়িয়ে আছে ম্যানেজার, কিন্তু এরই ফাঁকে মরিস রেনারের সাথে দুটো কথা বলবার সুযোগ পেয়ে বর্তে গেল সে। 'রাহাজানি! ডাকাতি! ভয়ঙ্কর এক ডাকাত আমাদের চেম্বারমেইডকে আক্রমণ করেছিল!'

'সর্বনাশ! তাই নাকি? কোথায়?'

'মিস্টার ব্রনসনের ঘরে।'

'ব্রনসন?' অবাক চেহারা করল রানা। 'সে তো আমাদের চীফ মেকানিক। তার ঘরে চুরি করবার মত কি আছে?'

'হয়তো ঠিকই বলেছেন, মিস্টার রেনার। কিন্তু চোরের তো সেটা জানবার কথা নয়। তাই না?'

'চেনা গেছে? চিনতে পেরেছে চোরটাকে?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল ম্যানেজার। 'ও শুধু দেখতে পেয়েছে ভয়ঙ্কর দৈত্যের মত এক মুখোশ পরা লোক। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল ওয়ারড্রোব থেকে। এক হাতে মোটা একটা মুগুর, আরেক হাতে ইয়া লম্বা এক ছোরা।' মাউথপিসের উপর বাম হাতের তালু চেপে নিচু গলায় বলল, 'এক্সকিউয মি…পুলিস।'

লম্বা করে হাঁপ ছাড়ল রানা, সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে, ডাইনে ঘুরল, তারপর আরেকবার ডাইনে ঘুরে একটা সাইড-ডোর দিয়ে হোটেলে ঢুকল আবার। সবার নজর বাঁচিয়ে ফিরে এল নিজের ঘরে। দরজা লাগিয়ে দিয়ে মিনিয়েচার ক্যামেরা থেকে ফিল্ম কার্ট্রিজটা বের করে নতুন একটা ফিল্ম পুরল ওতে, তারপর মুভি ক্যামেরার পিছনে ঢুকিয়ে দিল ওটা। স্ক্রু এঁটে ওটার আশেপাশে কয়েকটা আঁচড় কাটল সে ইচ্ছে করেই, যেন কেউ দেখলেই বুঝতে পারে ব্যাক-প্লেটটা প্রায়ই খোলা এবং লাগানো হয়।

এবার একটা খামের উপর নিজের নাম ও রুম নম্বর লিখে তার ভিতরে ফিল্ম কার্ট্রিজটা ভরে আঠা লাগিয়ে নেমে এল রিসেপশন ডেস্কে। খামটা মেয়েটার হাতে দিয়ে হোটেলের সেফে রেখে দেয়ার অনুরোধ করে ফিরে এল নিজের কামরায়।

স্যুটটা খুলে রেখে ঝাড়া একটি ঘণ্টা বিশ্রাম নিল রানা শবাসনে শুয়ে।

তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে আবার পরল জামা কাপড়। এবার আর স্যুট নয়। ঘন ছাই রঙের পুলওভারের উপর পরল কালো চামড়ার জ্যাকেট। আবার আর্মচেয়ারে আরাম করে বসে সিগারেট ধরাল। সিগারেটটা শেষ হওয়ার আগেই ডিজেল এঞ্জিনের গুরুগম্ভীর শব্দ শুনতে পেল সে। ছোট্ট একটা গর্জন করে থেমে গেল এঞ্জিনটা। বাতি নিভিয়ে জানালার ধারে গিয়ে পর্দা সরাল রানা। নামছে সবাই। পর্দা টেনে দিয়ে আবার বাতি জ্বালাল সে। বালিশের তলা থেকে চ্যাপ্টা বোতলটা বের করে খানিকটা হুইস্কি মুখে নিয়ে কুলকুচি করে ফেলে দিল বেসিনে। আধ আউন্স পরিমাণ ঢালল পুলওভারে। ছিপি লাগিয়ে ওটা বালিশের নিচে গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রানা যখন সিঁড়ির শেষ ল্যান্ডিঙে পৌঁছেচে সেই সময় লবিতে ঢুকল রিসেপশন পার্টি। রানার দিকে এক নজর চেয়েই ব্যথাতুর হয়ে উঠল জুলিয়ার চোখ দুটো। এগোতে গিয়েও কি মনে করে অন্যদিকে পা বাড়াল সে। নেমে এল রানা। কারও দিকে না চেয়ে এগোল সদর দরজার দিকে। মাইকেল হ্যামারকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল রানা, বিশাল শরীর দিয়ে পথ রোধ করল বৃদ্ধ। আপাদমস্তক দেখল বাঘের চোখে।

'তুমি না যাওয়ায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন মেয়র। অনেক গণ্যমান্য লোক এসেছিল...'

'চিড়িয়াখানার বাঘ দেখতে,' বলল রানা। বিরক্ত দৃষ্টিতে চাইল পাশে দাঁড়ানো মিচেলের দিকে। 'জিরাফ আর হাতী দেখে খুশি হতে পারেনি।'

কে জিরাফ আর কে হাতী বুঝতে অসুবিধে হলো না মাইকেল হ্যামারের। লাল হয়ে উঠল ওর ফর্সা মুখ। কটমট করে চাইল ভ্রূ কুঁচকে।

'কাল সকালে তোমার প্র্যাকটিস ল্যাপ আছে, সে খেয়াল আছে, রেনার?'

'কাজের কথা ভুলি না আমি।'

কথাটা বলেই একপাশে সরে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল রানা; কিন্তু আবার পথ রোধ করল হ্যামার।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'বাইরে।'

'আমি বারণ করছি...'

'দেখুন, মিস্টার হ্যামার,' কথার মাঝখানে বাধা দিল রানা, 'আমার প্রতি আপনার স্নেহ, ভালবাসা সবই আছে মানি। আপনার প্রতিও আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ রয়েছে—কিন্তু তাই বলে কন্ট্রাক্টের বাইরে দয়া করে কোন ব্যাপারে বারণ করতে বা জোর খাটাতে আসবেন না।'

বেরিয়ে গেল রানা। একপাশে দাঁড়িয়ে আড় চোখে সবই দেখল জুলিয়া, কামড়ে ধরল নিচের ঠোঁট। সিদ্ধান্ত নিল, আজকে যেমন করে হোক মুখোমুখি হতেই হবে রানার।

অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে মিচেলের চোখের দিকে চাইল হ্যামার।

'অথচ, জেম্‌স, আশ্চর্য ভদ্র ও বিনয়ী ছিল ছেলেটা।'

'নেশার ঘোরে উড়ে গেছে সব,' বলল মিচেল। 'গন্ধ পাওনি?'

'পেয়েছি। দশ হাত দূরে থেকেও যে কেউ টের পাবে। এবার বোধহয় আর মাঠে নামানো গেল না ছেলেটাকে। এইবার গ্র্যান্ডপ্রিক্স ড্রাইভারস্‌ অ্যাসোসিয়েশন...'

'চলো বারম্যানের কাছে খবর নেয়া যাক।'

বারম্যানের সাথে হ্যামার ও মিচেলকে নিচু গলায় কথা বলতে দেখল জুলিয়া। বারম্যানের উত্তেজিত চোখমুখ আর হাত নাড়ার ভঙ্গি দেখে মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল নিজের ঘরে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে কাপলান আর হ্যানসিঙ্গারের গা ঘেঁষে চলে গেল রানা। কথা বলা তো দূরে থাকুক এমন ভাবে চলে গেল যেন দেখতেই পায়নি ওদের। নাক কুঁচকে শ্বাস টানল কাপলান, দু'জনেই চেয়ে রইল রানার দিকে। অতিরিক্ত খাড়া, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাঁটছে রানা—নেশা করলে মানুষ যেমনভাবে হাঁটে, সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করে কিছুই খায়নি, সেই রকম। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও সোজা পা ফেলতে গিয়ে সামান্য একটু হোঁচট খাওয়া দৃষ্টি এড়াল না ওদের। পরস্পরের দিকে চাইল ওরা, সামান্য একটু মাথা ঝাঁকাল। কাপলান চলে গেল হোটেলের ভিতরে, হ্যানসিঙ্গার চলল রানার পিছন পিছন বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে।

হঠাৎ ঠাণ্ডা এক ঝলক বাতাস চোখেমুখে ঝাপটা মারতেই চট্‌ করে আকাশের দিকে চাইল হ্যানসিঙ্গার। দালানগুলোর ছাত পর্যন্ত নেমে এসেছে বৃষ্টি, তিন সেকেন্ডের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল। যদিও খুব হালকা, কিন্তু তাতেই ফাঁকা হয়ে এল রাস্তা। সুবিধেই হলো হ্যানসিঙ্গারের—লোকের ভিড়ে রেনারকে হারিয়ে ফেলবার কোন ভয় থাকল না। বৃষ্টি আর একটু বাড়তেই প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল রাস্তাটা। এই অবস্থায় হঠাৎ পিছন ফিরে চাইলেই দেখে ফেলবে রেনার ওকে, সে ভয় রয়েছে—কিন্তু ওর মধ্যে পিছন ফিরে চাইবার কোন লক্ষণ না দেখে ক্রমে ক্রমে বিশ গজের মধ্যে চলে এল সে। পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে সে, গন্তব্যস্থল স্থির করে সেইদিকেই একমনে এগোচ্ছে মাতাল ব্যাটা, পিছন ফিরে চাইবার চিন্তা নেই ওর মাথায়।

রানার চলনে মাতালের লক্ষণ ক্রমেই বাড়ছে। টলছে, সোজা চলতে পারছে না, এগোচ্ছে এঁকে বেঁকে। চলতে চলতে একটা দোকানের শোকেসের কাঁচ ধরে টাল সামলে নিল রানা। মুহূর্তের জন্যে রানার মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল হ্যানসিঙ্গার। চোখ দুটো আধ-বোজা, মাথা নেড়ে দূর করবার চেষ্টা করছে মাতলামির ঘোরটা। এগিয়ে যাচ্ছে এলোমেলো পা ফেলে। মুচকি হেসে আরও একটু কাছে সরে এল হ্যানসিঙ্গার। এমনি সময়ে মোড় ঘুরল রানা।

অনুসরণকারীর দৃষ্টির আড়াল হয়েই মাতলামির সমস্ত লক্ষণ দূর হয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। তিন লাফে একটা বাড়ির অন্ধকার দরজার

আড়ালে চলে গেল সে। কোমর থেকে খসাল দেড়ফুট লম্বা বালি ঠাসা মোটা একখানা চামড়ার হান্টার। দাঁড়াল প্রস্তুত হয়ে।

দশ সেকেন্ডের বেশি অপেক্ষা করতে হলো না। মোড় ঘুরেই তাজ্জব হয়ে গেল হ্যানসিঙ্গার—সামনের রাস্তাটা ফাঁকা। ব্যাপারটা কি ঘটছে চট্ করে বুঝে উঠতে না পেরে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল সে। দড়াম করে গদাঘাত পড়ল ওর ঘাড়ের পিছনে। মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে শুয়ে পড়ল হ্যানসিঙ্গার, ওর শরীরটা টপকে দ্রুত-পায়ে নিজের পথে হাঁটা ধরল রানা। বেশ কিছুদূর ফিরে চলল যে পথে এসেছিল সেইপথে, তারপর বাঁয়ে মোড় নিয়ে চলল ট্র্যান্সপোর্টার পার্কের দিকে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে হ্যানসিঙ্গারের টের পাওয়ার উপায় নেই কোনদিকে গেছে রানা।

সোজা গিয়ে ব্লু অ্যাঞ্জেল ট্র্যান্সপোর্টারের দরজায় চাবি লাগাল রানা। দরজা খুলে ঢুকল ভিতরে, লাইট জ্বেলে চাবি মেরে দিল ভিতর থেকে, অর্ধেক ঘুরানো অবস্থায় রেখে দিল চাবিটা ফুটোয়। বাইরে থেকে দরজা খোলার উপায় রইল না। জানালাগুলো ঢেকে দিল সে প্লাই উডের তক্তা দিয়ে। বাইরে থেকে ওর কার্যকলাপ দেখবারও উপায় রইল না।

নিশ্চিন্ত মনে কাজ শুরু করল এবার।

ছয়

'তুমি শিওর, ওই হারামজাদারই কাজ এটা?' জিজ্ঞেস করল কাপলান। তার চোখের দৃষ্টিতে সহানুভূতি এবং রাগের সংমিশ্রণ।

ঘাড়টা ডলতে ডলতে দাঁতে দাঁত চেপে মাথা ঝাঁকাল হ্যানসিঙ্গার।

'হানড্রেড পার্সেন্ট। মানিব্যাগ খোয়া যায়নি।'

'তার মানে মাতলামির অভিনয় করছিল ব্যাটা। কিন্তু কেন?' হ্যানসিঙ্গারের মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড উত্তরের অপেক্ষায় চেয়ে রইল কাপলান, তারপর বলল, 'গেল কোথায়? এই রকম রহস্যময় ব্যবহারের কারণ কি? বসের অনুমানই সত্য হতে যাচ্ছে নাকি? স্পাই?'

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল হ্যানসিঙ্গার। 'লোকটা জাত ড্রাইভার। তবু সাবধানের মার নেই। বসকে জানানো দরকার ব্যাপারটা।'

'তার আগে ওর ঘরটা একবার পরীক্ষা করে দেখলে হয় না?'

ঘাড় ডলা বন্ধ করল হ্যানসিঙ্গার। 'কি করে? চাবি পাবে কোথায়?'

'আমার চাবিটা হারিয়ে ফেলে মাস্টার কী ধার নিতে পারি কয়েক মিনিটের জন্যে।'

'গুড!' বুদ্ধিটা পছন্দ হয়েছে হ্যানসিঙ্গারের। 'এই সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। রাস্তায় রাস্তায় ভিজে মরুক শালা, আমরা বের করে ফেলব ওর আসল পরিচয়।'

'ঠিক আছে, তুমি থাকো এখানেই, আমি আসছি এক্ষুণি।'

কাপলানের ঘরে বসে ঘাড় ডলল হ্যানসিঙ্গার মিনিট তিনেক। তর্জনীতে একটা চাবির রিঙ ঘুরাতে ঘুরাতে হাসিমুখে ফিরে এল কাপলান।

'এক হাসিতেই কাজ হয়ে গেল। আরেকটা হাসি দিলেই সুড় সুড় করে আমার ঘরে এসে ঢুকত ছুঁড়ি। চলো, দেখা যাক কি পাওয়া যায়।'

আধ মিনিটের মধ্যেই রানার কামরায় ঢুকে ভিতর থেকে চাবি মেরে দিল ওরা।

'চাবিটা গর্তেই রেখে দাও আধ-প্যাঁচ মেরে।'

'না' বলল কাপলান।

'যদি ফিরে আসে রেনার?'

'এলে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকবে এবং তোমার মতই জ্ঞান হারাবে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে গর্দান ডলবে।'

দুই মিনিটের মধ্যেই বোতল পেল হ্যানসিঙ্গার। দুই আঙুলে উঁচু করে ধরে বলল, 'এই দেখো!'

'ও দেখে আর কোন লাভ নেই আমাদের। জি. পি. ডি. এ-র মীটিঙে রেনারের ব্লাড টেস্টের ব্যাপারে বিরোধিতা করবার আদেশ হয়েছে আমাদের ওপর। বসের হুকুম। যত বোতলই পাওয়া যাক না কেন, আমরা এক বাক্যে বলব এত বড় একজন ড্রাইভারকে অপমান করা যায় না, হলফ করে বলব—জীবনে ওকে মদ স্পর্শ করতে দেখিনি, ওর মুখ থেকে কখনও কোন গন্ধ পাইনি। ওকে অপমান করা আর আমাদের সমস্ত প্রাইজ-উইনার ড্রাইভারকে অপমান করা এক কথা।'

'কিন্তু তাতে কি মানবে ওরা? ভুলে যাচ্ছ কেন, প্রস্তাবটা প্রথম তুলেছিলাম তুমি আর আমি।'

'হুকুম পেয়ে প্রস্তাব তুলেছিলাম, হুকুম পেয়ে সে প্রস্তাব উঠিয়ে নেয়ার চেষ্টা করব—এর বেশি আমাদের আর কিছু চিন্তা করবার দরকার নেই। ভাবনা-চিন্তা করুক যার যোগ্যতা আছে সে।'

চুপচাপ সার্চ করল ওরা পাঁচ মিনিট। তারপর মুভি ক্যামেরা হাতে সোজা হয়ে দাঁড়াল কাপলান। পিছনটা দেখেই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ওর দৃষ্টি।

'স্ক্র্যাচ কেন?' বলল সে চিন্তিত ভঙ্গিতে। 'ভেতরে আছে কিছু?'

একটা পকেট নাইফ এগিয়ে দিল হ্যানসিঙ্গার। 'খুলেই দেখো না?'

মিনিয়েচার ক্যামেরাটা বের করে চোখ বড় বড় করে তাকাল কাপলান ওটার দিকে। ওর হাত থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখল হ্যানসিঙ্গার। বের করে আনল ফিল্ম কার্ট্রিজটা।

'এটা কি নিয়ে যাচ্ছি আমরা?'

'উহুঁ,' বলল কাপলান। 'তাহলে টের পেয়ে যাবে। এদিকে দাও ওটা।'

ডেস্ক ল্যাম্প জ্বেলে ফিল্মটা খুলে আলোর নিচে ধরল কাপলান। তারপর আবার জড়াল ওটা রীলে, দু'পাশের মুখ বন্ধ করে ভরে দিল ক্যামেরার মধ্যে।

মুভি ক্যামেরার পিছন দিয়ে ওটা ঢুকিয়ে স্ক্রু এঁটে দিল প্লেটে। সুটকেসে রেখে দিল মুভিটা।

'এইবার?' জিজ্ঞেস করল হ্যানসিঙ্গার।

'যা বোঝার বোঝা গেছে। এইবার খবর দিতে হবে বসকে।'

'আর মার্সেইতে?'

'হ্যাঁ। সেখানেও খবর দিতে হবে। চলো।'

করিডরে বেরিয়ে তালা মেরে দিল ওরা দরজায়।

একটা ব্লু অ্যাঞ্জেল ঠেলে দুই ফুট আন্দাজ পিছনে সরাল রানা। নিচু হয়ে ঝুঁকে ফ্লোর বোর্ডটা পরীক্ষা করে উঠে গিয়ে জোরাল টর্চ নিয়ে এল। ঝমঝম ঝমঝম বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে ট্র্যান্সপোর্টারের ছাতে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করল সে ফ্লোর বোর্ডটা। মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

লম্বা তক্তার এক জায়গায় আড়াআড়ি ভাবে দুটো দাগ দেখা যাচ্ছে—একটার থেকে অপরটার দূরত্ব আঠারো ইঞ্চি। একটা তৈলাক্ত ন্যাকড়া দিয়ে প্রথম দাগের উপর ঘষা দিল রানা। বোঝা গেল ওটা দাগ নয়, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে চেরার চিহ্ন। দু'পাশে দুটো চকচকে পেরেকের মাথা দেখা যাচ্ছে। খুব সাবধানে একটা স্ক্রু ড্রাইভারের মাথা দিয়ে আলগোছে চাঁড় দিল রানা। খুব সহজেই উঠে এল তক্তার একটা দিক। ছয় ইঞ্চি ফাঁক করে হাত ঢুকিয়ে ভিতরটা পরীক্ষা করল সে। ভুরু দুটো উপরে উঠল একবার আশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গিতে।

হাতটা বের করে এনে একটা আঙুল জিভে ঠেকাল রানা, নাকের কাছে নিয়ে শুঁকল, কুঁচকে উঠল ভুরু জোড়া। তক্তাটা যথাস্থানে বসিয়ে দিল সে স্ক্রু ড্রাইভারের পিছনটা দিয়ে ঠুকে। ন্যাকড়াটা তেলে চুবিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা ধুলো মিশিয়ে লেপে দিল জায়গাটা। যেমন ছিল তেমন হয়ে গেল ফ্লোর বোর্ড, হালকা দুটো দাগ ছাড়া দেখা যাচ্ছে না কিছুই।

হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল রানা। লবিতে এখন যথেষ্ট লোক। একটা টেবিলে হ্যামার, মিচেল ও জুলিয়াকে বসা দেখে সেদিকেই এগোল সে।

তিনজনই প্রায় একইসাথে দেখতে পেল রানাকে। বিস্ফারিত হয়ে গেল হ্যামারের চোখ। একলাফে উঠে দাঁড়াল সে চেয়ার ছেড়ে।

'জেমস, মেজাজ ঠিক রাখতে পারব না। দুঃখিত। আমার এখানে না থাকাই বোধহয় ভাল।' আরেকবার রানাকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দগ্ধ করে বলল, 'চললাম। ডিনারের সময় হলে ডাক দিয়ো।'

প্রায় দৌড়ে চলে গেল হ্যামার। রাগে পানি এসে গেছে তার চোখে।

টেবিলের কাছে এসেই জুলিয়ার ধমক খেল রানা। চাপা ক্রুদ্ধ গলা।

'লজ্জা করে না তোমার? এইভাবে সবার সামনে অপমান করলে তুমি ব্লু অ্যাঞ্জেলকে!'

'কি করলাম!' অবাক হয়ে এদিক ওদিক চাইল রানা।
'মদ খেয়েছ তুমি!'
'কে বলেছে? মিথ্যে কথা।'
নিজের কাপড়ের দিকে চেয়ে দেখল একবার। মাতাল না হলে কোন ভদ্রলোক কাদায় গড়াগড়ি খায় না। মিথ্যে কথা? আমি জানতাম না যে তুমি মিথ্যে কথা বলো।'
'আপন গড! খাইনি, জুলিয়া। বিশ্বাস করো।'
'বারম্যান মিথ্যে বলেছে?'
'ভুল বলেছে।'
'তোমার জামায় হাতে কাদা কেন?'
'সত্যিই তো!' নিজের দিকে এক নজর চেয়ে অবাক হলো রানা। লজ্জিত ভঙ্গিতে পিছিয়ে গেল এক পা। 'খুবই দুঃখিত।'
'তোমার সাথে কথা আছে আমার,' বলল জুলিয়া, 'প্রশ্ন আছে।'
ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও চট্ করে চাইল রানা জুলিয়ার চোখে। হাসল।
'আজ না, জুলি। কাল। খুব ক্লান্ত আছি।' চাইল মিচেলের দিকে। 'আপনারও কিছু প্রশ্ন আছে বলে মনে হচ্ছে? সব প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারব আমি কাল। চলি। গুড বাই।'
দ্রুতপায়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেল রানা।

টেলিফোনের রিসিভারটা কানে তুলে নিল রুডলফ গুন্থার।
'ইয়েস?'
আর একটি কথা না বলে এক নাগাড়ে তিন মিনিট শুনল, তারপর নামিয়ে রাখল রিসিভার। চুরুটটা হাতে নিয়ে চিন্তা করল কয়েক সেকেন্ড। তারপর টিপ দিল একটা বোতামে। একজন বেয়ারা মাথা বাড়াল পর্দার ফাঁক দিয়ে।
'টমাসকে পাঠিয়ে দাও।'
দু'মিনিট পর সসম্ভ্রমে ঘরে ঢুকল টমাস মুলার।
'তুমি, বর্গ আর গুস্তাভ এখন থেকে পালা করে নজর রাখবে রেনারের ওপর আগামী ছত্রিশ ঘণ্টা। লোকটার গতিবিধি সন্দেহজনক। ওর প্রতিটা কার্যকলাপের রিপোর্ট চাই আমি।'
'ইয়েস, স্যার।'
'সন্দেহজনক কিছু দেখলেই ফোন করে জানাবে আমাকে।'
'ইয়েস, স্যার।'
বেরিয়ে গেল টমাস।

পরদিন দুপুর। মন্যা রেসট্র্যাকের পাশে ব্লু অ্যাঞ্জেল পিটের সামনে দুটো চেয়ারে বসে আছে মিচেল ও হ্যামার।
'এ তো বড় অদ্ভুত কাণ্ড!' খুশি হবে কিনা বুঝে উঠতে পারছে না মাইকেল হ্যামার। 'এ কি করে হয়? বোতল খালি, অথচ এদিকে ল্যাপ রেকর্ড

ভাঙছে! লোকটা মানুষ, না পিশাচ?'

'একবার নয়,' বলল মিচেল। 'তিন তিনবার ব্রেক করেছে রেকর্ড। এতে একটা ব্যাপারই প্রমাণ হয়, মাইক। এক ল্যাপ, দুই ল্যাপে ঠিকই আছে—কিন্তু পরে আর নার্ভ বা স্টামিনা কোনটাই ঠিক রাখতে পারে না রেনার। অ্যালকোহলিকদের যা হয়।'

'ছোঁড়া গেছে কোথায়?'

'চলে গেছে। ব্রনসনকে বলে গেছে, যদি ওর নতুন রেকর্ড আর কেউ ব্রেক করে তাহলে যেন ওকে খবর দেয়া হয়—আবার এসে সেটা ব্রেক করে রেখে যাবে।'

'এত বাহাদুরির কথা তো আগে বলত না? হঠাৎ কি হয়ে গেল ওর মধ্যে, জেমস্? এই রকম বদলে গেল কেন ছেলেটা? গার্বারের মৃত্যুর জন্য দায়ী করছে ও নিজেকে, নাকি আর কিছু···' স্বগতোক্তির মত কথাগুলো বলতে বলতে থেমে গেল মাইকেল হ্যামার। হঠাৎ বলল, 'ওকে কেউ ব্ল্যাকমেইল করছে না তো?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?' ভুরু জোড়া কপালে তুলল জেমস মিচেল।

'আজ সকাল থেকে রুডলফ গুন্থারের লোক দেখতে পাচ্ছি করোন্যাডো হোটেলে। মনে হলো আমাদের মরিসের ওপর চোখ রাখছে!' চাপা গলায় বলল হ্যামার, 'বিপদে নেই তো ছেলেটা?'

ভিতর ভিতর বেশ একটু বিচলিত হয়ে উঠল মিচেল। কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। একটা ডেসপ্যাচ লিখতে হবে বলে ফিরে চলল হোটেলের দিকে। বিকেলে দেখা হবে বলে হ্যামার এগোল ব্লু অ্যাঞ্জেল পিটের দিকে। চিন্তা ভারাক্রান্ত মুখ। আগামী কালকের রেসের ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে হবে আজ থেকেই।

সরু একটা রাস্তার দু'পাশে মুখোমুখি দুটো কাফেতে বসে আছে রানা এবং ক্লিকি বর্গ। একগ্লাস লেমনেড সামনে নিয়ে কারও জন্যে অপেক্ষা করছে রানা। ওপাশের কাফে থেকে রানার ওপর নজর রাখছে বর্গ—সামনের টেবিলে এক মগ বিয়ার।

সন্ধ্যা।

জেমস মিচেল এসে ঢুকল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশটা দেখে নিয়ে এগিয়ে এসে বসল রানার সামনের চেয়ারে। জিন ও টনিকের অর্ডার দিয়ে হাসল রানার দিকে চেয়ে।

'তারপর, রানা? কতদূর কি বুঝলে?'

'তেমন কিছুই না,' বলল রানা। 'তবে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছি। এগুলোকে ভাল মত বুঝতে হলে কিছু খবর আমার জানা দরকার। প্রথম প্রশ্ন, রুডলফ গুন্থার কে?'

ভিতর ভিতর হোঁচট খেল মিচেল, ওরফে ফিলিপ কার্টারেট। আজই দুপুর

বেলা হ্যামারের মুখে নামটা শুনে থমকে গিয়েছিল সে। রানার চোখের দিকে চাইল।

'তোমার জানা নেই? চেনো না ওকে? নামও শোনোনি?' তিনটে প্রশ্নের উত্তরেই রানাকে মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'আমরা এত ভাল করে চিনি যে ধরে নিয়েছিলাম পৃথিবীর সবাই চেনে লোকটাকে। যাই হোক, ধরো, ইন্দোনেশিয়ায় বিরাট একটা ড্যাম তৈরি করতে চাও তুমি, কিংবা বোম্বাইয়ে একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট বসাতে চাও, কিংবা ধরো, লন্ডন থেকে ডেনমার্ক পর্যন্ত গাড়ির জন্যে একটা ফেরি সার্ভিস চালু করতে চাও—অনেক টাকার ব্যাপার। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে আগে, অর্থাৎ ভালমত ব্যাপারটা ভেবে,দেখবার আগেই পরামর্শ নিতে হবে তোমার রুডলফ গুন্থারের কাছে, টাকা-পয়সার ব্যাপারটা সেই দেখবে। যেকোন কাজে যদি বিরাট ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজন থাকে, লোকে যায় গুন্থারের কাছে। কোনদিকে বাদ নেই, সব দিকে আছে ওর ইনভেস্টমেন্ট—জাহাজ, তেল, বিল্ডিং, কনস্ট্রাকশন, এয়ারক্রাফট—এক কথায় যদি উত্তর চাও, লোকটার নাম 'বিগ বিজনেস' ইউরোপের সবচেয়ে বড়লোক তিনজনের একজন।'

'ভাবছি,' বলল রানা, 'এতই বিখ্যাত লোক যদি হবে, আমি কোনদিন নাম শুনলাম না কেন।'

'তোমার কোম্পানী যদি সৎ পথে টাকা রোজগারে উৎসাহী হয়ে থাকে, নামটা না শোনাই স্বাভাবিক।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'গাড়িব ব্যাপারেও লোকটা আগ্রহী?'

'সেটা আমার জানা নেই। পরোক্ষভাবে হয়তো থাকতেও পারে জড়িত। তবে ওর নাম শুনতে না পাওয়ার আর একটা কারণ হচ্ছে, লোকটা পাবলিসিটি পছন্দ করে না। সমস্ত কাগজের মালিকদের সাথে দুস্তি আছে, সব রকমে সাহায্য করে সে ওদের, ফলে ওরা ঘাঁটায় না ওকে। ওকে ইউরোপ-অর্থনীতির রাসপুটিন বলা যায়। যেমন ব্যক্তিত্ব, তেমনি ক্ষমতা, তেমনি দুর্ধর্ষ, ভয়ঙ্কর। কিন্তু হঠাৎ ওর কথা কেন?'

'বলছি। লোকটা কত টাকার মালিক বলতে পারেন?'

'তা কেউ বলতে পারবে না। তবে যে কোন মুহূর্তে পাঁচ কোটি পাউন্ড বের করে দিতে পারবে লোকটা, আর্থিক অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হবে না তার ফলে। আরও একটু সহজ করে বলি—মাইকেল হ্যামার বিরাট বড়লোক, কোটিপতি; কিন্তু ওরমত একশোটা কোটিপতি কিনতে পারে রুডলফ গুন্থার।'

'কোথাকার লোক?'

'জার্মান। ছিল। এখন সে সারা পৃথিবীর বাসিন্দা। লয়ের ডিস্ট্রিক্টে বিশাল এস্টেট আছে, প্যারিসে নিজস্ব বাড়ি আছে, সারা পৃথিবীর তাবৎ বড় বড় শহরে বাড়ি রয়েছে ওর—কিন্তু কোথাও বাস করে না সে। হোটেলে হোটেলেই কাটে ওর বেশিরভাগ সময়। সব সময় চলার ওপরেই আছে। ফ্রী ওয়ারল্ডে তো আছেই, মস্কো-পিকিঙেও ওর অবাধ গতি। লোকটা বিষবৎ পরিত্যাজ্য,

কিন্তু ওকে ছাড়া চলেও না আবার—বড় কিছু শুরু করতে হলেই ডাক পড়বে গুস্থারের, মোটা একটা অংশ বের করে নেবে সে ওর থেকে নিজের জন্যে—তবু দরকার ওকে।'

'বে-আইনী কিছু করার দায়ে ধরা পড়েনি কোনদিন?'

'ধরা?' হাসল ফিলিপ কার্টারেট। 'আমি যখন ডুক্সেম ব্যুরোর চীফ ছিলাম, চেষ্টার ত্রুটি করিনি, কিন্তু কিছুতেই আটকাতে পারিনি ওকে। তবে খোঁজ খবরে কিছু ফল যে হয়নি তা নয়। যদিও কোন তথ্য প্রমাণ আমাদের হাতে নেই, আমরা ওর আসল পরিচয় জেনে গিয়েছি। ওর নাম আসলে হেনরিখ শোয়ার্য। গত মহাযুদ্ধে নাজি ও জাপানিয সরকারের সাথে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল ক্যাপসুলের খোল, সাবান, ফার্টিলাইযার এবং গানপাউডার সাপ্লাইয়ের। শুনতে মনে হচ্ছে সাধারণ একজন ব্যবসায়ী বুঝি। কিন্তু চুক্তিতে কাঁচামাল সাপ্লাই দেয়ার কথা উল্লেখ ছিল পরিষ্কার ভাবে। নাৎসী সরকার সাপ্লাই দিয়েছে মেটেরিয়াল। সেগুলো কি ছিল জানো? কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিহত লক্ষ লক্ষ ইহুদি নর-নারীর হাড়, চুল, দাঁত আর চর্বি। প্রথম জীবনে এইভাবে টাকা করেছে লোকটা। রাশিয়ানদের কাছে রয়েছে যেসব দলিল। হেনরিখ শোয়ার্যের পরিচয়-পত্রও রয়েছে ওদের কাছে। হাতে রেখে দিয়েছে, যেদিন খুশি, যেমন খুশি ব্যবহার করবে ওগুলো।'

'যদি ততদিন পর্যন্ত ওগুলো ওদের হাতে থাকে, তাহলে,' বলল রানা। 'যাই হোক, লোকটা জানে যে অস্ট্রিয়ার গ্র্যান্ডপ্রিক্সে আমি ইচ্ছে করেই ভেঙেছিলাম ফোর্থ গিয়ার। ধরে নিয়ে গিয়েছিল একটা বাসায়। ওর বক্তব্য: ইটালীর গ্র্যান্ডপ্রিক্সে আমার গাড়িতে কোন গোলমাল থাকবে না। আদেশ: বিজয়ী হতে হবে। নইলে সাফ করে দেয়া হবে আমাকে।'

'এতদিন বলোনি কেন?' বিস্ফারিত হয়ে গেল বৃদ্ধের চোখ। 'আরও আগে জানানো উচিত ছিল আমাকে।'

রানা লক্ষ করল ওপাশের রেস্তোরাঁয় বসা ক্লিকি বর্গের সাথে ইঙ্গিত বিনিময় হলো একজন লোকের। লোকটাকে আগে দেখেনি। সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে এই কাফেতে এসে ঢুকল সে, পাশের কেবিনে প্রবেশ করল। মনে মনে হাসল রানা।

'জানাইনি, তার কিছু কারণ আছে। সেসব কথায় পরে আসা যাবে। সেদিন আমাকে বলে দেয়া হয়েছিল চব্বিশ ঘণ্টা আমার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু গত তেরোটা দিন নতুন কোন মুখ দেখিনি আমি আমার আশেপাশে। আজ সকাল থেকে লক্ষ করছি, যে তিনজন আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেই বাসায়, তারা পালা করে নজর রাখতে শুরু করেছে আমার ওপর।'

'অর্থাৎ? কি বোঝাতে চাইছ?'

'বোঝাতে চাইছি, আমাদের মধ্যেই এমন এক বা একাধিক লোক রয়েছে যে বা যারা এই ক'দিন আমার ওপর নজর রেখেছে, কিন্তু এখন আর তাদের

ওপর তেমন ভরসা করতে পারছে না গুন্থার, অন্য লোক নিয়োগ করেছে। আরও একটা কথা। কাল রাতে যে আপনাদের অনুপস্থিতির সুযোগে আমি চারটে ঘর সার্চ করেছি, সে ব্যাপারটা জানতে বাকি নেই ওদের। এবং তার ফলে বেশ খানিকটা বিচলিতও হয়ে পড়ছে ওরা।'

চুপচাপ দু'মিনিট চিন্তা করল ফিলিপ কার্টারেট। ছোট ছোট চুমুক দিল গ্লাসে। তারপর বলল, 'তোমার কথাই বোধহয় ঠিক রানা। এর মধ্যে আরও কোন ব্যাপার রয়েছে।'

'সে প্রমাণও সংগ্রহ করেছি। ব্লু অ্যাঞ্জেল ট্র্যান্সপোর্টারের মধ্যে পেয়েছি একটা গোপন কম্পার্টমেন্ট। মিসেস এলিনা হ্যামারের নিখোঁজের সাথে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে আমার ধারণা।'

'হুম!' গম্ভীর হয়ে গেল কার্টারেট। 'তার মানে মাইককে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে।'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে,' বলল রানা। 'মাইকেল হ্যামারের খরচের হিসেবের যে ছবি তুলেছি ওটার উপর একবার নজর বুলালেই টের পাবেন।'

'তুমি ব্যবসায়ী না হয়ে এসপিওনাজ লাইনে গেলে দারুণ ভাল করতে পারতে, রানা!'

'কিন্তু রেস ড্রাইভার হলেও।' হাসল রানা।

'হয়ে তো গিয়েছই। থাকছ না তুমি এই লাইনে?'

'যতদিন পর্যন্ত আপনার সমস্যার সমাধান না হয়, থাকছি। আমার ধারণা, আগামী কালকের গ্র্যান্ডপ্রিক্সই আমার জীবনের শেষ প্রতিযোগিতা। দুঃখের বিষয়, পরাজয় নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে আমাকে এই লাইন থেকে।' পকেট থেকে একটা ফিল্ম কার্ট্রিজ বের করল রানা। 'আমার ঘর সার্চ হয়েছে কাল। মিনি ক্যামেরায় যে ফিল্মটা ভরা ছিল সেটা আলোর নিচে ধরে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ভয় নেই, বাজে ফিল্ম ছিল সেটা। এইটা ধরুন। কিছু ঠিকানা পাওয়া গেছে, কোডে লেখা। সময়ও ছিল না তাছাড়া আমি এসব কোডের কিছু বুঝিও না, অর্থ উদ্ধার করতে হবে আপনাকেই।'

'সেজন্যে চিন্তা নেই। আমার এক্সপার্ট রয়েছে।' গ্লাসটা শেষ করে রানার চোখের দিকে চাইল ফিলিপ কার্টারেট। 'বোঝা যাচ্ছে এই ব্যাপারটা একটা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। এবার তোমার ব্যবসার ব্যাপারে কিছু বলবে?'

'শেষ হয়ে নিক। এখনও শেষ হয়নি। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা গেছে কেবল, এবার আসল কাজটা বাকি। সেটুকু হয়ে যাক।'

'ভয়ানক বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে পুরো ব্যাপারটা, রানা। তোমার নিরাপত্তার জন্যে ভাবছি, এখুনি তোমাকে ছুটি দিয়ে দেব কিনা। রুডলফ গুন্থারের আদেশ লঙ্ঘন করতে যাচ্ছ তুমি, সেটা কতটা বিপজ্জনক তুমি না জানতে পারো, কিন্তু আমার জানা আছে। তারচেয়ে...'

'বিপদ জিনিসটা আমি পছন্দ করি মিস্টার কার্টারেট। এর যথেষ্ট প্রমাণ আপনার হাতে রয়েছে। আমি দেখতে চাই গুন্থার ঠিক কতটা ভয়ঙ্কর।

তাছাড়া আমি যদি এখুনি সরে দাঁড়াই তাহলে দোষীকে শায়েস্তা করবার কোন উপায় থাকবে না আপনার হাতে। আইনের মাধ্যমে আপনি সুবিচার পাবেন না। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে হলে আইনের বেড়াটা একটু ডিঙিয়ে যেতে হবে আপনাকে। কারণ কোর্টে আপনার তথ্য প্রমাণ সবগুলো টিকবে না। এগুলো কার সংগ্রহ করা তথ্য? আমার। আমি কে? জাল পাসপোর্টধারী এক লোক, মরিস রেনার। আমার সাক্ষ্য বা আমার সংগ্রহ করা প্রমাণ খুব একটা মূল্য পাবে না কোর্টের কাছে, যদি না হাতে নাতে পুলিসের কাছে ওদের সোপর্দ করা যায়। কাজেই আমার সাহায্যের প্রয়োজন এখনও ফুরোয়নি আপনার।'

'তা তো বুঝলাম, বাবা, কিন্তু তোমার বিপদের কথা ভেবে আর এগোতে ভরসা পাচ্ছি না। ব্যাপারটা এতটা জটিল আর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে জানলে…'

'আমাকে আর এর মধ্যে টানতেন না। কিন্তু এসে যখন পড়েছি, তিন-তিনটে মাস যখন খরচ করেই ফেলেছি, তখন কাজটা শেষ করতে দিন। সমস্ত ঝুঁকি আমি স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিচ্ছি। এবার আপনার কাজটা বুঝে নিন। প্রথম কাজ, এই ফিল্ম কার্ট্রিজটার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় কাজ, আমাকে ট্র্যান্সপোর্টারের চাকরিটা জোগাড় করে দেয়া। কালই আমি গ্র্যান্ডপ্রিক্স থেকে ইস্তফা দেব। সাথে সাথেই যাতে আমাকে ট্র্যান্সপোর্টারের ড্রাইভারিটা দেয়া হয় সে ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার হবে খুব সম্ভব। মাইকেল হ্যামার তার সেরা ড্রাইভারকে ট্রাক-ড্রাইভারের চাকরি দিতে চাইবেন না কিছুতেই।'

'যে ড্রাইভার আছে তার কি হবে?'

'তাকে গায়েব করে ফেলুন, বা অসুস্থ করে ফেলুন, যা খুশি যা ভাল বোঝেন করুন। চাকরিটা আমার চাই। মাইকেল হ্যামার রাজি না হলে তাকে রাজি করাবার ভারও আপনার।'

'ঠিক আছে। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর কিছু বলবে?'

'আপাতত আর কিছুই না। বাকিটা পরে বলা যাবে।'

উঠে দাঁড়াল দু'জন। বেরিয়ে গেল কাফে থেকে।

সমস্যায় পড়ল ক্লিকি বর্গ। কাকে অনুসরণ করবে এবার? মিচেল বুড়োর হাতে একটা ফিল্ম কার্ট্রিজ দিতে দেখেছে সে রেনারকে। নিশ্চয়ই সেটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু। ভালডেজ কিরে কেটে বলছে, বুড়োটা ডুক্রেম ব্যুরোর চীফ ছিল। সেই অবস্থায় এখন রেনারকে অনুসরণ করবে, না মিচেলকে, বুঝতে না পেরে মিলানের হোটেল সেসনিতে ফোন করল সে। চাইল রুডলফ গুস্থারকে। কানেকশন পাওয়ার আগেই দৌড়ে এসে হাজির হলো ভালডেজ।

'ইয়েস?' গুন্থারের ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'বর্গ বলছি, স্যার। এইমাত্র একটা কাফেতে বসে মিচেলকে একটা ফিল্ম কার্ট্রিজ দিল মরিস রেনার। কথাবার্তা কি হয়েছে তার কিছুটা শুনেছে

ভালডেজ। ও বলছে জেমস মিচেল আসলে ডুক্সেম ব্যুরোর চীফ ফিলিপ কার্টারেট। দু'জনই বেরিয়ে পড়েছে কাফে থেকে। কাকে ফলো করব?'

'ভালডেজকে দাও রিসিভারটা।'

'ইয়েস, সেনর?'

'তুমি শিওর যে মিচেলই ফিলিপ কার্টারেট?'

'হানড্রেড পার্সেন্ট, সেনর।'

'কথাবার্তা কি শুনলে?'

'পরিষ্কার সবকিছু শোনা যায়নি সেনর। নিচু গলায় কথা বলছিল ওরা। ফিল্মের মধ্যে কোডেড ঠিকানা আছে বলে মনে হলো, হ্যামারকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে তার প্রমাণ রয়েছে। রেনার বলল, আগামী গ্র্যান্ডপ্রিক্সই ওর জীবনের শেষ গ্র্যান্ডপ্রিক্স, এবং পরাজয় নিয়ে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে ওকে। ও নাকি দেখতে চায় রুডলফ গুস্থার কতটা ভয়ঙ্কর। রেস ছেড়ে ও ব্লু অ্যাঞ্জেলের ট্র্যান্সপোর্টারের ড্রাইভার হতে যাচ্ছে কাল থেকে। কার্টারেট সাহায্য করবে ওকে সে ব্যাপারে।'

'ঠিক আছে। দেখতে যখন চেয়েছে, আমি দেখাব ওকে সময় বিশেষে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে গুস্থার। ওরা দু'জন কি একসাথে একই দিকে যাচ্ছে?'

'না, সেনর। দু'জন দু'দিকে। কার্টারেট খুব সম্ভব চলেছে পোস্ট অফিসের দিকে। রেনার ফিরে যাচ্ছে হোটেলে।'

'অলরাইট। তুমি রেনারের পিছু নাও। হোটেলে পৌঁছবার আগেই কিডন্যাপ করতে হবে ওকে। বর্গ তোমাকে সাহায্য করবে, গাড়ি নিয়ে থাকবে ও কাছাকাছিই, কিন্তু রেনারের সামনে যাবে না। ওকে চেনে রেনার। যেমন ভাবে পারো তুলে নিয়ে এসো ওকে। যদি বাধা দেয় একেবারে শেষ করে দিতে দ্বিধা করো না।'

'আর কার্টারেট?'

'ওর ব্যবস্থা আমি করছি।'

ক্লিক করে কেটে গেল কানেকশন।

সন্ধ্যা বেশ একটু ঘন হয়ে এসেছে। দশ মিনিট হাঁটার পর দেখতে পেল ও ভালডেজকে। সামনে থেকে হেঁটে এগিয়ে আসছে রানার দিকে। অর্থাৎ, গাড়ি করে ওকে সামনে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ওর সঙ্গী। চারপাশে চাইল রানা। ফিয়াট সিক্স হানড্রেডটা গেল কোথায়? পিছনে চেয়েই চোখজোড়া ঈষৎ ছোট হয়ে গেল ওর। ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে ওটা। মুহূর্তে বুঝে নিল রানা, ওটা এমন গতিতে এগোচ্ছে যাতে ভালডেজ যখন হাঁটতে হাঁটতে ওর পাশে এসে পৌঁছবে, ঠিক তখন গাড়িটাও ওর পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। চট করে চারিটা পাশ দেখে নিল সে আর একবার। এতক্ষণ খেয়ালই করেনি সে, সরু রাস্তাটা প্রায় নির্জন। দশ হাত সামনে একই দিকে হাঁটছে এক বুড়ি, ওপাশের

ফুটপাথ ধরে তিনটে বাচ্চা ছেলে হেঁটে আসছে এইদিকে। একমাত্র পুরুষ মানুষ যার কাছ থেকে কিছুটা সাহায্য পাওয়া যেতে পারত সে ওকে ছাড়িয়ে চলে গেছে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ গজ পিছনে।

মনে মনে ওদের টাইমিং-এর প্রশংসা না করে পারল না রানা। হঠাৎ বাঁয়ে ঘুরে একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল সে। অন্ধকার গলি ধরে কয়েক গজ যেতেই আবছা আলোকিত একটা প্রাঙ্গণ। সিঁড়িঘর দেখা যাচ্ছে অন্ধকার মত। আঁধারে দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে রইল রানা।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সে। কান দুটো সজাগ। এক মিনিট দুই মিনিট করে চার মিনিট পেরিয়ে গেল। কারও কোন সাড়াশব্দ নেই। গাড়িটা যে অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে ওর কোন সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে রাস্তায়, হেঁটে চলে যাচ্ছে মানুষ। কয়েকটা গাড়িও চলে গেল মৃদু আওয়াজ তুলে। দাঁড়িয়ে আছে রানা, ধৈর্যের প্রতিমূর্তি বক সন্ন্যাসী যেন।

অতি সাবধানে এগিয়ে আসছে ভালডেজ। আবছা ভাবে দেখতে পেল রানা। গলির মাথায় পৌঁছে থামল। কচ্ছপের মত ঘাড় ঘুরিয়ে পরীক্ষা করল প্রাঙ্গণটা। দ্বিধান্বিত। আর এগোনো ঠিক হবে কিনা বুঝে উঠতে পারছে না। কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করে কোটের ভিতরের পকেট থেকে কিছু বের করল। মুহূর্তের জন্যে আবছা আলোয় জিনিসটা ঝিক করে উঠতেই মৃদু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে—পিস্তল নয়, ছোরার ওস্তাদ। গোলাগুলির ব্যাপার হলে হুলস্থূল কাণ্ড বেধে যেত।

অতি সাবধানে সতর্ক পায়ে এগিয়ে এল লোকটা। তিন গজের মধ্যে পৌঁছে দেখতে পেল রানাকে। সামান্য একটু চমকে উঠেই প্রস্তুত হয়ে গেল লোকটার যোগ্যতার অভাব ছিল না, দ্রুততারও অভাব ছিল না কার্যকলাপে, কিন্তু রানার মোকাবিলা করবার মত বিদ্যুৎগতি সে কোথায় পাবে? ছুরি চালাল সে ঠিক সময়মতই, কিন্তু তার আগেই ঝাঁপ দিয়েছে রানা। খটাশ করে হাঁটুর উপর লাথি পড়ল শক্ত জুতোর। হুড়মুড় করে পড়ল দু'জন শান বাঁধানো প্রাঙ্গণে।

মাথা থেকে হ্যাট খসে পড়ল লোকটার। সাঁই করে রানার পাঁজরার ভিতর ঢুকিয়ে দিচ্ছিল ছুরিটা, ধরে ফেলল রানা ওর কব্জি। প্রাণপণ শক্তিতে যুঝছে দু'জন। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ছুরি রানার বুকের কাছে। বিঁধছে অল্প অল্প। হঠাৎ কব্জিটা ছেড়ে দিয়ে ঝট করে সরে গেল রানা কয়েক ইঞ্চি। ছুরিটা ঢুকল বগলের নিচ দিয়ে। ধাঁই করে কারাতে চপ লাগাল রানা লোকটার কণ্ঠ নালীর উপর। হাত থেকে খসে পড়ে গেল ছুরিটা। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে লোকটার, হঠাৎ শিথিল হয়ে গেল শরীরটা। জ্ঞান হারাল।

উঠে দাঁড়িয়ে ধুলো ঝাড়ল রানা, মাটি থেকে হ্যাটটা তুলে মাথায় পরল, তারপর বুক পর্যন্ত বের করে চাইল গলি পথের দিকে। সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে

বর্গ্। হাতছানিতে ডাকল রানা ওকে, তাড়াতাড়ি আসবার ইঙ্গিত করল। ভালডেজ বলে ভুল করল বর্গ্ রানাকে, দ্রুতপায়ে এগোল। পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে আছে সামনে।

কাছে এসেই দড়াম করে প্রচণ্ড এক লাথি খেল সে ভুঁড়ির উপর। পরমুহূর্তে ডান বাহুর নার্ভ সেন্টারে পড়ল ভয়ঙ্কর এক জুডো চপ। সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তল কোন উপকারেই লাগল না ওর, খশে গেল অবশ হাত থেকে। কোটের কলার ধরে এক হ্যাঁচকা টানে প্রাঙ্গণে নিয়ে এল রানা ওকে, তারপর দমাদম তিনটে ঘুসি লাগিয়ে দিল নাকে-মুখে। ছিটকে গিয়ে ভালডেজের পায়ে হোঁচট খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল বর্গ্, পড়েই স্থির হয়ে গেল।

কান পাতল রানা। স্টার্ট দিয়ে রাখা ফিয়াটের ইঞ্জিনের মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এল সে রাস্তায়। উঠে বসল সিক্স হানড্রেড ফিয়াটের ড্রাইভিং সীটে। ভোঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা, একশো গজ গিয়ে পড়ল বড় রাস্তায়।

মাথার মধ্যে একরাশ চিন্তা নিয়ে দ্রুতপায়ে এগোচ্ছে ফিলিপ কার্টারেট পোস্ট অফিসের দিকে।

চিন্তাটা মাসুদ রানাকে নিয়ে। অদ্ভুত ছেলেটা। আশ্চর্য দক্ষতার সাথে কাজ করেছে গত তিনটে মাস। জুলির মত সেও ভাবতে শুরু করেছিল, রেসের মোহে পড়ে গেছে বুঝি ছেলেটা, বিশ্ব-বিখ্যাত হওয়ার নেশা চেপে গিয়েছে ওর মাথায়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি ওকে এত খ্যাতি, মান, সম্মান, প্রশংসা, টাকা—কোনকিছুই। যে কাজের জন্যে নেমেছিল প্রতিযোগিতায় সেটা শেষ হয়ে আসতেই বিনা দ্বিধায় ফিরে যাবে ছেলেটা নিজের কাজে। রেসের মোহ কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি ওর উপর। কি করে এটা সম্ভব? নিশ্চয়ই যে কাজে সে আছে তাতে এর চেয়ে অনেক বেশি মজা পায় সে। কি সেই কাজ? এখন পর্যন্ত নিজের ব্যবসা সম্পর্কে একটি কথাও বলেনি মাসুদ রানা, কোন রকম সাহায্য গ্রহণ করেনি ওর। কেন? গ্র্যান্ডপ্রিক্স চ্যাম্পিয়ান হওয়ার মোহ ত্যাগ করা চাট্টিখানি কথা নয়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি অবাক হচ্ছে সে ছেলেটাকে হাসিমুখে এত বড় বিপদের ঝুঁকি মাথা পেতে নিতে দেখে। যে কোন লোকের পক্ষে যেখানে এসে আঁৎকে উঠে দশ পা পিছিয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে পৌঁছে সদর্পে বলছে ছেলেটা—আমি দেখতে চাই গুন্ডার ঠিক কতটা ভয়ঙ্কর। মূর্খের দর্প নয়, কথাটা না বুঝে বলেনি রানা। ওর প্রতিটা কথা যুক্তিপূর্ণ। এখন যদি ও সরে দাঁড়ায় তাহলে পলের মৃত্যুর কারণ জানা যাবে ঠিকই, কিন্তু অপরাধীকে শাস্তি দেয়া সম্ভব হবে না। কথাটা ঠিকই বলেছে রানা।

রানার কথা যত ভাবছে ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে ফিলিপ কার্টারেট। প্রথম দিকে ভেবেছিল সম্পূর্ণ আনাড়ী একটা ছেলের উপর এত বড় একটা

গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করা ঠিক হচ্ছে না, ভেবেছিল একটু বাধার সম্মুখীন হলেই ভেগে যাবে রানা, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল কিছুই শিখিয়ে দিতে হলো না, পুরো ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে সেই বরং কিভাবে কি করলে ভাল হয় বুঝিয়ে দিল তাকে। বিপদ এল, আক্রমণ শুরু হয়ে গেল, কিন্তু পিছিয়ে আসা তো দূরের কথা, সিংহের মত ঝাঁপ দিল ছেলেটা সামনের দিকে। কিন্তু রুডলফ গুন্থারের নাম শুনে মনটা দমে গেছে ফিলিপ কার্টারেটের। আগামীকাল গুন্থারের আদেশ লংঘন করে ভয়ানক এক অবস্থার সৃষ্টি করতে যাচ্ছে মাসুদ রানা। গুন্থারের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে নামাটা কি ঠিক হচ্ছে? বিদেশী এক যুবককে বেঘোরে প্রাণ দেয়া থেকে রক্ষা করতে পারবে সে? চেষ্টার ত্রুটি করবে না, কিন্তু সত্যিই কি পারবে সে ছেলেটাকে বাঁচাতে? এত বড় ঝুঁকি নেয়া কি উচিত হচ্ছে? কি ভাবে ঠেকানো যায় ওকে? জুলিকে দিয়ে বলালে কোন লাভ হবে? ওর জন্যে বিদেশী এক যুবক দুর্ধর্ষ এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে খুন হয়ে যাবে সেটা কি করে সহ্য করবে সে?

ডানদিকে মোড় নিল ফিলিপ কার্টারেট। আর দেড়শো গজ গেলেই পোস্ট অফিস। শনিবারের সন্ধে বলে রাস্তা প্রায় জনশূন্য। রাস্তার দু'পাশে বাড়ি। এলাকাটা আবাসিক। এদিকটায় সম্পদশালী লোকের বাস। দোকানপাট যাও আছে, বন্ধ। একটা খোলা গ্যারেজের সামনে একজন লোককে দেখা যাচ্ছে কেবল। ওয়ার্কম্যানের ওভারল পরা লোকটা নিজের গাড়ির এঞ্জিন মেরামত করছে একমনে। কাছে এসে দেখল কার্টারেট, ঘেমে নেয়ে উঠেছে লোকটা, কালি-ঝুলি মেখে একেবারে বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। মনে মনে ভাবল, এত কষ্ট করার চেয়ে কোন মেকানিককে ডেকে কাজটা করিয়ে নিলেই পারত বেচারা। শনিবারের সন্ধেটা মাটি করছে খামোকা।

কার্টারেট যখন গ্যারেজটা পেরোচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল লোকটা। যথেষ্ট ভদ্রতার সাথে নিজের গা বাঁচিয়ে সরে যাচ্ছিল ফিলিপ কার্টারেট, এমনি সময়ে খপ করে ওর কোটের কলার চেপে ধরল লোকটা। এক হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এল গ্যারেজের খোলা দরজার সামনে। নাক-মুখের উপর প্রচণ্ড এক থাবড়া খেয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল কার্টারেট গ্যারেজের মাঝখানে। দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছে লোকটা। উঠে বসতে যাচ্ছিল কার্টারেট, পাঁজরে লাথি খেয়ে শুয়ে পড়ল আবার। দু'পাশ থেকে আরও দু'জন এসে দাঁড়িয়েছে। চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলল ওকে একজন, আরেক ঘুসিতে ধরাশায়ী হলো সে আবার। মোটা এক ডাণ্ডা তুলেছে একজন মাথার উপর। জ্ঞান হারাবার পূর্ব মুহূর্তে শুনতে পেল সে কে যেন বলছে—'মেরে ফেলিস না একেবারে। যা আছে কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিতে বলেছে বস্।'

দ্রুতবেগে নেমে আসছিল ডাণ্ডা, মাথার উপর পড়তে গিয়েও সামান্য একটু সরে পড়ল কাঁধের উপর। অবশ হয়ে গেল পুরো ডান হাতটা।

জ্ঞান হারাল ফিলিপ কার্টারেট।

সাত

জেমস মিচেল ঢুকতেই হুলুস্থুল পড়ে গেল করোন্যাডো হোটেলের লবিতে। প্রত্যেকটা চোখ একসাথে ফিরল তার দিকে। দু'জন পুলিস দু'পাশ থেকে ধরে কোন রকমে দাঁড় করিয়ে রেখেছে তাকে, টলতে টলতে পা ফেলছে সে সামনে, রক্তাক্ত নাক-মুখ, একটা চোখ প্রায় বুজে এসেছে, কপালের একটা কাটা থেকে রক্ত ঝরছে এখনো, নীল হয়ে আছে চোয়ালের একটা অংশ।

এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কাপলান ও হ্যানসিঙ্গার। দৌড়ে এসে ধরল মিচেলকে।

'মাই গড! কি হয়েছে আপনার, মিস্টার মিচেল?' বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ্যানসিঙ্গারের চোখ।

'জানি না,' আবছা ধরা গলায় বলল মিচেল। 'হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনজন লোক···মারতে শুরু করল···'

'হায় হায়! কেন? কে করল কাজটা, মানে, কোথায় ঘটল ব্যাপারটা?'

রিসেপশনিস্ট পৌঁছে গেছে। একজন কনস্ট্যাবল তার দিকে চেয়ে বলল, 'ডাক্তার। এক্ষুণি দরকার, প্লীজ!'

'এখুণি খবর দিচ্ছি। এক মিনিট। আমাদের হোটেলেই আছেন চারজন।' হ্যানসিঙ্গারের দিকে ফিরল সুন্দরী রিসেপশনিস্ট। 'মিস্টার মিচেলের ঘর চেনেন? আপনারা যদি দয়া করে এঁদের দেখিয়ে দেন ঘরটা···'

'কোন দরকার নেই,' বলল হ্যানসিঙ্গার। 'মিস্টার কাপলান আর আমিই নিয়ে যাব।'

'দুঃখিত,' বলল একজন পুলিসম্যান। 'এঁর কাছ থেকে একটা স্টেটমেন্ট নিতে হবে।'

ভুরু কুঁচকে কটমট করে চাইল কাপলান লোকটার দিকে। বলল, 'আপনাদের স্টেশন নাম্বার রেখে যান ডেস্কে। ডাক্তার যখন কথা বলবার অনুমতি দেবে তখন ডেকে পাঠানো হবে আপনাদের। তার আগে নয়। এক্ষুণি ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়া দরকার। বুঝতে পেরেছেন?'

বুঝতে পারল ওরা মাথা ঝাঁকিয়ে কাপলান আর হ্যানসিঙ্গারের হাতে ছেড়ে দিল মিচেলের ভার। মিচেলকে প্রায় শূন্যে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল ওরা। দুই মিনিটেই পৌঁছে গেল ডাক্তার। খবর পেয়ে জুলিয়া এসে পৌঁছেচে। আরও সবাই হন্তদন্ত হয়ে আসছে ছুটে। কিন্তু ভিড় বাড়াতে দিল না ডাক্তার, বের করে দিল সবাইকে ঘর থেকে। বিশাল শরীর নিয়ে উদভ্রান্ত পদক্ষেপে ছুটে এল মাইকেল হ্যামার। কটমট করে চাইল জুলিয়া আর হ্যানসিঙ্গারের দিকে, যেন সব দোষ ওদেরই।

'মিচেলের যা হয়েছে শুনলাম. সত্যি?'

মাথা ঝাঁকাল হ্যানসিঙ্গার। 'সত্যি। কারা যেন মারধোর করেছে ভদ্রলোককে। খুব মেরেছে।'

'কেন?' কঠিন হয়ে গেল হ্যামারের মুখের চেহারা। 'কে মারল?'

'ডাকাতি খুব সম্ভব,' বলল হ্যানসিঙ্গার। 'রাহাজানি। যা ছিল কেড়ে নিয়েছে সব।'

'সন্ধে লাগতে না লাগতেই রাহাজানি! খোদা! কি হলো দুনিয়াটার? কোথায় মিচেল?'

'ঘরে।'

'তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে কেন?'

'ঘরে ডাক্তার আছে। আমাদের বের করে দিয়েছে ঘর থেকে।'

আর কথা না বাড়িয়ে ধুপধাপ পা ফেলে মিচেলের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল হ্যামার। দুটো টোকা দিয়ে ঢুকে গেল ভিতরে। মিনিট দশেক পর বেরিয়ে গেল ডাক্তার। আরও পাঁচ মিনিট পর আস্তে দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল মাইকেল হ্যামার। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ানো জটলাকে আশ্বস্ত করল, 'কোন ভয় নেই। মারাত্মক কিছু না। ঘুমাচ্ছে এখন···ডিস্টার্ব কোরো না কেউ।' চেহারায় একরাশ উদ্বেগের ঘনঘটা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল সে।

লবিতে ঢুকেই খবর পেল রানা। কিন্তু কোন রকম বিস্ময় বা উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পেল না ওর মধ্যে। যেন মিচেলের মৃত্যু সংবাদ পেলেও ওর কিছুই এসে যেত না, এমনি ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল উপরে। জুলিয়ার ঘর ছাড়িয়ে তারপর রানার ঘর। পার হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু থমকে দাঁড়াল রানা জুলিয়ার দরজাটা ঝট করে খুলে যেতেই।

'ভেতরে এসো। কথা আছে।'

আড়চোখে দেখে নিল রানা কাপলানের দরজাটা। আধ ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁক হয়ে আছে কপাট দুটো।

'পরে, জুলি,' বলল সে। 'এখন···'

'না, এখনই। তুমি ফিরে আসার সাথে সাথে খবর দিতে বলেছে বাবা। বলেছে···'

রানার গাল দুটো একটু কুঁচকে উঠতেই থেমে গেল জুলিয়া। চাপা গলায় বলল, 'দেখা করতে বলেছে এক্ষুণি।'

'তার আগে মিস্টার মিচেলকে দেখতে যাওয়া দরকার,' উঁচু গলায় বলল রানা। 'কারা নাকি মারধোর করেছে ওকে, শুনেছ?'

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল জুলিয়া, কিন্তু চট করে সামলে নিয়ে বলল, 'শুনেছি। ঠিক আছে, তার পরে না হয় যেয়ো। ব্যাপারটা খুবই জরুরী, ভুলে যেয়ো না আবার।'

জুলিয়ার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। নিজের ঘরে ঢুকল রানা। এক নজর চোখ বুলিয়েই টের পেল ওর অনুপস্থিতিতে আজ আর ঢোকেনি কেউ এ ঘরে।

দরজা লাগিয়ে দিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়াল সে মিচেলের ঘরের দরজায়। মৃদু ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা।

এক চোখ মেলে চাইল ফিলিপ কার্টারেট। দ্বিতীয় চোখটা বুজে গেছে। কপালে আর থুতনিতে স্টিচ, এছাড়া সারামুখে নানান আকৃতির প্লাস্টার সাঁটানো। নাকটা স্বাভাবিকের দ্বিগুণ হয়ে রয়েছে ফুলে।

ঘরে ঢুকে দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিল রানা। তারপর বিনা-বাক্য-ব্যয়ে সারাটা ঘর সার্চ করল তন্ন তন্ন করে। গোপন মাইক্রোফোন বা ওই জাতীয় কিছু পাওয়া গেল না, কিন্তু তবু নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যে বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার এবং ট্যাপ খুলে দিয়ে এল। জল পড়ার শব্দ হলে কথাবার্তা বোঝা মুশকিল, শত্রুপক্ষ যত শক্তিশালী মাইক্রোফোনই ব্যবহার করুক না কেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রানার কার্যকলাপ পরীক্ষা করল কার্টারেট, রানা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বিছানার ধারে বসতেই হাসল।

'তোমার কাজকর্ম দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না যে তুমি একজন ট্রেনিং পাওয়া স্পাই নও, সাধারণ এক ব্যবসায়ী।'

'আপনার কাজকর্ম দেখে কেউ কেউ বিশ্বাস করছে না যে আপনি সাধারণ এক সাংবাদিক।'

'হুম। আশ্চর্য ব্যাপার রানা। মেরে ফেলল না কেন?'

'সহজ কারণ! আপনাকে মেরে ফেলা উচিত মনে করেনি ওরা। হয় ঝামেলা বাড়াতে চায়নি খুনখারাবি করে, নয়তো টের পেয়ে গেছে আপনার আসল পরিচয়। আপনাকে মেরে ফেলা মানে যে ভীমরুলের চাকে ঢিল দেয়া, সেটা জানা থাকলে যত বড় ভয়ঙ্কর বা দুর্ধর্ষ লোকই হোক, একশো এক বার চিন্তা করবে কাজটা করার আগে।'

মাথা ঝাঁকাল কার্টারেট। বলল, 'সব কেড়ে নিয়েছে, রানা। ফিল্ম কার্ট্রিজটাও। তোমার এত পরিশ্রম সব বিফলে গেল।'

একটু ইতস্তত করল রানা। কেশে গলা পরিষ্কার করল। কার্টারেটের চোখের দিকে সরাসরি না চেয়ে বলল, 'বিফলে ঠিক যায়নি, মিস্টার কার্টারেট। ওতে তেমন কিছুই ছিল না।'

'তার মানে?' বালিশে হেলান দিয়ে উঠে বসল ফিলিপ কার্টারেট। 'তেমন কিছু ছিল না মানে?'

'কিছু মনে করবেন না,' বলল রানা। 'এই রকমের একটা কিছু ঘটতে পারে মনে করে আসল ফিল্মটা দিইনি আমি আপনাকে। ওটা সযত্নে রাখা আছে এই হোটেলের সেফে। আপনাকে অন্য একটি কার্ট্রিজ দিয়েছিলাম।'

কপালে উঠল কার্টারেটের এক চোখ।

'বাজে একটা ফিল্মের জন্য তুমি আমাকে মার খাওয়ালে!'

'আসল ফিল্মটার জন্যে মার খেলে হয়তো আপনার সান্ত্বনা থাকত, মনে হত উচিত কারণেই মার খেয়েছেন; কিন্তু কাজটা পিছিয়ে যেত অনেকখানি। তাই না? খামোকা রাগ করছেন আপনি। আসলটা খোয়া যায়নি সেজন্যে বরং

আপনার খুশি হওয়া উচিত।' হাসল রানা। 'ইচ্ছে করে মার খাওয়াইনি আমি আপনাকে। আমার জানা ছিল না যে এইভাবে মারধোর করা হবে আপনাকে। আমার নিজের ওপর যে হামলা আসবে সেটাও জানা ছিল না। অন্য একটা ফিল্ম আপনার হাতে ধরিয়ে দেওয়ার বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ছিল আমার।'

'ওরে শয়তান!' অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল ফিলিপ কার্টারেট। হাসল। 'তুমি দেখছি শেয়ালকেও হার মানাবে! কি ছিল ওই ফিল্মে?'

'শতখানেক গ্যাস টার্বাইন এঞ্জিনের লাইন ড্রইং। আমি চেয়েছিলাম ওরা মনে করুক আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজে আছি, ওদের মতই আরেক শয়তান। ভেবেছিলাম আমার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকবে ওরা ওটা পেলে। ঘাঁটাবে না আর।'

'কিন্তু?'

'কিন্তু বুঝতে পারছি, আমাদের দু'জনকে ঠিকই চিনে নিয়েছে ওরা।'

'তোমাকেও আক্রমণ করেছিল?'

'হ্যাঁ। দু'জন। যতদূর সম্ভব ওদের উপর আদেশ ছিল আমাকে ধরে নিয়ে যেতে না পারলে যেন মেরে রেখে যায়। চেষ্টার ত্রুটি করেনি ওরা।'

'ছাড়া পেলে কি করে? তুমি একা, ওরা দু'জন··· নিশ্চয়ই অস্ত্র ছিল···'

'এক সময় শখ করে কারাতে আর জুডো শিখেছিলাম।'

'ব্ল্যাক বেল্ট হোল্ডার?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। বলল, 'কিন্তু এখন থেকে শুধু শয়তান হলে চলবে না। সতর্ক শয়তান হতে হবে। আমাদের দু'জনকেই।'

পরদিন একের পর এক ধাক্কা খেয়ে দশ বছর বেড়ে গেল মাইকেল হ্যামারের বয়স।

জি.পি.ডি.এ. অর্থাৎ গ্র্যান্ডপ্রিক্স ড্রাইভার্স এসোসিয়েশন রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করল সকাল দশটায়। প্রত্যেক ড্রাইভারকে দিতে হলো রক্ত। রেনারকেও। ঠিক দুটোর সময় জানা গেল ফলাফল। মুষড়ে পড়েছিল সে, জানা কথা—বাদ পড়ছে রেনার, তবু দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করেছে সে ফলাফলের জন্যে। রিপোর্ট দেখে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো ওর। অ্যালকোহলের চিহ্নমাত্র নেই রেনারের রক্তে।

নিশ্চয়ই আর কারও সঙ্গে বদলে গেছে রেনারের রক্ত। প্রথমে ভাবল চেপে যাবে ব্যাপারটা। কিন্তু যখন বুঝল এর ফলে একজন নিরপরাধ ড্রাইভার হয়তো বাদ পড়তে যাচ্ছে আজকের রেস থেকে, তখন আর স্থির থাকতে পারল না সে কিছুতেই, সোজা গিয়ে হাজির হলো সমিতির প্রেসিডেন্টের কাছে। ওখানে যখন জানা গেল যে প্রত্যেকটা ড্রাইভারকে ও.কে. করা হয়েছে, কেউ বাদ যায়নি, তখন আরও অবাক হয়ে গেছে বৃদ্ধ। শঙ্কিত হৃদয়ে

চিন্তা করেছে তবে কি এটা রুডলফ গুন্থারের কোন রকম কারসাজি? রেনারের রক্তে অ্যালকোহল পাওয়া না যাওয়ার আর কি কারণ থাকতে পারে? ছেলেটা যে মদ খাচ্ছে তাতে তো কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাহলে?

বিকেল বেলা শুরু হলো রেস। সাঁ করে বেরিয়ে গেল রানা সবার আগে। রেনারের ঠিক পিছনেই রয়েছে হুবার্ট হ্যানসিঙ্গার। দ্বিতীয় ল্যাপেই বেশ অনেকটা পিছনে ফেলে দিল রেনার হ্যানসিঙ্গারকে। মার্কাস কাপলানও ওকে ডিঙিয়ে রানার পিছু পিছু ছুটছে। আশ্চর্য দক্ষতার সাথে চালাচ্ছে রেনার। ছয় ল্যাপেই তিনটে ল্যাপ রেকর্ড ব্রেক করে অনেকটা এগিয়ে গেছে। একজন মদ্যপ ছোকরার পক্ষে এটা কি করে সম্ভব হয় কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না হ্যামার।

খুশিতে লাফাচ্ছে জুলিয়া। ব্রনসনের মুখেও ফুটে উঠেছে হাসি, চেষ্টা করেও চেপে রাখতে পারছে না। কিন্তু নবম ল্যাপে সবার সব খুশি মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে গেল একের পর এক একুশটা গাড়ি, রেনারের দেখা নেই।

'কি হলো!' উৎকণ্ঠিত হ্যামারের মুখ থেকে বেরিয়ে এল বিস্ময় ধ্বনি। 'চল্লিশ সেকেন্ড পার হয়ে গেল! কোথায় গেল রেনার? ব্রনসন, ফোন করো।'

আশেপাশে কোথাও ব্রনসনকে না দেখে নিজেই ছুটতে শুরু করল হ্যামার। ট্র্যাক-মার্শালদের চেকপয়েন্টে ফোন করলে জানা যাবে অবস্থাটা। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই থেমে গেল সে। রেনারের গাড়িটা থামল এসে ব্লু অ্যাঞ্জেল পিটে। এঞ্জিনের শব্দে কোন ত্রুটি ধরা পড়ল না ওর অভিজ্ঞ কানে। ছুটল নীল গাড়িটার দিকে। গাড়ি থেকে নেমে হেলমেট খুলে ফেলল রেনার। হ্যামার লক্ষ করল হাতটা কাঁপছে থরথর করে, রেনারের চোখ দুটো লাল।

'সব কিছু দুটো দেখছি,' বলল রানা। 'কোন্দিকে চলেছি বুঝতে পারছিলাম না, তাই ফিরে এলাম।'

'কাপড় ছাড়ো, মরিস,' বলল হ্যামার। 'এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যাব আমি তোমাকে।'

'তার দরকার পড়বে না, মিস্টার হ্যামার। আমি বুঝে গিয়েছি, আমাকে দিয়ে আর কাজ হবে না। শেষ হয়ে গেছি আমি! বিদায় করে দিন, চলে যাই।'

'ঠিক আছে, হোটেলে ফিরে এসব আলাপ করা যাবে। এক্ষুণি কাপড় বদলে নিয়ে আমার সাথে চলো।'

'কেন?'

'দেখতে পাচ্ছ না গুন্থারের লোকদের? এখানে থাকলে মারা পড়বে তুমি ওদের হাতে। আর তর্ক নয়, যা বলছি তাই করো। আমার গাড়িতে করে ফিরবে তুমি হোটেলে, তোমারটা থাক এখানেই, পরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে।'

রানা দেখল এই হৈ-চৈ-এর মধ্যে যদি ওদের চোখ বাঁচিয়ে সরে পড়া যায়

তাহলে মন্দ হয় না। হ্যামারের পিছু পিছু দ্রুতপায়ে এগোল সে পিটের দিকে। কাপড় ছাড়া হয়ে গেলে সবার অলক্ষে উঠে বসল সে অ্যাস্টন মার্টিনে, ড্রাইভিং সীটে বসল মাইকেল হ্যামার। রেসট্র্যাক ছেড়ে চলে গেল ওরা।

রানাকে নিয়ে সোজা গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল মাইকেল হ্যামার।

'বসো, মরিস। তোমার সাথে কয়েকটা কথা আছে।'

মুখোমুখি বসল ওরা দু'জন। একটা চুরুট ধরাবার ফাঁকে মনে মনে গুছিয়ে নিল হ্যামার প্রশ্নগুলো। রানা ধরাল সিগারেট, সেই ফাঁকে গুছিয়ে নিল উত্তরগুলো।

'রুডলফ গুন্থারকে চেনো?'

'চিনি। গতকাল সন্ধ্যায় ওর পরিচয় জানতে পেরেছি।'

'ও তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করবার চেষ্টা করছে?'

'না। একটা প্রস্তাব দিয়েছিল। বলেছিল, আজকের গ্র্যান্ডপ্রিক্সে জয়ী হলে বিশ হাজার ডলার দেয়া হবে আমাকে, আর হারলে খুন করে ফেলা হবে। আমি হারব বলেই মনস্থির করেছিলাম।'

'তার মানে?' রসগোল্লার মত চোখ দুটো কপালে উঠল হ্যামারের। 'তুমি হারবে বলে মনস্থির করেছিলে মানে? ইচ্ছে করে হেরেছ? কেন? তোমার ডাবল-ভিশনের কথা মিথ্যা?'

'সর্বৈব। আমার হাতের দিকে চেয়ে দেখুন। কাঁপছে?'

থ হয়ে চেয়ে রইল হ্যামার রানার হাতের দিকে। সিগারেট ধরা হাতটা যেন পাথর দিয়ে তৈরি, স্থির।

স্তম্ভিত মাইকেল হ্যামার চুপচাপ বসে রইল দুই মিনিট রানার দিকে চেয়ে। তারপর যখন কথা বলল তখন গলার স্বর সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে।

'কে তুমি, মরিস?' আমি বুঝতে পারছি ভয়ানক কিছু একটা ঘনিয়ে আসছে। মস্ত কোন গোলমাল বেধে গেছে ব্লু অ্যাঞ্জেলকে ঘিরে। কি ঘটতে যাচ্ছে বলবে আমাকে? কেন এসব ঘটছে? কাতর মিনতি ফুটে উঠল হ্যামারের কণ্ঠে।'

'সব কথা এক্ষুণি বলা যাবে না। তবে সংক্ষেপে আপনাকে একটা ধারণা দিতে পারব আমি। এবং এর বিনিময়ে আমি কিছু সাহায্য চাইব আপনার কাছে।' নড়েচড়ে বসল রানা। 'এক এক করে প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাক। আমি কে?—আমি একজন বাঙালী যুবক, মাস তিনেক আগে প্যারিসে যাচ্ছিলাম কাজে। পথে পরিচয় হলো জুলিয়ার সাথে। ওর অনুরোধে যোগ দিলাম ব্লু অ্যাঞ্জেল টীমে। কেন?—ওর ভাই পল কার্টারেটকে হত্যা করা হয়েছিল বলে ওর ধারণা। যদি তাই হয়ে থাকে, অপরাধীকে বের করতে হলে একজন ভেতরের লোককে কাজ করতে হবে স্পাই হিসেবে। কি জানতে পারলাম?—সেটা এখন বলা ঠিক হবে না, যথাসময়ে জানতে পাবেন। তারপর কি হলো?—আমার উদ্দেশ্য কিছুটা আঁচ করতে পারল শত্রুপক্ষ। আক্রমণ

শুরু হলো আমার উপর। কিভাবে?—প্রথম আক্রমণের ফল আলফ্রেড গার্বারের মৃত্যু। দ্বিতীয় আক্রমণের ফলে চুরমার হয়ে গেল একটা গাড়ি। সবাই জানল, মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছি আমি। তারপর?—নতুন গাড়িটাকে বিজয়ী করা একান্ত দরকার হয়ে পড়ল রুডলফ গুস্তারের। ছোট্ট একটা পরীক্ষা করেই বুঝে নিল ওরা যে আমি অভিনয় করছি, অস্ট্রিয়া গ্র্যান্ডপ্রিক্সে আমি ইচ্ছে করেই ফোর্থ গিয়ার ভেঙেছি বুঝতে পেরে ওরা সিদ্ধান্ত নিল আমাকে দিয়েই বিজয়ী করতে হবে নতুন গাড়িটাকে। কারণ আমি অন্য গাড়ি নিয়ে মাঠে থাকলে সেটার ফার্স্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা পঁচানব্বই ভাগ। কাজেই কি করল?—আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দেয়া হলো যে আমার অভিনয় টের পেয়ে গেছে ওরা, যদি ইটালীর গ্র্যান্ডপ্রিক্সে বিজয়ী না হই শেষ করে দেয়া হবে। আর কি করল?—আমাকে পাহারায় রাখা হলো। রিসেপশনের দিন আমি কয়েকটা ঘরে ঢুকে কিছু মূল্যবান নথিপত্রের ছবি তুললাম। টের পেয়ে গেল ওরা। সাবধান হয়ে গেল। আরও কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হলো। ওরা দেখল, আমি একটা ফিল্ম কার্ট্রিজ দিলাম মিস্টার মিচেলের হাতে...'

'মিচেল কেন? ও আবার এর মধ্যে আসছে কি হিসেবে?'

একের পর এক তাজ্জব কথা শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে মাইকেল হ্যামার, কিন্তু জেমস মিচেলের কথায় একেবারে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। হাসল রানা।

'আপনার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু জেমস মিচেলই পল এবং জুলিয়া কার্টারেটের বাবা ফিলিপ কার্টারেট। উনি সাংবাদিক নন—এক সময় ফ্রান্সের ড্যুক্সেম ব্যুরোর চীফ ছিলেন, এখন ইন্টারপোলের নারকোটিক্স ডিভিশনের চীফ।'

'সে কথা তুমি জানলে কি করে?' পাশের ঘর থেকে পর্দা সরিয়ে এঘরে ঢুকল জেমস মিচেল, ওরফে ফিলিপ কার্টারেট।

'তুমি!' হাঁ হয়ে গেল হ্যামারের মুখ। 'তুমি আমার স্যুইটে ঢুকে বসেছিলে কেন?'

'শুধু তোমার না, রানা আর জুলিয়ার ঘরও সার্চ করে এলাম এইমাত্র। আমি চাই না তোমরা টাইম বোমের শিকার হও।' রানার দিকে ফিরল। 'ইন্টারপোলের কথা তুমি জানলে কি করে রানা?'

'সেটা পরে বলব। আপাতত আমার গল্পটা শেষ করা যাক। মিস্টার কার্টারেট মার খেলেন ফিল্ম কার্ট্রিজটা পোস্ট করতে গিয়ে, ওঁর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হলো ওটা। এত দ্রুত ব্যাপারটা পরিণতির দিকে চলে আসবে ভাবতে পারিনি আমি। আমার প্ল্যান একটু অন্য রকম ছিল। যাই হোক, এখন আমার রেস ড্রাইভারের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নতুন একটা চাকরির দরকার হয়ে পড়েছে। আপনার কাছে আছে কোন চাকরি?'

'তার আগে একটা কথার জবাব দাও, মরিস। সত্যিই কোন ম্যালপ্র্যাকটিস চলছে এই গ্র্যান্ডপ্রিক্স রেসে? আমার মনেও সন্দেহ জেগেছে, আমি জানতে চাই সেটা সত্যি কিনা।'

'সত্যি। এবং এটাও সত্যি, সমস্ত চক্রান্তের গোড়াটা রয়েছে আপনার টীমে। এতটা হয়তো গড়াতে পারত না, যদি মিসেস এলিনা হ্যামার নিখোঁজ হওয়ার সাথে সাথেই আপনি পুলিসের সাহায্য নিতেন।'

'আচ্ছা। সে খবরও জানা আছে তোমার?'

'হ্যাঁ। ব্ল্যাকমেইলিং-এর খবরটাও জানা আছে। আপনার মত একজন নীতিপরায়ণ, স্ট্রেট ফরোয়ার্ড লোক কি করে নতি স্বীকার করলেন ওদের কাছে ভাবতে অবাক লাগে। খুব সম্ভব আপনার কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয় আপনার স্ত্রী। সেটা দোষের কিছুই নয়। কিন্তু আপনার স্ত্রী কোথায় আছেন, কি অবস্থায় কেমন আছেন, আদৌ বেঁচে আছেন কিনা কিছুই না জেনে সপ্তাহে সপ্তাহে টাকা দিয়ে যাওয়াটা অদ্ভুত ঠেকছে আমার কাছে। এতটা দুর্বল হলে মানুষ সুযোগ নেবেই, তাদের দোষ দেয়া যায় না। এখন আপনি জড়িয়ে গেছেন নিজের জালে নিজেই। না পারছেন হেরোইনের কথা বলতে, না পারছেন ব্ল্যাকমেইলিঙের কথা বলতে, না পারছেন স্ত্রীর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কথা পুলিসকে জানাতে।'

কঠোর চেহারার বিরাট লোকটার মাথা নুয়ে পড়ল সামনের দিকে। টপ টপ কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল কোলের উপর। দুই মিনিট নীরবতার পর মাথা তুলল সে। সোজা চাইল রানার চোখে।

'ঠিকই বলেছ তুমি, মরিস। অন্যায় করেছি আমি। অন্যায়কে জেনেশুনে প্রশ্রয় দেয়াও আইনের চোখে অন্যায়। সবই জানো তুমি। অন্যায় ঢেকে রাখা যায় না। ঠিক আছে, পুলিসের কাছেই যাব আমি।'

খুক-খুক করে কাশল কার্টারেট। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'সেটা কি ঠিক হবে? এলিনাকে মেরে ফেলবে তাহলে ওরা।'

'যদি মেরে ফেলে আমারও বেঁচে থাকার প্রয়োজন ফুরোবে। ওকে মেরে ফেললে আমি...'

'আত্মহত্যা করবে, এই তো?' মাথাটা নাড়ল কার্টারেট এপাশ ওপাশ। কাঁধের উপর হাত রাখল। 'সেটা ঠিক হবে না, মাইক। তার চেয়ে দু'জনেই একসাথে কি করে বাঁচা যায় সেকথা ভাব। এখন পুলিসের কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। আমাদের চেষ্টা যদি বিফল হয়, তখন যেয়ো।'

'তোমাদের চেষ্টা? তোমরা আমার জন্যে চেষ্টা করতে যাবে কেন?'

'আমি করব বন্ধুত্বের খাতিরে। তোমাকে যখন বন্ধু বলে স্বীকার করে নিয়েছি, আজীবন থাকব আমি তোমার পাশে, বন্ধু হিসেবে। আর এই সিংহ-হৃদয় যুবক কেন করবে তা ও-ই জানে। ওর মতি-গতি বোঝার চেষ্টা আমি ছেড়ে দিয়েছি! তবে ওর সাহায্য যে পাবে তুমি তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

'আপাতত আমিই সাহায্যপ্রার্থী,' কাজের কথায় এল রানা। 'আছে কোন চাকরি?'

'একটা চাকরি আছে, কিন্তু সেটা তোমার উপযুক্ত নয়। ট্র্যান্সপোর্টারের

ড্রাইভারটা আজ সকালে কাউকে কিছু না বলে পালিয়েছে। নাহ, অসম্ভব!' মাথা নাড়ল হ্যামার। 'সবাই হাসাহাসি করবে পৃথিবীর সেরা ড্রাইভারকে লরীর ড্রাইভার হতে দেখলে।'

'হাসুক,' বলল রানা। 'কারও হাসাহাসিতে কিছুই এসে যায় না। ওই চাকরিটা হলেই চলবে আমার। সবাইকে জানিয়ে দিন আমার ডাবলভিশনের কথা। বলুন অ্যাডভাইজার হিসেবে রেখে দেয়া হচ্ছে আমাকে। ঠিক আছে? কবে যোগ দিচ্ছি আমি আমার নতুন চাকরিতে?'

'আজই। সন্ধ্যায়। আজই ট্র্যান্সপোর্টারটা মার্সেই পাঠাবার কথা। ভাবছিলাম কি করে পাঠাই। ব্রনসন রওনা হয়ে যাবে খানিক পরেই। মেকানিক ছোকরা দু'জনের একজনও গাড়ি চালাতে পারে না।'

'বাহ্, চমৎকার সমাধান হয়ে গেল তোমার সমস্যাটা,' বলল কার্টারেট।

'কিন্তু খাটনিটা পড়বে খুব,' বলল হ্যামার। 'ব্রনসন যাচ্ছে কাল সকালের লোডিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে। কাল দুপুরের মধ্যে ভিগনোলেস টেস্ট ট্র্যাকে পৌঁছে দিতে হবে আমাদের চার নম্বর গাড়িটা। নতুন এক্স-গাড়ি। সেই সাথে স্পেয়ার এঞ্জিনটাও। মাত্র দু'দিনের জন্যে ট্র্যাকটা পাচ্ছি আমরা।'

'ঠিক আছে, সব হবে সময় মত। আজ সন্ধ্যায় রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি আমি মার্সেই-এর পথে। কিন্তু আমার ল্যান্সিয়ার কি হবে?'

'ওটার চাবি দিয়ে যেয়ো জুলিয়াকে। ও নিয়ে যাবে ওটা ভিগনোলেসে।'

'ভাল কথা বলছেন।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমি যাই প্রস্তুত হয়ে নিই গিয়ে। আর একটা কথা—আমাদের প্রত্যেকের এখন সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে নিরাপদ থাকা। যে-কোন মুহূর্তে আক্রমণ আসতে পারে আমাদের যে-কোন জনের উপর। জুলিয়াকেও জানিয়ে দেবেন কথাটা।'

'এতটা বিপদের ঝুঁকি নেয়া কি ঠিক হচ্ছে, রানা?' বিদায়ের মুহূর্তে কেমন একটা দ্বিধা এসে হাজির হলো ফিলিপ কার্টারেটের মনে। 'নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। নিজের স্বার্থোদ্ধারের জন্যে তোমাকে এতবড় বিপদের মুখে পাঠাতে...'

'এখন আর এটা আপনার স্বার্থ নয়, মিস্টার কার্টারেট,' হাসল রানা। 'আমিও জড়িয়ে পড়েছি এর মধ্যে। যা করতে যাচ্ছি সেটা না করে আমার আর উপায় নেই। অনেক জেনে ফেলেছি আমি, এখন সরে দাঁড়াতে চাইলেও রক্ষা পাব না। এখন শুধু দুটো পথ খোলা রয়েছে আমার সামনে: হয় ওদের ছিন্নভিন্ন করে দেয়া, নয়তো নিজেই শেষ হয়ে যাওয়া। প্রথম পথটাই আমার পছন্দ।'

'সুন্দর যুক্তি দেখাচ্ছ তুমি, ইয়ংম্যান। ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছ, কাদের অনুরোধে তুমি এসবের মধ্যে জড়িয়েছ নিজেকে? যাকগে, ঠিকই বলেছ। এখন আর ফেরার পথ নেই। আমার আর কিছু করতে হবে?'

'হ্যাঁ। বারে বসে একটা স্কচ খেতে হবে আপনার এখন। লক্ষ্য রাখতে হবে রিসেপশনিস্টের কাছ থেকে ফিল্ম কার্ট্রিজটা ফেরত নেয়ার সময় কেউ

আমাকে দেখছে কিনা।'

'কেন দেখতে যাবে? ফিল্ম তো পেয়েই গেছে ওরা।'

'হয়তো দিয়ে শুরু করতে চাই না আমি, নিশ্চিত হতে চাই। ওদের যে ধোঁকা দেয়া হয়েছে সেটা ওরা বুঝে ফেলেছে কিনা কে জানে! তাছাড়া হোটেল সেফ থেকে একটা খাম বের করে আমাকে দিতে দেখলেই কৌতূহলী হয়ে উঠবে ওরা, সহজেই বুঝে নেবে একবার নয়, দুইবার বোকা বনেছে ওরা।'

নিচে নেমে গেল ফিলিপ কার্টারেট। গাঢ় ছাই-রঙা পুলওভার এবং তার উপর কালো লেদার জ্যাকেট পরে নিয়ে প্রস্তুত হলো রানা। জুলিয়ার ঘরে টোকা দিয়ে কোন সাড়া শব্দ পেল না। সহজ ভঙ্গিতে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। রিসেপশনিস্টের কাছে চাইল খামটা। ওখানেই দাঁড়িয়ে খাম খুলল রানা, ফিল্ম কার্ট্রিজটা বের করে পরীক্ষা করল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, তারপর ঢুকিয়ে দিল জ্যাকেটের একটা ভিতরের পকেটে। বাইরেটা অন্ধকার হয়ে গেছে। ধীর পায়ে এগোল রানা দরজার দিকে। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে রানার পাশে চলে এল কার্টারেট। চাপা গলায় বলল, 'কাপলান। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল ওর। প্রায় দৌড়ে গিয়ে ঢুকেছে ওই ফোন বুদে।'

কোন কথা বলল না রানা, সামান্য একটু মাথা ঝাঁকিয়ে পা বাড়াল সামনে।

সুইংডোর ঠেলে বাইরে বেরিয়েই থেমে গেল রানা। ওভারকোট গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে জুলিয়া। শীতে কাঁপছে ঠক ঠক করে।

'তুমি এখানে কি করছ, জুলিয়া? কি ব্যাপার! শীতে তো একেবারে জমে গেছ। কি করছ?'

'বিদায় জানাবার জন্যে,' বলল জুলিয়া। 'তাছাড়া চারপাশে নজরও রাখছিলাম।' রানার পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল সে। সন্ধের আগেই বিশাল ট্র্যান্সপোর্টারটা করোন্যাডো হোটেলের সামনে এনে রাখা হয়েছে। সেইদিকে এগোল দু'জন। কাছাকাছি এসে রানার হাত ধরল জুলিয়া।

'না গেলেই নয়?'

থেমে দাঁড়িয়ে জুলিয়ার দিকে ফিরল রানা। 'তার মানে?'

'বাবার কাছে সব শুনেছি আমি, রানা। এই বিপদের মধ্যে না গেলেই কি নয়? আমার অনুরোধ যদি ফিরিয়ে নিই? তোমাকে আমিই এনেছি এর মধ্যে, আমি এখন বারণ করলে শুনবে না?'

'তুমি অনর্থক বেশি-বেশি ভয় পাচ্ছ, জুলিয়া।' হাসল রানা। কাছে টেনে নিল ওকে। 'তোমার ভাইয়ের হত্যাকারীদের শাস্তি চাও না তুমি?'

'চাই। কিন্তু আরেকটা ভাইকে হারাতে চাই না। আমি বুঝতে পারছি, ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়তে চলেছ তুমি। থাক না, রানা। তোমার একটা কিছু ঘটে গেলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারব না আমি

কোনকিছু দিয়েই। নিজেকে দোষী করব। আমিই দায়ী…'

'একটা কথা তোমার জানা নেই, জুলিয়া, তাই অতটা ভয় পাচ্ছ। তুমি হয়তো মনে করছ অনভিজ্ঞ এক বিদেশী ভাই তোমার জন্যে অনর্থক প্রাণ দিতে যাচ্ছে বেঘোরে। আসলে আমি অনভিজ্ঞও নই, অনর্থক কোন ঝুঁকিও নিচ্ছি না। যে কাজে যাচ্ছি, সে কাজের জন্যে অনেক টাকা ব্যয় করে, অনেক যত্নে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে আমাকে অনেক বছর। আমি ব্যবসায়ী নই। মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলাম তোমাদের কাছে—আমি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন সুপার এজেন্ট।'

চোখে চোখে চেয়ে রইল ওরা কয়েক সেকেন্ড।

আরও কাছে টেনে নিল ওকে রানা। দুটো চাপড় দিল ওর পিঠে।

'কথাটা কাউকে বোলো না।'

কয়েক পা এগিয়ে উঠে পড়ল রানা ট্র্যান্সপোর্টারের ড্রাইভিং সীটে।

আট

রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে বিশাল ব্লু অ্যাঞ্জেল ট্র্যান্সপোর্টার। গোঁ-গোঁ একটানা ডাক ছাড়ছে শক্তিশালী এঞ্জিন। চারটে হেড লাইটের তীব্র আলোয় দিনের মত আলোকিত সামনের পঞ্চাশ গজ। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে মেকানিক হ্যারি আর জ্যাকিউস রাস্তার দিকে। এত স্পীডে ট্র্যান্সপোর্টারকে চলতে দেখেনি ওরা জীবনে। প্রাণ হাতে নিয়ে বসে আছে দু'জন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, মরিস রেনারকে কিছু বলবার সাহস তাদের নেই। যদিও পদস্খলন হয়েছে লোকটার, সম্মানিত রেস ড্রাইভার থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে ট্র্যান্সপোর্টারের ড্রাইভারের চাকরিতে, তবু। যাকে এতদিন নায়কের সম্মান দিয়েছে, গুণমুগ্ধ ভক্তের দৃষ্টিতে দেখেছে, তাকে চট করে নিজেদের পর্যায়ে টেনে আনা যায় না।

অটোস্ট্রাডা ধরে তুফান বেগে ছুটেছে লরিটা টিউরিনের দিকে, সেখান থেকে চলল দক্ষিণে কুনিয়োর দিকে। কোল ডে টেন্ডের গিরিপথের কাছে এসে রীতিমত হৃৎকম্প শুরু হয়ে গেল হ্যারি আর জ্যাকিউসের। ইটালী ও ফ্রান্সের সীমান্তের এই গিরিপথটা দিনের বেলায় সাধারণ গাড়ি নিয়ে পার হওয়াও বিপজ্জনক। কেবল অস্বাভাবিক খাড়াই উৎরাই নয়, অসংখ্য বিপজ্জনক বাঁক রয়েছে পথে। একটু এদিক থেকে ওদিক হলেই পড়বে গিয়ে অতল খাদে। এই রাস্তায় ফুলস্পীডে গাড়ি চালানো আত্মহত্যার সামিল, কিন্তু তাই চলেছে ওরা। একেকটা বাঁক নেয়ার সময় ওদের দু'জনের মনে হচ্ছে লাফ দিয়ে বেরিয়ে যাবে হৃৎপিণ্ডটা পিঞ্জর ছেড়ে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ওরা, মার্সেই পৌঁছেই ইস্তফা দেবে চাকরিতে।

ওদের মানসিক অবস্থাটা টের পাচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না রানার মুখ

দেখে। এক মনে গাড়ি চালাচ্ছে সে। চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে সামনের দিকে। ক্রমে উঠে যাচ্ছে ওরা পাহাড়ের মাথায়, রানার মাথায় ক্রমেই বাড়ছে চিন্তার ঝড়।

কম্পলানের মাধ্যমে জেনে গেছে শত্রুপক্ষ যে, রানার কাছে রয়েছে একটা ফিল্ম কার্ট্রিজ। ওদের বিরুদ্ধে অকাট্য কোন প্রমাণ। ওদের পক্ষে এটা সুখবর নয়। যেমন করে হোক চেষ্টা করবে ওরা ফিল্মটা কেড়ে নেয়ার। এ ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু অ্যামবুশের জন্যে ঠিক কোন্ জায়গাটা বেছে নেবে ওরা? বাঁকগুলোই অ্যামবুশের জন্যে সবচেয়ে ভাল জায়গা। যে কোন একটা বাঁক ঘুরেই সম্মুখীন হতে পারে আক্রমণের। কিন্তু এতক্ষণেও কোন সাড়াশব্দ নেই কেন ওদের?

শত্রুপক্ষ যে-ই হোক, তাদের ঘাঁটি যে মার্সেই তাতে রানার কোন সন্দেহ নেই। মন্নযা থেকে কেউ অনুসরণ করেনি ওকে, সে ব্যাপারেও নিশ্চিত ও। তাহলে কি ইটালীর মাটিতে গোলমাল করতে চায় না ওরা? ট্র্যান্সপোর্টার যে মার্সেই যাচ্ছে সেটা জানা আছে ওদের ভাল করেই, কিন্তু কোন পথে চলছে রানা সেটা না জানারই কথা—রানা নিজেও জানত না রওয়ানা হওয়ার সময়। কোন রুটে আসছে ট্র্যান্সপোর্টার জানা নেই যখন, ওরা হয়তো অপেক্ষা করবে মার্সেইর কাছাকাছি না পৌঁছানো পর্যন্ত। এমন হতে পারে পৌঁছবার পরে আসবে আক্রমণ। কিন্তু সেক্ষেত্রে ওদের জন্যে একটা ভয় থেকে যাচ্ছে—মার্সেই পৌঁছবার আগেই পথে কোথাও ফিল্মটা রানা পাচার করে দিতে পারে; এই সম্ভাবনাটাও নিশ্চয়ই ভেবে দেখবে ওরা? চিন্তাগুলোর কোনটাকেই সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারছে না রানা। কাজেই ধুত্তোর বলে সব চিন্তা দূর করে দিল সে মাথা থেকে। যখন যা ঘটে তখন দেখা যাবে। যে কোন বিপদের জন্যে মানসিক প্রস্তুতি রেখে ড্রাইভিঙে মন দিল সে।

কোল-এর চূড়োয় পৌঁছল ট্র্যান্সপোর্টার। ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ কাস্টমস পেরিয়ে নামতে শুরু করল আঁকাবাঁকা ঢালু পথ ধরে। লা গিয়ানডোলায় পৌঁছে একটু ইতস্তত করল রানা। কোন্দিক দিয়ে যাবে? ভেন্টিমিগলিয়া হয়ে গেলে পশ্চিমের নতুন অটোরুটটা ব্যবহার করা যায়, কিন্তু ঘোরা হয় অনেক। কিন্তু নিসে যাওয়ার সোজা পথ ধরলে শত্রুপক্ষ অনেকগুলো সুযোগ পাবে অ্যামবুশের। কোন্টা করবে? ঘুরপথে গেলে দুই দুইবার কাস্টমসের বেড়া পার হতে হবে ভাবতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে সোজা রাস্তাতেই যাবে।

নিস পর্যন্ত বিনা বাধায় চলে এল ওরা, ক্যানেস ছাড়িয়ে অটোরুট ধরে পৌঁছল টউলনে, তারপর চলল মার্সেইর দিকে এন-এইট রাস্তা ধরে। টউলন ছাড়িয়ে মাইল দশেক গিয়েই বাধার সম্মুখীন হলো ওরা।

একটা বাঁক নিয়েই দেখতে পেল রানা সিকি মাইল দূরে রাস্তার উপর চারটে আলো। দুটো আলো স্থির হয়ে আছে, দুটো নড়ছে। যে দুটো নড়ছে সে দুটো লাল। পুলিসের পরিচিত থামবার সিগন্যাল দিচ্ছে লাল বাতি দুটো, গোল হয়ে ঘুরছে, বৃত্তের সিকি ভাগ, ফিরে যাচ্ছে, আবার।

থার্ড গিয়ারে দিল রানা। ছোট্ট একটা গর্জন ছাড়ল এঞ্জিন। বসে বসে ঝিমোচ্ছিল মেকানিক দু'জন, খাড়া হয়ে চোখ মেলল। জনা পাঁচেক লোক দেখতে পেল ওরা। দু'জন দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার মাঝখানে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে রানা সামনের দিকে। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ছিল, হঠাৎ সোজা হলো। থেমে আসছিল ট্র্যান্সপোর্টার, গিয়ার নামিয়ে সেকেন্ডে দিল রানা। সামনের লাল বাতি দুটো ঘোরা বন্ধ হয়ে গেছে। ওরা বুঝতে পেরেছে সিগন্যাল পেয়ে থামছে ট্র্যান্সপোর্টার।

ঠিক পঞ্চাশ গজ থাকতে হঠাৎ চেপে ধরল রানা অ্যাক্সিলেরেটারটা ফ্লোরবোর্ডের সাথে। সেকেন্ড গিয়ারে পুরো গ্যাস পেয়ে হুঙ্কার ছেড়ে এগোল বিশাল ট্রাক, দ্রুত বাড়ছে স্পীড। হঠাৎ সগর্জনে ট্রাকটাকে এগিয়ে আসতে দেখে দু'পাশে লাফ দিল রাস্তার উপর দাঁড়ানো লোক দু'জন বাতি ফেলে দিয়ে।

চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল হ্যারি আর জ্যাকিউসের। হাঁ হয়ে গেছে মুখ। নির্বিকার চিত্তে থার্ড গিয়ার দিল রানা। পিছন থেকে ট্র্যান্সপোর্টারের দরজায় মনে হলো ঢিল পড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে থেমে গেল শব্দগুলো। আরও একশো গজ এগিয়ে বাঁয়ে মোড় নিল ট্রাক। টপ গিয়ার দিয়ে সিগারেট ধরাল রানা।

'মাথা খারাপ আপনার, মিস্টার রেনার!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জ্যাকিউস। 'জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বেন আপনি আমাদের। পুলিস! পুলিসের রোড ব্লক ছিল ওটা!'

'মাথাটা তোমার খারাপ,' বলল রানা মৃদু হেসে। 'পুলিস ব্লক যদি হবে, পুলিসের গাড়ি কোথায়? কিংবা মোটর সাইকেল? পুলিসের ইউনিফরম দেখতে পেয়েছ একটাও? চোখজোড়া কি বাড়িতে রেখে এসেছ?'

'কিন্তু পুলিসের সিগন্যাল দেখাচ্ছিল...থামতে বলছিল...'

'হয়েছে, হয়েছে! আর মাথা গরম কোরো না।' বলল রানা। 'ফ্রেঞ্চ পুলিসকে কোনদিন মুখোশ পরতে দেখেছ? পিস্তলে সাইলেন্সার লাগাতে দেখেছ? নিশ্চিন্ত থাকো, এরা পুলিস নয়, ফুলিস।'

'সাইলেন্সার?' চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল হ্যারির।

'তাছাড়া আর কি? গুলির আওয়াজ নেই, অথচ ধুপধাপ কি এসে লাগল ট্র্যান্সপোর্টারের পিছন দিকে? ঢিল?'

'কিন্তু কেন...'

'হাইজ্যাকার,' মেকানিকদের কৌতূহল ঠাণ্ডা করে দিল রানা। 'ডাকাতি করতে চেয়েছিল।'

'কিন্তু জানল কি করে যে আমরা আসছি?'

'জানত না,' বলল রানা। 'ওদের ওয়াচার থাকে মাইল খানেক সামনে পিছনে। আমাদের দেখে আধ মিনিটের মধ্যেই খবর দিয়েছিল মাল বোঝাই ট্রাক আসছে একটা। বাতি ফিট করতে এক মিনিটের বেশি লাগবার কথা নয়। খবর পেয়েই তৈরি হয়ে গেছে ওরা শিকার ধরবার জন্যে।'

যুক্তিটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো ওদের কাছে। আবার সীটে হেলান দিয়ে বিশ্রামের আয়োজন করল। সজাগ সতর্ক রইল রানা। মিনিট দশেকের মধ্যেই রিয়ার ভিউ মিররে দেখতে পেল সে দুটো হেডলাইট দ্রুত এগিয়ে আসছে। খুব কাছে চলে এল পিছনের গাড়িটা। সাইড দেবে কি দেবে না ভাবল রানা। দেয়াই স্থির করল। কারণ গাড়িটা শত্রুপক্ষের না হলে সাইড না দেয়ার জন্যে গোলমালে পড়তে পারে। আর শত্রুপক্ষের হয়ে থাকলে এভাবে আটকানো যাবে না। তেমন অসুবিধে বোধ করলে ট্র্যান্সপোর্টারের চাকা ফুটো করে দিয়ে থামতে বাধ্য করবে। সাইড দিলে যদি মানে মানে কেটে পড়ে সেটাই ভাল।

কোন রকম শত্রুতার আভাস পাওয়া গেল না গাড়ির আরোহীদের মধ্যে। কিন্তু ওভারটেক করবার সময় সব কটা বাতি নিভে গেল। গাড়িটার সামনে বা পিছনে কোন বাতি জ্বলল না ট্রাক ছাড়িয়ে শতখানেক গজ এগিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। যখন জ্বলল তখন আর নাম্বার প্লেট পড়বার উপায় নেই, অনেক দূরে চলে গেছে। তীর বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা।

কিন্তু মোড় ঘুরেই হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। পিছন থেকে আরও জোরে এগিয়ে আসছে আর একটা গাড়ি। সাঁ করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। মাথার উপর নীল ফ্ল্যাশিং লাইট জ্বলছে, সাইরেনটা ডাক ছাড়ছে প্রাণ খুলে। পুলিসের গাড়ি।

মাইল খানেক গিয়ে ট্র্যান্সপোর্টারের স্পীড কমাল রানা। সামনে দেখা যাচ্ছে নীল ফ্ল্যাশিং লাইট। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুটো গাড়ি। একজন ইউনিফরম পরা পুলিস সামনের গাড়িটার খোলা জানালা দিয়ে কথা বলছে ড্রাইভারের সাথে, হাতে প্যাড আর পেন্সিল। স্পীড লিমিট ব্রেক করায় ধরা হয়েছে ওটাকে। ধীরে সুস্থে পাশ কাটিয়ে চলে গেল রানা। এবার আর নাম্বার প্লেট পড়ে নিতে অসুবিধে হলো না রানার। কালোর উপর সাদা কালিতে লেখা—MF213K.

মার্সেইর উত্তর পশ্চিম অংশটা এক কালে হয়তো আবাসিক এলাকা ছিল, এখন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে চেহারা। ঢাকার চক বাজার, ইসলামপুরের মত অবস্থা না হলেও রিউ গেরার্ড এখন বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। রাস্তাটা প্রশস্ত, কিন্তু রাস্তার দু'ধারে হোলসেল দোকান, অসংখ্য ছোটখাট মিল, ফ্যাক্টরি আর গ্যারেজ। এই রাস্তারই মাঝামাঝি জায়গায় হাতের বাম ধারে সরকারী খাদ্য গুদামের মত দেখতে বিশাল এক দালান—দেয়ালগুলো সিমেন্টে গাঁথা, ছাতে কোরাগেটেড টিন। প্রকাণ্ড গেটের উপরে নীল নিয়ন সাইন—ব্লু অ্যাঞ্জেল।

ট্র্যান্সপোর্টারটা কাছাকাছি আসতেই খুলে গেল কোলাপসিবল গেট, বাতি জ্বলে উঠল গ্যারেজের ভিতরে। পঞ্চাশ ফুট চওড়া আশি ফুট লম্বা গ্যারেজটা টিপটপ, ঝকঝকে। ডান দিকে দেয়ালের পাশে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে

তিনটে ব্লু অ্যাঞ্জেল ফর্মুলা ওয়ান গাড়ি। তার পাশে সাজানো আছে তিনটে পেডেস্টাল মাউন্টের উপর তিনটে ফোর্ড-কসওয়ার্থ ভি-এইট এঞ্জিন। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো রঙের সিট্রন ডি এস টোয়েন্টিওয়ান। গ্যারেজের বাম দিকটায় গোটা কয়েক সুসজ্জিত ওঅর্কবেঞ্চ আর টুল-বক্স। পিছনের দিকটায় থরে থরে সাজানো রয়েছে নানান আকৃতির স্পেয়ার পার্টস ঠাসা ডজন দশেক কাঠের বাক্স আর গোটা বিশেক টায়ার। মাথার উপরে ট্র্যান্সপোর্টার লোডিং-এর জন্যে এবং এঞ্জিন নাড়াচাড়ার সুবিধের জন্যে গোটা কয়েক বীম রয়েছে লম্বালম্বি আর আড়াআড়ি ভাবে।

মাঝের বীমের নিচে থামাল রানা ট্র্যান্সপোর্টার। ইগনিশন সুইচ অফ করে দিয়ে কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল ঘুমন্ত মেকানিকদের। ওরা নড়ে উঠতেই নেমে এল নিচে। দাঁড়িয়ে আছে হুগো ব্রনসন। রানাকে দেখে বিরক্তি বা খুশি কিছুই প্রকাশ পেল না ওর চেহারায়। মনের ভাব গোপন রাখতে অভ্যস্ত লোকটা। সব সময় গম্ভীর। ঘড়ি দেখল ব্রনসন। বলল, 'দুটো। হেনরী হলে পৌঁছত চারটের সময়। খুব জোরে চালিয়ে এসেছেন।'

'রাস্তা ফাঁকা ছিল। এবার কি, ব্রনসন?'

'ব্রনসন নয়,' ভুরু জোড়া সামান্য কুঁচকে গেল ব্রনসনের। 'মিস্টার ব্রনসন। মিস্টার ব্রনসনের অধীনে চাকরি করছেন এখন আপনি। যান শুয়ে পড়ুন গিয়ে।'

'কোথায়?'

'ওহ্-হো, আমাদের ভিলা চেনেন না? ঠিক আছে, ওদের একজন পৌঁছে দেবে। কাছেই একটা ভিলা আছে আমাদের। অপূর্ব কিছুই না, কিন্তু কাজ চলে যাবে। ওখানেই বিশ্রাম নেয়ার নিয়ম কাজের ফাঁকে। ভোর ছ'টায় কাজ শুরু করব আমরা। প্রথমে আনলোড করতে হবে, তারপর লোডিং।'

'জেথ্ আর হসারকে দেখছি না?'

'ছুটিতে গেছে। যখনই কাজের চাপ বেশি পড়ে তখনি ছুটির দরকার হয়ে পড়ে ওদের। দু'জন নতুন লোক অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে। ভোর ছ'টায় পৌঁছে যাবে তারা।' হঠাৎ ট্র্যান্সপোর্টারের পিছন দিকটা দেখে চোখ দুটো ছোট হয়ে গেল ব্রনসনের। 'ওখানে ফুটোগুলো কিসের?'

'বুলেটের। টউলনের কাছাকাছি ট্রাকটা হাইজ্যাকের চেষ্টা করেছিল কারা যেন। আমি থামাইনি গাড়ি।'

'হাইজ্যাক! গোটা দুই ব্লু অ্যাঞ্জেল রেসিং কার হাইজ্যাক করে কি লাভ?'

'সেটা জিজ্ঞেস করিনি ওদের। আসলে থামাইনি। আমার ধারণা, ভুল খবর পেয়েছিল ওরা। এই ধরনের ট্র্যান্সপোর্টারে করেই সিগারেট বা হুইস্কির কারগো যায়। হয়তো আশা করেছিল দশ বিশ লাখ ফ্র্যাঙ্ক রোজগার হয়ে যাবে আজ। যাই হোক, তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। আধঘণ্টার কাজ, তারপর খানিক স্প্রে গানের ফুশ মারলেই আবার নতুন হয়ে যাবে।'

'পুলিসে রিপোর্ট করতে হবে আমার কাল সকালে। যদিও কাজ কিছুই হবে না, কিন্তু ফ্রেঞ্চ আইন অনুযায়ী রিপোর্ট না করাটা অপরাধ বলে গণ্য হবে।'

ওরা চারজন এগোল গ্যারেজের দরজার দিকে। বেরিয়ে যাবার সময় সহজ ভঙ্গিতে চাইল রানা কালো সিট্রনটার দিকে। নাম্বার প্লেটের উপর লেখা—MF213K.

ঠিকই বলেছিল ব্রনসন—ভিলাটা বাঁ তার ব্যবস্থাপনা আহামরি কিছু নয়। মোটামুটি কাজ [illegible]ার মতই অবস্থা। ছোট্ট ঘর। আসবাবের বালাই নেই বললেই চলে। সরু একটা সিঙ্গেল-বেড খাট, আর একটা কাঠের চেয়ার। চেয়ারটা শুধু বসবারই নয়, বেড সাইড টেবিলের কাজও দিয়ে থাকে। রাস্তার দিকের জানালায় পর্দার বালাই নেই, ফিনফিনে সরু জাল লাগানো রয়েছে পাল্লা দুটোয়। রাস্তা থেকে ম্লান আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে, ঘরের বাতি নেভানো। জানালার ধারে চুপচাপ বসে রয়েছে রানা, সামান্য ফাঁক করে বাইরে চোখ রেখে। জনপ্রাণীর কোন চিহ্ন নেই, একেবারে ফাঁকা রাস্তা।

আড়াইটা বাজছে রানার ঘড়িতে। অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠল রানা। এখনও সাড়াশব্দ নেই কেন ওদের? রাস্তায় বিফল হয়ে কি দমে গেল? অসম্ভব। আসবেই ওরা, জানে রানা। আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষার পর হঠাৎ কান খাড়া হয়ে গেল ওর। আবছা একটা পায়ের শব্দ পাওয়া গেল না? নাকি কল্পনা করছে সে? পাঁচ সেকেন্ড কান খাড়া রেখেই নিশ্চিত হলো রানা—আসছে। আবছা অন্ধকারে বিছানায় ফিরে এল সে, শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে। ডান হাতটা ঢুকে গেছে বালিশের নিচে, আঁকড়ে ধরেছে দেড়ফুট লম্বা বালি-ঠাসা চামড়ার মোটাসোটা হান্টারের হাতল।

ধীরে ধীরে ফাঁক হয়ে গেল দরজাটা। আধ-বোজা চোখে চেয়ে রয়েছে রানা, শ্বাস টানছে ঘুমন্ত মানুষের মত, গভীর। একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে। চেনা গেল না। যেমন ছিল তেমনি শুয়ে রইল রানা, যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন! কয়েক সেকেন্ড ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে এক পা পিছিয়ে গেল ছায়ামূর্তি। আস্তে ভিড়িয়ে দিল দরজা। পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে। উঠে বসল রানা, গাল ঘষল হাতের তালু দিয়ে, তারপর বিছানা ছেড়ে আবার গিয়ে বসল জানালার ধারে।

ভিলার সদর দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল একজন লোক। লাইটপোস্টের ম্লান আলোয় পরিষ্কার চিনতে পারল রানা লোকটাকে। ব্রনসন। রাস্তা পেরোল ব্রনসন। ঠিক তখুনি বাঁক নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল একটা ছোট্ট কালো গাড়ি। হেডলাইট নেভানো—সাইড লাইট জ্বলছে কেবল। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ার নিউট্রাল করে এঞ্জিন বন্ধ করে দিল ড্রাইভার গাড়ির। রাস্তার উপর দিয়ে টায়ারের মৃদু চড়চড় শব্দ তুলে এগিয়ে এল কালো পিচঢালা একটা রেনোয়া গাড়ি, থামল ব্রনসনের পাশে। নিচু হয়ে ঝুঁকে

কি যেন বলল ব্রনসন ড্রাইভারকে, গাড়ি থেকে নেমে এল বিশাল চেহারার এক লোক। ওভারকোট খুলে ভাঁজ করে পিছনের সীটে রেখে দিল লোকটা, পকেট থাবড়ে দেখল কিছু ফেলে যাচ্ছে কিনা। ব্রনসনের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল, তারপর আত্মবিশ্বাসী, নিশ্চিত পদক্ষেপে এগোল ভিলার দরজার দিকে। ব্রনসন হেঁটে চলে গেল গ্যারেজের দিকে।

বিছানায় ফিরে এল রানা, জানালার দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ল, চোখ দুটো আধ-খোলা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বাইরে থেকে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল লম্বা-চওড়া লোকটা। পিছন থেকে আলো আসছে বলে চেহারাটা চেনা গেল না। তারের জাল ভেদ করে ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করছে। খড়-খড় শব্দে নাক ডাকাল রানা। শব্দটা শুনে মনে হলো খুশি হয়েছে, ডান হাতটা উপরে তুলে একটা ধাতব বস্তু পরীক্ষা করল লোকটা। এই বস্তুটি চিনতে অসুবিধে হলো না রানার। বড়সড় একটা বিকটদর্শন পিস্তল। নলের দৈর্ঘ্য দেখে বোঝা গেল সাইলেন্সার ফিট করা আছে ওতে। ক্লিক করে সেফটি ক্যাচ অফ করবার শব্দ পাওয়া গেল। আর একবার ঘরের ভিতরটা পরীক্ষা করেই অদৃশ্য হয়ে গেল ছায়ামূর্তি জানালার সামনে থেকে।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রানা বিছানা ছেড়ে। সাইলেন্সারযুক্ত পিস্তলের তুলনায় বালি ভরা হান্টার অস্ত্র হিসেবে কিছুই না। কাজেই দরজার পাশে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেল সে, দরজার কব্জাগুলো যেদিকে তার থেকে ঠিক দুই ফুট দূরে।

বিশ সেকেন্ড কাটল নিস্তব্ধতার মধ্যে। পেটের মধ্যে কেমন যেন সুড়সুড়ি জাতীয় অনুভূতি বোধ করল রানা। অসহ্য লেগে উঠল শেষ কয়েক সেকেন্ডের প্রতীক্ষা। হালকা পায়ের শব্দ শুনতে পেল রানা এবার। দরজার হ্যানডেলটা নিচু হয়ে গেল খুব ধীরে ধীরে। তেমনি ধীরে ধীরে ফিরে যাচ্ছে আগের অবস্থায়, সেই সাথে আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে দরজাটা। একফুট আন্দাজ খুলেই থেমে গেল দরজা। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এল একটা মাথা।

বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে ডান পা-টা উপরে তুলল রানা। পরমুহূর্তে দড়াম করে প্রচণ্ড এক লাথি লাগাল দরজায় গায়ে, ঠিক কী-হোলের উপর। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল লোকটা। ঝট করে দরজাটা খুলল রানা। টলতে টলতে দুপা এগিয়ে এল প্রকাণ্ড চেহারার লোকটা ঘরের মধ্যে। দুই হাতে চেপে ধরেছে সে থ্যাঁতলানো নাক-মুখ। পিস্তলটা ধরাই আছে ডান হাতে। নাকটা তো গেছেই, দাঁত যে ঠিক কয়টা অবশিষ্ট আছে বোঝা গেল না আবছা আলোয়। বোঝার চেষ্টাও করল না রানা। ধাঁই করে চালাল হান্টার লোকটার কান সই করে। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ বেরোল, তারপরেই হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল লোকটা মেঝের উপর। পিস্তলটা আঁকড়ে ধরে আছে এখনও। ডান হাতের কব্জিটা পা দিয়ে চেপে ধরে খসিয়ে নিল রানা পিস্তলটা ওর হাত থেকে। দ্রুত হাতে সার্চ করল ওর সারা শরীর। বেল্টের নিচে পাওয়া গেল একটা ছুরির খাপ। ছুরিটা টান দিয়ে বের করে আনল রানা।

ছ'ইঞ্চি লম্বা ব্লেড, দু'দিকে তীক্ষ্ণ ধার, আগাটা সূচের মত চোখা।

পিস্তল পকেটে ফেলে ছুরিটা নিল রানা বাম হাতে। ডান হাতে ধরল লোকটার চুলের মুঠি। হ্যাঁচকা টান দিয়ে বসিয়ে দিল ওকে।

দাঁড় করাবার চেষ্টা করে বিফল হলো রানা—পটপট করে চুল ছিঁড়ে যায়, কিন্তু পাহাড় নড়ে না। বসা অবস্থাতেই মাজার উপর একটা মাঝারি লাথি কষাল সে। মুখে বলল, 'উঠে দাঁড়াও।'

দুইহাতে মুখ ঢেকে যন্ত্রণায় ফোঁপাচ্ছে লোকটা, রানার কথা ঢুকছে না ওর কানে। ছুরিটা ঠেসে ধরল রানা ওর পিঠে। কোট, শার্ট ভেদ করে ছুরির ডগা চামড়ার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করতেই আড়ষ্ট হয়ে গেল লোকটা। এইবার পরিষ্কার শুনতে পেল রানার কথা। শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। ছুরিটা তেমনি ঠেসে ধরে আছে রানা। বলল, 'চলো, বেরোও ঘর থেকে।'

নিজের অবস্থাটা বুঝে নিয়েছে বিফল হত্যাকারী। ছুরিটা পিছন দিক থেকে হৃৎপিণ্ড বরাবর ঠেসে ধরা অবস্থায় কিছুই করবার নেই আদেশ মান্য করা ছাড়া। ভিলা থেকে বেরিয়ে শূন্য রাস্তা পার হলো দু'জন, দাঁড়াল এসে কালো রেনোয়ার পাশে। ড্রাইভিং সীটের পাশের দরজা খুলে গাড়িতে উঠতে বলল রানা ওকে, নিজে উঠল পিছনের সীটে। 'চালাও। সোজা পুলিস স্টেশন।'

গন্তব্যস্থল জানতে পেরে একেবারে মুষড়ে পড়ল লোকটা। ভাঙা গলায় বলল, 'চালাতে পারি না।'

পকেট থেকে হান্টার বের করল রানা। ঠিক একই জায়গায়, কানের উপর মারল আবার—এবার আগের চেয়ে একটু আস্তে। ককিয়ে উঠল লোকটা, ড্রাইভিং হুইল ধরে ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে।

'চালাও। সোজা পুলিস স্টেশন।' একই কথা একই সুরে পুনরাবৃত্তি করল রানা। অর্থাৎ কথা না শুনলে একই ব্যাপার ঘটবে আবার—কানের উপর বাড়ি পড়বে হান্টারের।

রওনা হয়ে গেল ওরা। এক হাতে চালাচ্ছে লোকটা, অপর হাতে একটা রুমাল চেপে ধরে আছে রক্তাক্ত মুখে। পেট দিয়ে হুইলটা চেপে রেখে বদলাচ্ছে গিয়ার। ফাঁকা রাস্তা ধরে মিনিট দশেক চলবার পর পৌঁছল থানায়। অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সেন্ট্রির সামনে দিয়ে লোকটাকে প্রায় ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে অফিস-রূমে ঢুকল রানা। ধাক্কা দিয়ে একটা বেঞ্চের দিকে ওকে পাঠিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল ডেস্কের কাছে। দু'জন ইউনিফরম পরা লোক বসে আছে ডেস্কের ওপাশে। একজন ইন্সপেক্টার, একজন সার্জেন্ট। বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার দেখছে রানার মুখের দিকে, আবার দেখছে প্রকাণ্ড লোকটার রক্ত চটচটে থ্যাতলানো মুখের দিকে। থুক করে দুটো ভাঙা দাঁত ফেলল লোকটা, চকচকে মেঝের উপর রক্তাক্ত থুথু ফেলল।

রানা বলল, 'এই লোকটা সম্পর্কে কিছু নালিশ আছে আমার।'

নরম গলায় বলল ইন্সপেক্টার, 'দেখে তো মনে হচ্ছে ওরই কিছু নালিশ আছে আপনার বিরুদ্ধে।'

'আগে আমার পরিচয় জানা দরকার আপনাদের,' পকেট থেকে পাসপোর্ট আর ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করল রানা। কিন্তু সেদিকে না চেয়েই হাতের ইশারায় মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করল ইন্সপেক্টার।

'পুলিসে কাজ করি ঠিকই, কিন্তু রেসের খবর রাখতে কেউ বারণ করেনি আমাদের। পরিচয়পত্র দেখাতে হবে না, আপনাকে ভাল করেই চিনি আমরা। কিন্তু মিস্টার রেনার, আমরা জানতাম আপনি রেস ড্রাইভিঙের সুপার স্টার, বক্সিং-এর কথা তো জানা ছিল না। ওদিকেও রেকর্ড করবার ইচ্ছে আছে নাকি?'

এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখছিল সার্জেন্ট মেঝের উপর বসা লোকটাকে, হঠাৎ তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

'মাই গড! বস্, এই তো ফ্রিজ হারম্যান।'

চমকে উঠল ইন্সপেক্টার। ঝট করে ফিরল লোকটার দিকে। এক সেকেন্ড পরীক্ষা করেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। 'বাঁধো! বাঁধো আগে, তারপর কথা! সেন্ট্রি…' দশ সেকেন্ডের মধ্যে হাত কড়া লাগানো হয়ে গেল। একজন সশস্ত্র গার্ড দাঁড়িয়ে গেল ওর পিছনে। রানার দিকে ফিরল ইন্সপেক্টার। 'এর সাথে পরিচয় হলো কোথায়?'

'আমার ঘরে ঢুকেছিল। কিছুটা আহত করতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত।'

'দুঃখিত!' অবাক হয়ে চাইল ইন্সপেক্টার রানার মুখের দিকে। 'ওকে খতম করে তারপর নিয়ে এলেও কমিশনারের এক হাত লম্বা বাহবার চিঠি পেতেন আপনি। ভয়ঙ্কর ডাকাত! চারটে নরহত্যার অভিযোগ ঝুলছে ওর বিরুদ্ধে। পালিয়ে বেড়াচ্ছে গত দুই বছর। আশ্চর্য! আপনার ঘরে ঢুকেছিল কি করতে?'

বিনা-বাক্য-ব্যয়ে পকেট থেকে ছুরি আর পিস্তলটা বের করে টেবিলের উপর সাজিয়ে দিল রানা। চোখ দুটো কপালে তুলে সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল ইন্সপেক্টার। চেয়ারে বসেই খাতা খুলল।

'এজাহারটা লিখে ফেলা যাক।'

'প্লীজ, আমার হয়ে আপনিই কাজটা করে দিন। জরুরী কাজ রয়েছে আমার। পরে এক সময় আসব আমি আবার। মুখে বলে দিয়ে যাচ্ছি। চলবে তাতে?'

'চলবে।'

তিন মিনিটের মধ্যে সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ দিল রানা। টেপ করে নেয়া হলো কথাগুলো। বক্তব্য শেষ করল রানা এই বলে 'আমার ধারণা হারম্যান ডাকাতির উদ্দেশ্যে ঢোকেনি আমার ঘরে, ও এসেছিল আমাকে খুন করতে। কে ওকে পাঠিয়েছিল জানতে পারলে আমি সুখী হব।'

'সে ব্যাপারে ভাববেন না, মিস্টার রেনার। বিরাট এক উপকার করলেন আজ আপনি আমাদের।'

পারস্পরিক ধন্যবাদের পর বেরিয়ে এল রানা থানা থেকে। সোজা এসে উঠল রেনোয়াতে। আহত ফ্রিজ হারম্যানের থানায় পৌঁছতে লেগেছিল দশ মিনিট, ফিরতে রানার লাগল সাড়ে তিন মিনিট। ঘরে ফিরল না সে। ব্লু অ্যাঞ্জেল গ্যারেজ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে পার্ক করল গাড়িটা রাস্তার পাশে। শুধু কোলাপসিবল গেটটাই নয়, বিশাল রোলার দরজাটাও এখন বন্ধ। কিন্তু আলো জ্বলছে ভিতরে, দরজার দু'পাশে লম্বা রেখা দেখা যাচ্ছে আলোর।

সীটে হেলান দিয়ে যতটা সম্ভব নিচু হয়ে বসে আছে রানা। এক মিনিট দুই মিনিট করে পেরিয়ে গেল বিশ মিনিট। তারপর বিশাল দরজার পাশের একটা সাইড ডোর খুলে গেল। তিনজন লোক বেরিয়ে এল বাইরে, নিভে গেল ভিতরের আলো। চতুর্থজন বেরিয়ে এসে তালা লাগাল দরজায়। রিউ গেরার্ডের ম্লান রাস্তার বাতিতেও পরিষ্কার চিনতে পারল রানা তিনজনকে। ব্রনসন, কাপলান আর হ্যানসিঙ্গার। চতুর্থ জনকে চেনা গেল না। কোন দিন দেখেনি রানা ওকে। কথাবার্তা যা হওয়ার ভিতরে থাকতেই হয়ে গেছে বোঝা গেল। বাইরে বেরিয়ে সোজা ভিলার দিকে এগোল ব্রনসন দ্রুতপায়ে। বাকি তিনজন একটা সিট্রনে উঠে ছেড়ে দিল গাড়ি। আলগোছে ব্যাক করল রানা রেনোয়াটা। বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করল সিট্রনকে একটি বাতিও না জ্বেলে। নানান রাস্তা ঘুরে নতুন শহরের দিকে চলল ওরা। সামনের গাড়ির ড্রাইভারের মধ্যে তাড়াহুড়োর কোন লক্ষণ নেই, তাই সহজ ভঙ্গিতে রানাও চলল পিছন পিছন। উচ্চবিত্তের আবাসিক এলাকা রিউ জর্জেস স্যান্ড-এ এসে পৌঁছল গাড়ি দুটো। রাস্তার দু'পাশে বড় বড় গাছ, তারপরেই দু'পাশের বাড়িগুলোর বিশাল প্রাঙ্গণ ঘেরা উঁচু দেয়াল। বাঁক নিল সামনের সিট্রন, আধ মিনিট পর রানাও বাঁক নিল সেইদিকে, এবং চট করে জ্বেলে দিল হেডলাইট।

দেড়শো গজ সামনে থেমে দাঁড়িয়েছে সিট্রন। হ্যানসিঙ্গার নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে, খুলছে গেটের তালা। অপেক্ষমাণ গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল রানা। গেটটা খুলে যাচ্ছে। গাড়ির আরোহীদের কেউ রেনোয়ার দিকে চাইল না পর্যন্ত।

সামনে বাঁক পেয়ে মোড় নিল রানা। ঘুরেই থেমে দাঁড়াল। নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। পিছনের সীট থেকে ফ্রিজ হারম্যানের ওভারকোটটা নিয়ে গায়ে চড়াল, কলার উঁচু করে দিল উল্টে। উঁকি দিয়ে দেখল রাস্তার উপর দেখা যাচ্ছে না সিট্রনটাকে, ঢুকে গেছে ভিতরে। হাঁটতে হাঁটতে বাড়িটার সামনে চলে এল সে। গেটের গায়ে লেখা আছে বাড়িটার নাম—লাভ লজ। নামটা বেখাপ্পা ঠেকল রানার কাছে। গেটের দু'পাশে দেয়ালগুলো এগারো ফুট উঁচু, মাথায় সিমেন্টের সাথে ভাঙা কাঁচ গাঁথা। গেটটাও সেই একই সমান উঁচু, উপরে অত্যন্ত চোখা শিক। গেট থেকে গজ বিশেক দূরে দোতলা বাড়ি, প্রচুর ব্যালকনিযুক্ত পুরানো ধরনের। উপর নিচ দুই তলাতেই ভারী পর্দার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

ঠেলা দিয়ে দেখল রানা, গেটে তালা মারা। এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে

পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করল সে। পছন্দসই একটা বেছে নিয়ে ঢুকিয়ে প্যাঁচ দিতেই খুলে গেল তালা প্রথম চেষ্টাতেই। কিন্তু সাথে সাথেই আবার চাবি মেরে দিয়ে পকেটে ফেলল রানা চাবির গোছাটা, সহজ ভঙ্গিতে হেঁটে চলে এল ওদিকের রাস্তার পার্ক করা রেনোয়ার দিকে।

ঠিক পনেরো মিনিট পর শহরের মাঝামাঝি এলাকার সরু একটা গলিতে ঢুকল কালো রেনোয়া। গাড়িটা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত একটা জায়গা দেখে পার্ক করে রেখে হেঁটে এগোল রানা সামনে। কয়েক পা এগিয়েই ডান দিকের একটা ছ'তলা বাড়ির ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল উপরে। চারতলায় উঠে দাঁড়াল একটা দরজার সামনে, চাপ দিল কলিং বেলের বোতামে। প্রায় সাথে সাথেই খুলে গেল দরজাটা। জাপানী ড্রেসিং গাউন পরা, সাড়ে পাঁচফুট লম্বা, রোগা-পাতলা এক পক্ককেশ বৃদ্ধ দেখল রানাকে আপাদমস্তক, হাসল, তারপর ইঙ্গিত করল ভিতরে ঢোকার জন্যে। সারা ঘরে নানান ধরনের যন্ত্রপাতি, অনেকটা ইলেকট্রনিক ল্যাবরেটরির মত, আবার কিছুটা ফটোগ্রাফীর ডার্করুমের মতও লাগে। একপাশে পাতা রয়েছে দুটো আর্মচেয়ার। সেইদিকেই ইঙ্গিত করল বৃদ্ধ রানাকে।

'ফিলিপ আমাকে আগেই সাবধান করেছিল, মিস্টার মরিস রেনার। বলে দিয়েছিল, দিনে বা রাতে যে কোন সময় হামলা আসতে পারে আপনার তরফ থেকে। কিন্তু এই ভোর রাতে যে এসে হাজির হবেন, কল্পনাও করতে পারিনি। বসুন।'

'বসবার সময় নেই, মিস্টার লুইগী। অসময়ে বিরক্ত করবার জন্যে আন্তরিক দুঃখিত।' পকেট থেকে ফিল্ম কার্ট্রিজটা বের করে বুড়োর হাতে দিল রানা। 'প্রত্যেকটা ছবির একটা করে এনলার্জড প্রিন্ট বের করতে কতক্ষণ লাগবে?'

'আছে কতগুলো?'

'গোটা ষাটেক মত হবে।'

'দুপুর নাগাদ হয়ে যাবে আশা করা যায়। চলবে?'

'চলবে,' বলল রানা। 'জাঁ কার্লো কি মার্সেইতে আছেন?'

'তার মানে কোড!' মাথা দোলাল বৃদ্ধ। 'জাঁ কার্লোর খোঁজ করা মানেই কোড ব্রেক করার প্রয়োজন। বাহ্, বেশ জমিয়ে তুলেছেন দেখছি! হ্যাঁ। আছে কার্লো। ওর রিপোর্টও পেয়ে যাবেন সন্ধের দিকে আশা করা যায়।'

'ভেরি গুড। অ্যান্ড থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

বেরিয়ে এল রানা। স্থির করল, এখুনি দেখা করা দরকার ব্রনসনের সাথে। গ্যারেজ থেকে ফিরেই ব্যাটা নিশ্চয়ই রানার কামরাটা পরীক্ষা করে দেখেছে। রানাকে না দেখে নিশ্চিত হয়েছে—ধরে নিয়েছে, খুন করে লাশটা নিয়ে চলে গেছে ফ্রিজ হারম্যান, ফেলে দেবে উপযুক্ত জায়গায়, কিংবা ডুবিয়ে দেবে পাথর বেঁধে পানিতে। ভোর ছয়টায় রানা যদি কাজে গিয়ে যোগ দেয় তাহলে আঁৎকে তো উঠবেই, সারা রাত রানা কোথায় ছিল, কি করেছে, ইত্যাদি

নিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে শুরু করে দেবে, তার চেয়ে এখনই দেখা করে ওকে চমকে দেয়া ভাল।

কাছেই একটা গলিতে গাড়িটা রেখে ভিলায় এসে ঢুকল রানা। ঢুকেই দেখতে পেল একগোছা চাবি হাতে করিডর ধরে দরজার দিকে এগোচ্ছে ব্রনসন। খুব সম্ভব ব্যক্তিগত কিছু সুবিধের জন্যে কোন কারসাজির উদ্দেশ্যে চলেছে গ্যারেজের দিকে। রানার উপর চোখ পড়তেই মুহূর্তে রক্তশূন্য হয়ে গেল ওর মুখ, চোখ দুটো ঈষৎ বিস্ফারিত। দৃষ্টিতে নির্জলা আতঙ্ক। রেনারের ভূত দেখতে পাচ্ছে সে চোখের সামনে। কিন্তু আশ্চর্য দ্রুত সামলে নিল ব্রনসন। অস্বাভাবিক উত্তেজিত চড়া গলায় বলল, 'ভোর চারটে বাজে! কোথায় গিয়েছিলে, রেনার?'

'তুমি আমার মনিব নও, ব্রনসন,' হাসিমুখে বলল রানা।

'মনিব না হতে পারি, কিন্তু ইমিডিয়েট বস্।' পুরোপুরি সামলে নিয়েছে ব্রনসন। 'আর দ্বিতীয়বারের মত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—ব্রনসন নয়, মিস্টার ব্রনসন। কোথায় ছিলে? একঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে। থানায় খবর দিতে চলেছিলাম।'

'তাই নাকি?' হাসল রানা। 'মজার ব্যাপার কি জানো, থানা থেকেই ফিরছি আমি।'

'থানা থেকে!' বিস্মিত ব্রনসনের দৃষ্টি। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর। 'থানা থেকে ফিরছ মানে?'

'মানে থানা থেকে ফিরছি। অন্ধকার ঘরে চুপিচুপি ঢুকেছিল এক ব্যাটা ছুরি-পিস্তল নিয়ে। আচ্ছা মত পিট্টি লাগিয়ে থানায় দিয়ে এসেছি ব্যাটাকে। সাতদিনের আগে উঠতে পারবে না হাসপাতালের বিছানা ছেড়ে।'

'চোর?'

'কিংবা ডাকাত।'

'ঘরে চলো। ব্যাপারটা ভাল করে শুনতে হয়।'

ঘরে ঢুকে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে রেখে ঢেকে ব্রনসনকে যতটা বলা যায় বলল রানা। তারপর জানিয়ে দিল ক্লান্তিতে চোখ ভেঙে ঘুম আসছে ওর, দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে এবার।

ব্রনসন বেরিয়ে যেতেই আবার কাপড় পরল রানা। জানালার ধারে বসে রইল চুপচাপ। মিনিট পাঁচেক পর রাস্তায় বেরিয়ে এল ব্রনসন, হাতে চাবির গোছা। দ্রুতপায়ে চলে গেল সে গ্যারেজের দিকে। আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে বেরিয়ে এল রানাও। এবার ঘরের দরজায় চাবি লাগাতে ভুলল না। ব্রনসন যেদিকে গেছে তার উল্টো দিকে চলে গেল রানা রেনোয়া নিয়ে, আধমাইল গিয়ে আবোল তাবোল কয়েকটা বাঁক ঘুরল, তারপর একটা রাস্তায় আরও কয়েকটা গাড়ির পাশে রেনোয়া পার্ক করল। টাইয়ের গিট ঢিল করে, রিস্টওয়াচে পৌনে ছয়টার অ্যালার্ম দিয়ে, ছোটখাট একটা ঘুমের প্রস্তুতি নিল সে এতক্ষণে। ঘুমের আগে জানালাগুলোর কাঁচ তুলে দিয়ে ভিতর থেকে

দরজায় লক করতে ভুলল না।

নয়

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে গেল ট্র্যান্সপোর্টার। খুশিমনে রানার পাশে উঠে বসল হ্যারি আর জ্যাকিউস। এঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা।

'ঠিক আছে, রওনা হয়ে যাও তোমরা,' বলল ব্রনসন। 'তোমাদের ঘণ্টা দুয়েক পরে পৌঁছব আমি ভিগনোলেসে। কয়েকটা কাজ সেরে আসতে একটু দেরি হবে।'

কেন দেরি হবে, কি কাজ, সে কথা জিজ্ঞেস করল না রানা। কারণ জিজ্ঞেস করলে মিথ্যে উত্তর শুনতে হবে। তাছাড়া রানার জানাই আছে জরুরী কাজটা কি। রিউ জর্জেস স্যান্ডের লাভ লজে যেতে হবে ওকে, সহকর্মীদের জানাতে হবে হারম্যানের বিফল মিশনের কথা, পরিণতির কথা। কাজেই কোন প্রশ্ন না করে মাথাটা সামান্য একটু ঝাঁকিয়ে রওনা হয়ে গেল সে।

আজকে রানা আর রেসিং-মুডে নেই দেখে নিরতিশয় উৎফুল্ল হয়ে উঠল হ্যারি আর জ্যাকিউস। মাঝারি স্পীডেই ভিগনোলেসে পৌঁছে গেল ওরা সাড়ে এগারোটা নাগাদ। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে তিনজনেরই।

রেসট্র্যাকের পাশে চারকোনা মার্কা দালান। শেষ প্রান্তে রেস্তোরাঁ। ট্র্যাকের পাশে ট্র্যান্সপোর্টারটা ছেড়ে সোজা গিয়ে ঢুকল ওরা রেস্তোরাঁয়। বেশ জমজমাট হয়ে রয়েছে রেস্তোরাঁটা। বেশির ভাগ লোকই রেসট্র্যাকের অফিসার বা কর্মচারী। ব্লু অ্যাঞ্জেল টীমেরও রয়েছে কয়েকজন। চিনল রানাকে, কিন্তু একজনও কোন রকম আভাস দেখাল না যে চেনে। রানার পদাবনতির খবর জেনে গেছে সবাই। এমনিতেই কেউ পছন্দ করত না ওকে, কারও সাথে মিশত না বলে দাম্ভিক, আত্মকেন্দ্রিক মনে করত। গার্বারের মৃত্যুর পর সবার বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে ওর উপর, কিন্তু ব্লু অ্যাঞ্জেলের সেরা ড্রাইভার বলে কেউ কোন ভাব প্রকাশ করা থেকে বিরত ছিল—এইবার সুযোগ পাওয়া গেছে, সবাই চেষ্টা করছে অবহেলা দেখিয়ে কিছুটা উশুল করে নিতে। কারও তোয়াক্কা না রেখে কোণের একটা টেবিল দখল করল রানা। চুপচাপ খেয়ে উঠল। বিল চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় ঢুকল জুলিয়া। সবার অবহেলা সুদে-আসলে পুষিয়ে দিল জুলিয়া এক নিমেষে। ঝিক করে হেসে উঠল, আশে পাশের সবার কথা ভুলে ছুটে এসে ধরল রানার হাত, টেনে নিয়ে গেল বাইরে।

'নোংরা ভূত কোথাকার! সারা মুখে দাড়ি গিজগিজ করছে, গন্ধ ছুটে গেছে গা থেকে! ইল্লত! মানুষ না জন্তু তুমি একটা!'

'আসলে কোনটাই না,' বলল রানা। 'দুটোর মাঝামাঝি অবস্থায় আছি

আমি এখন। আজ রাত নাগাদ পুরোপুরি জন্তু হয়ে যাব।'

'বাবা ডাকছে। পাঁচ নম্বর কামরায় তোমার জিনিসপত্র সাজিয়ে রেখেছি। শেভটেভ করে চলে এসো।'

এগোতে যাচ্ছিল, টেনে দাঁড় করাল জুলিয়া রানাকে। বলল, 'দারুণ ভয় লেগেছিল কাল রাতে। সারারাত ঘুমাতে পারেনি দুশ্চিন্তায়। তেমন কোন বিপদ আপদ হয়নি তো, মাসুদ ভাই?'

'না, তেমন কিছু হয়নি।'

বিশ মিনিটের মধ্যে স্নান সেরে, শেভ করে, ভাল জামা-কাপড় পরে ফিলিপ কার্টারেটের ঘরে গিয়ে ঢুকল রানা। গম্ভীর মুখে বসে রয়েছে দুই বুড়ো।

সংক্ষেপে জানাল রানা গতরাতের সব ঘটনা। রানার কার্যকলাপের বিবরণ শুনে অবাক হলো কার্টারেট, কিন্তু সে ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তুলল না।

'এইবার? এখন কি করবে?'

'ল্যান্সিয়া নিয়ে ফিরে যাব মার্সেই। লুইগীর ওখানে খোঁজ নেব ছবিগুলোর কতদূর কি হলো। তারপর যাব ফ্রিজ হারম্যানকে খানিক সহানুভূতি জানাতে।'

'তোমার মনে হয় কথা বের করা যাবে ওর মুখ থেকে?'

'পুলিস তো কথা দিয়েছে, চেষ্টার ক্রটি করবে না। দেখা যাক।'

'ওখানেই থেকে যাবে, না ফিরে আসবে?'

'ঠিক নেই। খুব সম্ভব ফিরে আসব। আমি চাই ওরা মনে করুক আমি ভিগনোলেসে রাত কাটাচ্ছি। কিন্তু যদি ফিরে আসবার সুযোগ না পাই, সেজন্যে কয়েকটা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ডেলিভারি নেব আমি এখনি। আজ রাতে ঢুকব আমি লাভ লজে। আমার প্রথম দরকার একটা পিস্তল।'

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল হ্যামার। চোখজোড়া ছোট হয়ে গেছে ফিলিপ কার্টারেটের। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল রানার মুখের দিকে। রানা বুঝল, দ্রুত চিন্তা চলছে বৃদ্ধের মাথায়। রানার বিচার-বুদ্ধির উপর ঠিক কতটা নির্ভর করা যায় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিল কার্টারেট কয়েক সেকেন্ডে। তারপর কোনকথা না বলে উঠে গিয়ে দাঁড়াল পোর্টেবল টাইপ রাইটারের সামনে। বিছানার উপর ওটা উপুড় করে শুইয়ে পিছনের প্লেটটা খুলে ফেলল। পাশাপাশি সাজানো রয়েছে দুটো পিস্তল, দুটো সাইলেন্সার, আর দুটো স্পেয়ার ম্যাগাজিন।

'বেছে নাও, যেটা খুশি।'

ল্যুগারটাই পছন্দ হলো রানার। রিলিজ বাটন টিপে বের করে আনল ম্যাগাজিনটা। স্লাইড টেনে বের করল চেম্বারের গুলিটা। অভ্যস্ত দক্ষতার সাথে সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলো সে। হঠাৎ চোখ তুলে চেয়ে দেখল, হাঁ করে ওর হাতের দিকে চেয়ে রয়েছে ফিলিপ কার্টারেট। চট করে পিস্তলটা পকেটে ফেলে সাইলেন্সার আর স্পেয়ার ম্যাগাজিনটা তুলে নিল রানা।

'পিস্তলের ব্যবহারও শখ করে শিখেছিলে নিশ্চয়ই?' জিজ্ঞেস করল

কার্টারেট।

'না। দায়ে পড়ে।' বলল রানা। 'মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় সব বাঙালীকেই শিখতে হয়েছে এসবের ব্যবহার।'

'কিন্তু…' হঠাৎ ছটফট করে উঠল মাইকেল হ্যামার। ছেলেটাকে এইভাবে বিপদের মুখে কি করে পাঠাচ্ছ তুমি, জেমস? থুড়ি, ফিলিপ? তুমি না হয় ইন্টেলিজেন্সের লোক, তোমার এসবের অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু এই ছেলেটাকে এসবের মধ্যে…'

'ডিকটেশন আমি দিচ্ছি, না ও দিচ্ছে, মাইক? তুমি তো সামনেই রয়েছ, এসব ব্যাপারে আমি ওকে কোন পরামর্শ দিয়েছি?'

'কিন্তু সাহায্য করছ। তোমার দায়িত্ব কিন্তু এড়াতে পারবে না এই কথা বলে। ওর কোন বিপদ ঘটলে তুমি হবে তার জন্যে দায়ী। আমি বলি কি, এসবের কোন দরকার নেই, সোজা পুলিসে খবর দাও।'

'লাভ লজ কার বাড়ি, জানা নেই তোমার?'

'জানি। রুডলফ গুন্থারের। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? ওই বাড়িতে যদি কোন বেআইনী কাজ…'

'কোন প্রমাণ আছে তোমার হাতে?' বলল কার্টারেট। 'প্রমাণ ছাড়া ওই বাড়িতে ঢোকাতে পারবে পুলিস? অথচ ওই বাড়িতেই রয়েছে তোমার স্ত্রীর নিরুদ্দেশ হওয়ার চাবিকাঠি। বেআইনীভাবে ঢুকতে হবে আমাদের, পুলিসের কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না।'

'সেক্ষেত্রে আমি যাব ওর সাথে,' ঘোষণা করল বৃদ্ধ। 'ওকে একলা এইভাবে ছেড়ে দেয়া যায় না।'

'আপনি গেলে আমার সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশি, মিস্টার হ্যামার। আপনাকে নিয়ে ওই বাড়িতে আমি ঢুকব না। আমি যতক্ষণ না মুখ খুলছি ততক্ষণ ওরা জানতে পারছে না, ঠিক কি উদ্দেশ্যে ঢুকেছি আমি ওখানে। কিন্তু আপনি যদি ধরা পড়েন, কারও মনে কোন সন্দেহ থাকবে না কি উদ্দেশ্যে আপনি গেছেন। আপনার স্ত্রীর মৃত্যুও ঘটতে পারে এর ফলে।'

কথাটার যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারল না মাইকেল হ্যামার। তবু আমতা আমতা করে বলল, 'কিন্তু তাই বলে…তুমি কেন…ভয়ানক কিছু ঘটে যেতে পারে…' থেমে গেল সে। পরিষ্কার বুঝতে পারল বাজে বকছে সে। পুলিস যদি না যায়, রানাও যদি না যায়, তাহলে কে যাবে? প্রায় অথর্ব বৃদ্ধ ফিলিপ কার্টারেট? মেঝের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল সে কয়েক সেকেন্ড, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। কপাল কুঁচকে আছে চার ভাঁজ হয়ে।

'আর কি লাগবে তোমার?' জিজ্ঞেস করল কার্টারেট।

'ছালা বা তেরপল জাতীয় কিছু জিনিস লাগবে। আর লাগবে একটা মাথায় হুক লাগানো বারো ফুট আন্দাজ রশি। এক্ষুণি লাগবে না, কিন্তু তৈরি রাখবেন। যদি বিকেলে ফিরতে পারি তাহলে লাগবে ওসব।' উঠে দাঁড়াল

রানা। 'এবার চলি তাহলে।' বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জুলিয়াকে খুঁজে বের করতে হলো ল্যাসিয়ার চাবির জন্যে। বিদায় জানাতে গিয়ে রানাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমো খেল জুলিয়া, এবং টের পেল পিস্তলের অস্তিত্ব। চট করে রানার পকেট থেকে বের করল সে পিস্তলটা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, তারপর বলল, 'আমিও যাব।'

'সবাই দেখি আজ আমার সঙ্গী হতে চাইছে। আমি যে কাজে যাচ্ছি সে কাজ তোমার জন্যে নয়, জুলিয়া। প্লেযার ট্রিপ হলে খুশি হয়েই নিতাম তোমাকে।'

'আবার বিপদের মধ্যে যাচ্ছ তুমি, রানা। আমি সাথে থাকলে তোমার অনেক সুবিধে হবে। হয়তো সাহায্য করতে পারব দরকারের সময়।'

'এখানে এই ভিগনোলেসে বসেই তুমি বেশি সাহায্য করতে পারবে আমাকে। টেস্ট ট্র্যাকে গাড়ি চালাতে আসবে হ্যানসিঙ্গার। দূর থেকে নজর রাখবে ওর উপর।'

'হ্যানসিঙ্গার?' ভুরু কুঁচকে বিস্মিত দৃষ্টিতে রানার মুখটা পরীক্ষা করল জুলিয়া। 'হ্যানসিঙ্গারের ওপর নজর রাখব? ঠাট্টা করছ? যা-তা একটা কাজ দিয়ে ভুলিয়ে রেখে যাওয়ার চেষ্টা করছ।'

'আর লক্ষ রাখবে কাপলান আসে কিনা এখানে। ওরা কে কি করে তার রিপোর্ট দেবে আমি বিকেলে ফিরে এলে। ভাল কথা, ব্রনসনের ওপর নজর রাখতেও ভুলো না। খেয়াল রেখো, দূর থেকে। আই রিপিট—দূর থেকে। ভুলেও কাছে যাবে না ওদের।' পিস্তলটা জুলিয়ার হাত থেকে নিয়ে পকেটে পুরল রানা।

'কিন্তু তুমি কেন, রানা?' রানার হাত ধরল জুলিয়া এবার। 'পুলিসে খবর দেয়া হচ্ছে না কেন? বাবা ইচ্ছে করলেই ডুক্সেম ব্যুরোর সাহায্য পেতে পারে, তা না করে তোমাকে পাঠাচ্ছে কেন, বিপদের মধ্যে?'

'তোমার বাবা পাঠাচ্ছে না আমাকে,' বলল রানা। 'আমি নিজের ইচ্ছেয় যাচ্ছি। তবে তিনি জানেন কেন আমি এই ঝুঁকি নিচ্ছি নিজের ঘাড়ে।' কণ্ঠস্বর খানিকটা নিচু করল রানা। 'প্রথমত, আইনের আওতার মধ্যে কাজ করতে হয় পুলিসকে, আমি যে কাজ করতে যাচ্ছি সেটা ওদের দ্বারা কোনদিনই সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, সরকারী সাহায্য নিলে বাঁচানো যাবে না মাইকেল হ্যামারকে। তার স্ত্রী তো মারা যাবেই, তাকে নিয়েও টানাটানি পড়ে যাবে কোর্ট-কাচারীতে। তুমি চাও বুড়ো লোকটা বিপদে পড়ুক? এমনিতেই আধমরা হয়ে রয়েছে বেচারা ব্যাকমেইলিঙের শিকার হয়ে, তুমি চাও একেবারে শেষ হয়ে যাক মানুষটা, ভেঙে চুরে মিশে যাক মাটির সাথে?'

'তা কেন চাইব? কোনদিনই চাইব না সেটা।'

'কাজেই সরে দাঁড়াও। মাইকেল হ্যামারের মত একজন মহৎ লোক বিপদে পড়ুক সেটা তোমার বাবাও চান না, তুমিও চাও না, আমিও না। অতএব, আমি যা করতে যাচ্ছি সেটা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সো লঙ,

হয়তো নতুন কোন খবর দিতে পারব বিকেলে। চলি।'

লুইগীর ল্যাবরেটরিতে মুখোমুখি দুটো আর্ম-চেয়ারে বসে আছে রানা আর লুইগী। রানার হাতে কোয়ার্টার সাইজের একরাশ গ্লসি ফটোগ্রাফ। একের পর এক দেখছে রানা দ্রুত। বলল, 'নিজের প্রশংসা নিজের করা ঠিক না, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, দারুণ কিছু ছবি তুলেছি। আপনি কি বলেন?'

'হ্যাঁ,' বলল লুইগী। 'যোগ বিয়োগের অঙ্ক, গাড়ির পার্টস, আর কোডেড ঠিকানাগুলো যদি মহিলা হত দারুণ খুশি হত আপনার উপর। যাই হোক, ওসব থেকে কিছু মজার তথ্য বেরিয়ে এসেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং। বিশেষ করে মাইকেল হ্যামার আর ব্রনসনের কাগজগুলো। গত দুই মাসে প্রায় দশ লাখ ডলার খরচ করেছে মাইক হ্যামার। মজার খবর নয়?'

'কার নামে জমা হলো জানা গেছে?'

'কারও নামে নয়। জুরিখের একটা নামহীন নাম্বারড অ্যাকাউন্ট। অবশ্য ক্রিমিনাল অ্যাক্ট, বিশেষ করে খুনের প্রমাণ সংগ্রহ করা গেলে মালিকের নাম জানাতে বাধ্য হবে ওরা।'

'প্রমাণ দেয়া খুব কঠিন হবে না,' বলল রানা।

কয়েক সেকেন্ড রানার দিকে চেয়ে থেকে মাথা ঝাঁকাল লুইগী। বলল, 'দ্যাটস গুড। আপনাদের ব্রনসন বাবাজীও কম মজার চরিত্র নয়। ভদ্রলোক পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মেকানিক। তারিখ হিসেব করে দেখা গেছে, বিরাট বিরাট অঙ্কের টাকা পেমেন্ট পেয়েছে সে প্রায় প্রত্যেকটা গ্র্যান্ডপ্রিক্সের দু'তিনদিন পর।'

'বাহ্! রোজগারের ভাল রাস্তা বের করেছে আমাদের চীফ মেকানিক। কাপলান আর হ্যানসিঙ্গারের কি খবর?'

'মোটামুটি একই খবর। তবে কোডগুলো এখনও ব্রেক করা যায়নি। মাথা ঘামাচ্ছে জাঁ কার্লো। আশা করি সন্ধে নাগাদ বেরিয়ে যাবে। রানাকে ছবিগুলো ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে হাত বাড়াতে দেখে বলল, 'আপনি নিতে পারেন ওগুলো। আমার কাছে ডুপ্লিকেট আছে।'

'পকেটে ডিনামাইট নিয়ে ঘুরতে পারব না আমি। থাক ওগুলো আপনার কাছেই। আজই আর একবার দেখা করব আপনার সাথে। এখন চলি।' গুড বাই।'

লুইগীর চারতলা ফ্ল্যাট থেকে নেমে সোজা থানায় গিয়ে হাজির হলো রানা। ভোর রাতের সেই একই ইন্সপেক্টারকে পাওয়া গেল ডেস্কে। কিন্তু হাসি খুশি ভাবটা বেমালুম উবে গিয়েছে ওর চেহারা থেকে।

'কি খবর? গান গাইল আপনার ময়না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নাহ্।' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ইন্সপেক্টার। রানাকে ইঙ্গিত করল বসবার। 'একেবারে চুপ হয়ে গেছে ময়না। গান তো দূরে থাকুক...'

'তার মানে?' চোখ দুটো একটু ছোট হয়ে গেল রানার। চেয়ার টেনে

নিয়ে বসল।

'ওষুধই কাল হয়েছে ব্যাটার। এমনই দুরমুজ দিয়েছিলেন যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ব্যথা দূর করার ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে হয়েছিল ডাক্তারকে। কেবিনের ভেতর-বাইরে দুই দু'গুণে চারজন পুলিস ছিল পাহারায়। দুপুর বারোটা বাজার ঠিক দশ মিনিট আগে সোনালী চুলওয়ালী অপূর্ব সুন্দরী এক নার্স এসে গর্দভগুলোকে...'

'গর্দভগুলোকে?'

'হ্যাঁ। আমার সার্জেন্ট, আর তিনজন সেপাই। গর্দভ। একগ্লাস পানি আর দুটো ট্যাবলেট রেখে গিয়েছিল নার্স বেডসাইড টেবিলে, সার্জেন্টকে বলে গিয়েছিল যেন ঠিক বারোটার সময় ওগুলো খাওয়ানো হয় ওকে ঘুম থেকে তুলে। ঠিক সময়মত হারম্যানকে ঘুম থেকে তুলে নিজ হাতে খাইয়েছিল সার্জেন্ট ওষুধগুলো।'

'কি ওষুধ?'

'সায়ানাইড।'

মার্সেইর হোটেল স্প্লেনডিডে অত্যন্ত দামী আসবাব পত্রে সুসজ্জিত একখানা তিন কামরার স্যুইটে টেলিফোনের রিসিভার কানে ধরে বসে আছে রুডলফ গুন্থার। দাঁতের ফাঁকে চুরুট। প্রবল বেগে নাচাচ্ছে এক পা আরেক পায়ের উপর তুলে, বাঘের চামড়ার স্যান্ডেলটা খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে তার ফলে।

খানিক শুনবার পর বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল গুন্থার। বলল, 'কিন্তু হারম্যানকে শেষ করে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে না। ফিল্মটা উদ্ধার করা যায়নি এখনও। তোমরা খামোকা সময় নষ্ট করছ। জানো তুমি, রেনার লোকটা আসলে কে?'

'যে-ই হোক, স্যার,' ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এল। 'আজ সন্ধের মধ্যে...'

'রাখো তোমার সন্ধে। অনেক সন্ধে দেখেছি। শোনো, ওভাবে হবে না ও হচ্ছে পৃথিবীর সেরা দশজন এজেন্টের একজন। ওর আসল নাম মাসুদ রানা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের লোক। ইটালিয়ানও নয়, রেস ড্রাইভারও নয়। ইমিডিয়েটলি যদি ওকে শেষ করে দিতে না পারো, শেষ হয়ে যাবে তোমরাই। কাজেই যেমন ভাবে পারো, রিপিট, যেমন ভাবে পারো খতম করো ওকে, যত শীঘ্র সম্ভব।'

'ইয়েস, স্যার।'

'আর একটা কথা, নিজেদের ক্ষমতাকে ওভার-এস্টিমেট করবে না।'

'ইয়েস, স্যার।'

'আমি অপেক্ষা করছি। যখন যেখানে যা ঘটবে, সবচেয়ে আগে জানাবে আমাকে।'

শেষের 'ইয়েস, স্যার'টা না শুনেই নামিয়ে রাখল গুন্থার টেলিফোনের

রিসিভার। পুরু কার্পেটের উপর ঘরের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত পায়চারি শুরু করল অস্থির পদে। প্রথমে জেমস মিচেলের পরিচয়, পরে মরিস রেনারের পরিচয় জানতে পেরে ভিতর ভিতর দারুণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে সে।

সন্ধের আগেই পৌঁছল রানা ভিগনোলেসে।

পথে একটা ফেরারীকে পিছু ধাওয়া করতে দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে। যা করবার করতে হবে আজ রাতেই। হাতে সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। খোলাখুলি এইভাবে পিছু ধাওয়া করবে, এতটা কল্পনা করেনি রানা। ফেরারীর চালককে না দেখেও ওর গাড়ি চালাবার ভঙ্গি দেখেই টের পেয়েছে রানা, মার্কাস কাপলান। সাথে আরও চারজন লোক ছিল। রানার সাথে রাজপথের উপর রেস দেয়ার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই ধাওয়া করেনি ওরা। সালেহীনের বোতাম বাঁচিয়ে দিয়েছে রানাকে এ যাত্রা। কাপলানকে তাজ্জব করে দিয়ে চোখের সামনে ছোট হতে হতে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেছে ল্যান্সিয়াটা।

জুলিয়ার কাছে জানা গেল, রানা এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার ঘন্টা দেড়েক পরে পৌঁছেছিল ব্রনসন আর হ্যানসিঙ্গার। এসেই কাজে লেগে গিয়েছিল ব্রনসন দুই সহকারী নিয়ে। আশেপাশেই ঘুরঘুর করছিল হ্যানসিঙ্গার। বেলা চারটে নাগাদ, সবাই যখন রেসট্র্যাকে ব্যস্ত, এসেছিল মার্কাস কাপলান ওর লাল ফেরারীতে করে।

'গাড়িটা পার্ক করেছিল ট্র্যান্সপোর্টারের খুব কাছাকাছি, তাই না?'

'হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে?'

'আন্দাজে। কাপলান গেল কখন?'

'ছ'টা নাগাদ। হ্যানসিঙ্গারও চলে গেছে ওর সাথে।'

হলরুমে এসে ঢুকল মাইকেল হ্যামার। হন্তদন্ত ভাব।

'হ্যারি আর জ্যাকিউসকে পাওয়া যাচ্ছে না।' বলল হ্যামার রানাকে দেখেই।

কিছুমাত্র বিচলিত ভাব প্রকাশ পেল না রানার মধ্যে। বলল, 'বিকেল পাঁচটার পর আর কেউ দেখেনি ওদের।'

'ঠিক। তুমি জানলে কি করে?'

'সেই সময়ে নিশ্চয়ই কাজ করছিল ওরা ট্র্যান্সপোর্টারে? ব্রনসনের সাথে?'

'অন্তর্যামী নাকি লোকটা! তুমি জানলে কি করে?'

'আন্দাজে। এটাও জানি, ওদেরকে কেউ কোনদিন খুঁজে পাবে না আর।'

'তার মানে?' চোখ দুটো কপালে উঠল হ্যামারের।

'মানের ব্যাখ্যা পরে দেয়া যাবে। আগে শোনা যাক, ব্রনসনের বক্তব্য কি?'

'চা খেতে গিয়েছিল ওরা। এক ঘন্টা পার হয়ে যায় তবু যখন ফেরে না তখন খোঁজ খবর শুরু করে ও।'

'রেস্তোরাঁর লোকেরা কি বলে? চা খেতে গিয়েছিল ওরা?' হ্যামারকে মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'তাহলে যদি পাওয়া যায়, দুটো লাশ পাবেন। খুব সম্ভব একটা লাল ফেরারীতে চড়ে নিরুদ্দেশের পানে পাড়ি দিয়েছে ওরা।

'লাল ফেরারী? কাপলানের?'

'যাই হোক, যা দেখা উচিত ছিল না তাই দেখে ফেলেছিল বেচারারা। শুধু ওরাই নয়, মার্সেই গ্যারেজের মেকানিক জেথ্‌ আর হসারও গেছে ওই একই কারণে একই গন্তব্যস্থলের দিকে। ব্রনসনের বক্তব্য অতিরিক্ত কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে ছুটি নিয়ে পালিয়েছে ওরা। আসলে চিরদিনের জন্য ছুটি দেয়া হয়েছে ওদের।'

'তুমি বলতে চাও, আমাদের ব্রনসন…'

'হ্যাঁ। আপনার প্রিয় চীফ মেকানিক হুগো ব্রনসন।' রানার বক্তব্য শুনে উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল জুলিয়া, ওর কাঁধে হাত রাখল রানা। 'তোমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে ব্যাপারটা, আপত্তিকর মন্তব্য মনে হতে পারে আমার কথাটা, কিন্তু যা বলছি তা সত্য। ফটোগ্রাফিক প্রমাণ রয়েছে আমার হাতে। তোমার ভাইয়ের হত্যাকারীও আর কেউ নয়, এই ব্রনসন। ক্লারমন্টফেরাভ রেসট্র্যাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল ও আমাকেও। আমার দোষে মৃত্যু হয়নি গার্বারের, মারা গেছে ব্রনসনের কারসাজিতে। আজ-দুপুর ঠিক বারোটার সময় ওরই ইঙ্গিতে খুন হয়েছে ফ্রিজ হারম্যান বলে এক দুর্ধর্ষ ডাকাত।'

কথাটা কানে গেল ফিলিপ কার্টারেটের ঘরে ঢুকেই। ভ্রূ জোড়া কুঁচকে গেল তার। বলল, 'তাই নাকি! কিভাবে মারা গেল? পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছিলে না তুমি তাকে?'

'দিয়েছিলাম। হাসপাতালে ব্যথা দূর করবার ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে ওকে। চিরতরে দূর হয়ে গেছে ওর সব ব্যথা। সায়ানাইড। হারম্যানকে ধরে থানায় দিয়ে এসেছি, এমন ভাবে পিটিয়েছি, যে কয়েকদিন শুয়ে থাকতে হবে ওকে হাসপাতালে—এ খবর ব্রনসন ছাড়া আর কেউ জানত না। পুলিসের কাছে কোন কিছু স্বীকার করবার আগেই মুখ বন্ধ করে দেয়া হলো ওর।'

'আশ্চর্য! দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে আমার কাছে!' একটা সোফায় বসে পড়ল মাইকেল হ্যামার। 'ব্রনসন? আমাদের ব্রনসন! বিশ্বাস করি কি করে?'

'সত্যিই, হুগো ব্রনসনের ব্যাপারে একথা ভাবাই যায় না,' বলল জুলিয়া।

'ভাবা যাক আর না যাক, দয়া করে ওর থেকে দূরে থেকো। ওর একশো গজের মধ্যে যাওয়া তোমার জন্যে নিরাপদ বলে মনে করি না আমি। যাই হোক, ও কোথায় এখন?'

'পাগল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে হ্যারি আর জ্যাকিউসকে। ওর সিট্রনে করে।'

'সুসংবাদ। আমি এবার তৈরি হয়ে রওনা হয়ে যেতে চাই। হুক বাঁধা রশি আর ত্রিপল জোগাড় হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, আমার গাড়িতে সেগুলো তোলার ব্যবস্থা করুন দয়া করে। আধ-ঘণ্টার মধ্যে রওনা হয়ে যাব আমি।'

দশ

ভিগনোলেসের দক্ষিণে একটা মোড়ের কাছাকাছি ব্রেক চেপে ল্যান্সিয়াকে সাইড দিল একটা কালো সিট্রন ডি. এস.। সাঁ করে বেরিয়ে গেল ল্যান্সিয়া। সিট্রনের ড্রাইভিং সীটে বসা ব্রনসন হাতের তালু দিয়ে চোয়াল ঘষল চিন্তিত ভঙ্গিতে, আবার ভিগনোলেসের দিকে ঘোরাল গাড়িটা। রাস্তার ধারে প্রথম যে টেলিফোন বুদটা পাওয়া গেল তার পাশে দাঁড় করাল গাড়ি।

নির্দেশ পেয়ে ফিরে এল ব্রনসন চৌকোনা-মার্কা বাড়িটায়। মাইকেল হ্যামারকে কোথাও না পেয়ে হলরুম থেকে বেরিয়ে আসছিল, এমনি সময় নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে এল ফিলিপ কার্টারেট। ওকে দেখেই ভুরু নাচাল বৃদ্ধ।

'কি হে, কি খবর? খোঁজ পাওয়া গেল কিছু?'

'নাহ্,' বলল ব্রনসন। 'তবে লা বিউসেট থেকে পুলিস জানাচ্ছে যে হ্যারি আর জ্যাকিউসের মত দেখতে দু'জন লোককে দেখা গেছে সেখানে। আমি যাচ্ছি সেখানে। মিস্টার হ্যামার কোথায়?'

'আশেপাশে কোথাও যদি না থাকে তাহলে ঘুমাচ্ছে নিজের ঘরে। গাড়িটা তো রয়েছে বাইরে পার্ক করা।'

'হ্যাঁ। সেটা দেখেই তো খোঁজ করছি। আমার গাড়ির ব্রেক ফেল করেছে, একটা গাড়ি বিশেষ দরকার। ঘুমিয়ে পড়েছে...' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিজের মনে বলল ব্রনসন, 'এখন জাগিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। অ্যাস্টনের স্পেয়ার কী রয়েছে আমার কাছে, ভাবছি না বলেই নেয়া ঠিক হবে কিনা...'

'আমার মনে হয় তুমি নিলে কিছুই মনে করবে না মাইক। তাছাড়া যে কাজে যাচ্ছ, সেটা অত্যন্ত জরুরী কাজ। বরং খুশিই হবে। শুধু তোমার নয়, ওরা দু'জন মাইকেরও অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল।'

'ঠিক বলেছেন।' খুশি হয়ে উঠল ব্রনসন। 'ঘুম থেকে উঠে যদি খোঁজ করেন, তাহলে বলবেন, আমি নিয়েছি।'

দ্রুতপায়ে চলল ব্রনসন গাড়িটার দিকে।

ফরাসী পুলিসের তোয়াক্কা না রেখে প্রথমে একশো দশ কিলোমিটারের গতি-সীমা লংঘন করল রানা, তারপর ভাবল, আইন যখন ভেঙেছি, ধরা পড়লে শাস্তি হবে—কম করে ভাঙলে যে কম শাস্তি হবে তা যখন নয়, ভালমত ভাঙাই দরকার। উড়ে চলল ল্যান্সিয়া। স্পীড মিটারের কাঁটা গিয়ে ঠেকেছে দুশো দশে।

পিছনে মৃদু খশ খশ শব্দ শুনে চট করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল সে পিছনে। মনের ভুল। যেটা যেখানে ছিল সেটা সেখানেই আছে। হুক বাঁধা রশি, একটা

ফার্স্ট এইড বক্স, গোটা কয়েক যন্ত্রপাতি ভরা একখানা ক্যানভাসব্যাগ, একটা সতরঞ্চির মত পুরু ত্রিপল—যেটা যেমন ছিল তেমনি আছে। হয়তো অযত্নে রাখা ত্রিপলটার এক কোনা বাতাস লেগে বাড়ি খাচ্ছে কোথাও—ভেবে মন দিল রানা গাড়ি চালনায়।

ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ধীরে ধীরে স্পীড কমিয়ে আনল রানা। এসে গেছে মার্সেই। প্রায়। আরও মাইল খানেক গিয়ে লাল ট্রাফিক সিগন্যাল দেখে থেমে দাঁড়াল ল্যান্সিয়া। অস্থিরতার চিহ্নমাত্র নেই রানার চেহারায়; কোন লক্ষণ নেই অসিহষ্ণুতার—আঙুল দিয়ে গাড়ির ছাতে টপাটপ তবলা বাজানো নেই, অনর্থক অ্যাক্সিলারেটার টিপে আওয়াজ করা নেই, একেবারে স্থির শান্ত হয়ে গেছে সে কাজে নামার পূর্ব মুহূর্তে। কিন্তু এত শান্তশিষ্ট মানুষটাও আঁৎকে উঠল হঠাৎ। ঝট করে ফিরল পিছন দিকে, হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। এইবার শুধু খশ খশ আওয়াজ নয়, পরিষ্কার মানুষের কণ্ঠস্বর।

'তুমি বোকা বানিয়েছ এতদিন আমাদের, রানা।' ত্রিপলের নিচ থেকে বেরিয়ে এল মাইকেল হ্যামার। 'মদ খাওয়া, নার্ভাস ব্রেক ডাউন, ডাবল-ভিশন, সব বাজে কথা! সব ঠিক আছে তোমার তাই না?'

মৃদু হেসে পিস্তলটা পকেটে ভরল রানা। বলল, 'আছে। কিন্তু আপনি কি করেছেন এখানে, মিস্টার হ্যামার?'

'তুমি যা করছ, আমিও তাই করছি!' পিছনের সীটে উঠে বসল বৃদ্ধ।

'তার মানে?'

'আজ দুপুরে জুলিয়ার সাথে তোমার কথাবার্তা সব শুনেছি আমি। আমার জন্যে পুলিসের সাহায্য না নিয়ে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছ তুমি, রানা। অনুরোধ করলে কথা রাখবে না, তাই লুকিয়ে আসতে হলো আমার।'

হাত বাড়িয়ে পিছনের দরজা খুলে দিল রানা।

'এসেছেন, আমি খুব খুশি হয়েছি। আপনার সদিচ্ছার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। এইবার কেটে পড়ুন। নেমে যান গাড়ি থেকে।'

'প্লীজ, রানা!' রানার হাত ধরল হ্যামার। 'ভাগিয়ে দিয়ো না। আমার সাহায্য দরকার হতে পারে তোমার। আমাকেও একটু শরিক হতে দাও এ ব্যাপারে।'

'ভয়ঙ্কর যায়গায় যাচ্ছি আমি। আপনার কিছু একটা ঘটে গেলে?'

'তোমার কিছু একটা ঘটে গেলে?'

'আপনার স্ত্রী আছেন। আমার কেউ নেই যে চোখের জল ফেলবে। আমার থাকা না থাকা সমান কথা। একা একটা লোক যা খুশি বিপদের ঝুঁকি নিতে পারে। আপনি পারেন না।'

কটমট করে রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল বৃদ্ধ কয়েক সেকেন্ড, তারপর বলল, 'তোমার কিছু একটা ঘটে গেলে জীবনে আর কোন দিন আমি দু'চোখের পাতা এক করতে পারব ভেবেছ? ওসব ধানাই পানাই ছাড়ো, রানা। আমি যাচ্ছি তোমার সাথে।'

বাতিটা সবুজ হতেই আবার চলতে শুরু করল ল্যান্সিয়া। কয়েক সেকেন্ড, চুপ করে থেকে আবার মুখ খুলল হ্যামার। তোমার ধারণা, কেউ তোমাকে ভালবাসে না? কারও কিছু এসে যায় না তুমি মারা গেলে? জানো তুমি, দরকার হলে তোমার জন্যে নিজের একটা চোখ উপড়ে দেবে, এমন লোক আছে দুনিয়ায়?'

'কে?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল রানা।

'এই মুহূর্তে তিন জনের নাম বলতে পারি আমি। কিন্তু তার দরকার নেই। তবে ভুলেও ভেবো না এই দুনিয়ায় তুমি একা।'

'আজকের রাতটার জন্যে একা হতে পারলে ভাল হত,' বলল রানা। 'যাই হোক, আপনাকে সাথে নিতে পারি, কিন্তু কথা দিতে হবে, যা বলব তাই করবেন।'

'ঠিক আছে। রাজি আমি। তোমার আদেশ লংঘন করব না।'

রিউ জর্জেস স্যান্ডের তিনশো গজ দূরে গাড়ি পার্ক করল রানা। জিনিসপত্র সব ভরল ক্যানভাস ব্যাগে, তারপর ওটা কাঁধে ঝুলিয়ে রওনা হলো পায়ে হেঁটে। আকাশের দিকে এক নজর চেয়েই মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। অপূর্ব চাঁদ উঠেছে একটা, মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই সারা আকাশে কোথাও।

ত্রিপলটা কাঁধে ফেলে রানার পিছু পিছু লাভ লজের উঁচু দেয়ালের ছায়ায় চলে এল হ্যামার। বেশ কিছুদূর হেঁটে একটা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ব্যাগের জিনিসপত্র পরীক্ষা করে দেখল।

'এতসব জিনিস কিসের জন্যে?' জিজ্ঞেস করল হ্যামার।

'রশি আর ত্রিপল দেয়াল টপকাবার জন্যে। প্লায়ার্স নিয়েছি, প্রয়োজন হলে ইলেকট্রিক অ্যালার্মের তার কাটবার জন্যে। বাটালী নিয়েছি কিছু খোলার দরকার হতে পারে ভেবে। ফার্স্ট এইড বাক্সটা কি কাজে লাগবে বলা যায় না—কিন্তু লাগতে পারে।' হুক বাঁধা রশিটা বের করে গাছের একটা ডাল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল রানা উপর দিকে। প্রথম চেষ্টাতেই আটকে গেল ওটা জায়গা মত। হ্যামারের দিকে ফিরল। 'এবার আপনার কাজ বুঝে নিন। এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন আপনি আধঘণ্টা। আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে এলাম তো ভাল, নইলে ওই রাস্তার মোড়ে গিয়ে ফোন করবেন আপনি থানায়। ওদের এই ঠিকানায় ছুটে আসতে বলে আপনিও ল্যান্সিয়া নিয়ে ছুটবেন ভিগনোলেসের দিকে। মিস্টার কার্টারেটকে জানাবেন সব কিছু, কি করতে হবে সে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দেবেন ওঁর ওপর। অলরাইট?'

'অলরাইট।'

ত্রিপলটা কাঁধে ফেলে রশি বেয়ে উপরে উঠে গেল রানা অনায়াসে। ত্রিপল বিছাল দেয়ালের মাথায় গাঁথা কাঁচের টুকরোগুলোর উপর। তারপর চড়ে বসল দেয়ালের উপর। চট করে দেখে নিল, যে ডালে হুক বাধিয়ে উপরে উঠেছে তার নিচে আর কোন ডাল আছে কিনা নামার সুবিধের জন্যে। আছে। রানার সুবিধের জন্যে ফুট পাঁচেক নিচে আর একটা ডাল তৈরি হয়ে

আছে আগে থেকেই।

'ব্যাগটা দিন,' নিচের দিকে চেয়ে চাপা গলায় বলল রানা।

উড়ে এল ব্যাগটা। খপ করে ধরল রানা ওটা, যতদূর সম্ভব ঝুঁকে ফেলে দিল নিচে, ভিতর দিকে।

'রশিটা বাইরের দিকেই থাক,' বলল রানা। 'আমি যখন ডাক দেব, ওটা ছুঁড়ে এপাশে ফেলবেন।'

কথাটা বলেই ডাল ধরে ঝুলে পড়ল রানা, পা রাখল নিচের ডালে, বসে পড়ল। নিচের ডালটা ধরে ঝুলে পড়ল আবার, তারপর হালকা ভাবে নেমে গেল নিচে।

গোটা কয়েক চেরি গাছের ছায়ায় ছায়ায় বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেল রানা। দোতলায় আলো নেই আজ। একতলার জানালায় পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আলোর চিলতে। ওক কাঠের এক বিশাল সদর দরজা দেখা যাচ্ছে। বন্ধ। এদিক দিয়ে ঢোকার ইচ্ছে নেই রানার, তাই কালক্ষেপ না করে যতদূর সম্ভব ছায়ায় থেকে রওনা হলো সে বাড়িটার ডানপাশ ঘেঁষে। পিছনের দরজাতেও তালা মারা। একতলার জানালা দিয়ে ঢোকার প্রশ্নই ওঠে না, মোটা শিকের গরাদ।

ঘুরতে ঘুরতে বাড়িটার বামপাশে চলে এল রানা। সমস্ত মনোযোগ দোতলার জানালাগুলোর দিকে। দোতলার জানালায় নিশ্চয়ই গরাদ দেয়া নেই। গরাদ হয়তো নেই, কিন্তু একটা জানালাও খোলা পেল না সে। আবার ফিরে পিছন দিকে চলে এল। একটা জানালার সামান্য এক চিলতে ফাঁক দেখা গিয়েছিল, সেটাই ভালমত পরীক্ষা করল সে। এবার। ফাঁকটা এক ইঞ্চির বেশি না। বাটালীর সাহায্যে খোলা অসম্ভব নাও হতে পারে মনে করে পিছনের দেয়ালটা পরীক্ষা করল সে। একটা পাইপ বা কার্নিস নেই যার সাহায্যে ওপরে ওঠা যায়। গজ বিশেক দূরে গাছের নিচে একটা টিনের শেড দেখা যাচ্ছে। খুব সম্ভব গুদাম ঘর, কিংবা বাগানের মালীর স্টোররুম। দ্রুতপায়ে সেইদিকেই এগোল রানা।

এদিকে দেয়ালের বাইরে অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করেছে মাইকেল হ্যামার। দৃষ্টিটা বার বার গিয়ে পড়ছে রশিটার উপর। কি করছে রানা? কোনও বিপদে পড়ল? একবার রশি বেয়ে উপরে উঠে উঁকি দিয়ে দেখে এসেছে, কিছুই দেখা যায়নি। নানান ধরনের উৎকট দুশ্চিন্তা এসে ভর করতে চাইছে তার মনে। অনিশ্চয়তার অত্যাচার আর সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। হাওয়ায় উড়ে গেল রানার নির্দেশ। রশি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল বৃদ্ধ।

ততক্ষণে লম্বা একটা মই লাগিয়ে জানালার কাছে পৌঁছে গেছে রানা। জানালাটা ভাল করে পরীক্ষা করল সে কাছে থেকে টর্চ জেলে। মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ইচ্ছে করেই খোলা রাখা হয়েছে জানালাটা। জানালার ফ্রেমের সাথে লাগানো রয়েছে ইলেকট্রিক

তার। দুটো তার দু'দিকে। ব্যাগ থেকে প্লায়ার্সটা বের করে তার দুটো কেটে দিল রানা। জানালাটা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

প্রেতাত্মার মত নিঃশব্দে পুরো দোতলাটা ঘুরে দেখল রানা। দুই মিনিটের মধ্যেই নিশ্চিত হলো, কেউ নেই দোতলায়। বাম হাতে নেভানো টর্চ আর ডান হাতে সাইলেন্সার ফিট করা ল্যুগার নিয়ে হালকা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সে নিচের হলরুমে। একটা কম পাওয়ারের বালব জ্বলছে এ ঘরে। সামনেই একটা ঘরের প্রায়-বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে, কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। নারী কণ্ঠে হাসির শব্দ এল। নিচতলার অন্যান্য ঘরগুলো আগে দেখে নেয়া স্থির করল রানা, তারপর দেখা যাবে কি করা যায়। সবকটা ঘরে উঁকি দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো সে, ওই একটি ঘর ছাড়া আর কোথাও কেউ নেই। রান্নাঘরে পাওয়া গেল বেসমেন্টে যাওয়ার সিঁড়ি। টর্চ জ্বেলে নেমে এল রানা নিচে। তলকুঠুরির চার দেয়ালে চারটে দরজা। তিনটে দরজা দেখতে সাধারণ দরজার মতই, কিন্তু চতুর্থটায় মোটা দুটো বল্টু দেখে সেদিকেই এগোল সে। বড়সড় একটা চাবি লাগানো রয়েছে কী-হোলে। বল্টু খুলে চাবি ঘুরাল রানা, ভিতরে ঢুকে টিপে দিল বাতির সুইচ।

প্রথম দর্শনেই রানার মনে হলো ঘরটা আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সুসজ্জিত একটা ল্যাবরেটরি। পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা অনেকগুলো অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র দেখে এগিয়ে গেল সে সেইদিকে। একটা পাত্রের ঢাকনি সরিয়ে দেখা গেল সাদা পাউডারের মত কি যেন রয়েছে তাতে। নাকের কাছে নিয়ে শুঁকে দেখল সে জিনিসটা, চট করে নামিয়ে রেখে ঢেকে দিল আবার ঢাকনি দিয়ে। নাক-মুখ কুঞ্চিত হয়ে গেছে ওর।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় রানার চোখ গেল একটা টেলিফোনের দিকে। ডায়ালের দিকে এক নজর চেয়েই টের পেল, এক্সটার্নাল এক্সচেঞ্জ। রিসিভারটা কানে খুলে ডায়াল টোন শুনল, ডায়াল করবে কি করবে না সে ব্যাপারে দ্বিধা করল তিন সেকেন্ড, তারপর রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

রানা যখন তলকুঠুরির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে, মাইকেল হ্যামার তখন হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে একটা ঝোপের ঘন ছায়ায়। যেখানটায় বসে আছে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে বাড়ির একটা পাশ আর পিছন দিকটা। হঠাৎ দেখা গেল একজন শক্ত সমর্থ চেহারার লোক এগিয়ে আসছে সামনের দিক থেকে এই দিকে। কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারল না হ্যামার কয়েক সেকেন্ড। লোকটা আর কিছুদূর এগোলেই দেখতে পাবে দেয়ালের গায়ে ঠেকানো মইটা। খুব সম্ভব ওই মই বেয়েই বাড়ির ভিতর ঢুকেছে রানা জানালা গলে। মইটা নামিয়ে রাখতে পারলে সবচেয়ে ভাল হত, কিন্তু এখন সে চেষ্টা করা বৃথা। ঝোপের আড়াল ছেড়ে বেরোলেই ধরা পড়ে যাবে সে লোকটার চোখে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে লোকটার দিকে।

সিঁড়িটার উপর চোখ পড়তেই মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল

লোকটা। তিন সেকেন্ড। তারপর দৌড় দিল সদর দরজার দিকে। যেন যাদুমন্ত্রের বলে দুই হাতে দুটো জিনিস বেরিয়ে এসেছে ওর—বাম হাতে বড় আকৃতির একটা চাবি, ডান হাতে একহাত লম্বা এক ভোজালি।

হলরুমে এসে দাঁড়াল রানা ভিড়ানো দরজাটার সামনে। টর্চটা পকেটে পুরে প্রস্তুত হলো। কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে বেশ কয়েকজন লোক রয়েছে ঘরে, মেয়েলোক রয়েছে অন্তত একজন। প্রথমেই যদি ভড়কে না দেয়া যায় তাহলে মুশকিল হবে ওদের আয়ত্তে আনা। দ্রুত দু'পা এগিয়ে দড়াম করে প্রচণ্ড এক লাথি মারল সে দরজার গায়ে। এতই জোরে মারল যে, নিচের দুটো কব্জা থেকে খসে বেরিয়ে গেল দরজাটা, লটকে রইল শুধু উপরের কব্জায় আটকে। ঘরে ঢুকল রানা।

ঘরের মধ্যে মোট পাঁচজন। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সবাই একসাথে। দু'জন একই চেহারার লোক—যতদূর সম্ভব যমজ ভাই, শক্ত সমর্থ চেহারা, খয়েরী চোখ, কালো চুল, পরনে দামী স্যুট, চকচকে পালিশ করা জুতো, একনজরেই বোঝা যায় অত্যন্ত বড়লোক দুই ভাই। এদের পাশের চেয়ারে বসে ছিল স্বর্ণকেশী অপূর্ব সুন্দরী এক রমণী, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে রানার দিকে। তার পাশে মার্কাস কাপলান। রানা আশা করেছিল রুডলফ গুন্থারকে দেখবে এখানে, কিন্তু সে নেই, পাওয়া গেল তার চ্যালা টমাস মুলারকে।

'হাত তোলো সবাই!' গর্জে উঠল রানা।

পাঁচজনই হাত তুলল মাথার উপর। পিস্তল দিয়ে আরও উপরে হাত তুলবার জন্যে ইঙ্গিত করল রানা। আরও উপরে তুলল সবাই।

'এসবের কি মানে, রেনার?' কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করতে চেয়েছিল কাপলান, কিন্তু ভয়ে বুজে এল ওর গলা। 'আমি বেড়াতে এসেছি এখানে···বন্ধুদের সাথে···'

'চোপরাও!' ধমক মারল রানা। 'কোর্টে দাঁড়িয়ে ওসব শুনিয়ো, কাপলান। আর একটা কথা···'

'সাবধান!' দূর থেকে ভেসে এল মাইকেল হ্যামারের কণ্ঠস্বর।

মুহূর্তে পাঁই করে ঘুরল রানা, এবং গুলি করল। এত দ্রুত যে, একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল পিছনের লোকটা। ভোজালিটা তরবারির মত করে ধরে সাঁই করে নামিয়ে আনতে যাচ্ছিল রানার ঘাড় লক্ষ্য করে, চেঁচিয়ে উঠল তীব্র যন্ত্রণায়, চুর হয়ে যাওয়া কজির দিকে চেয়ে রয়েছে সে অবিশ্বাস মাখা দৃষ্টিতে। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে ঝট করে ফিরল রানা আবার পাঁচজনের দিকে। ভোজালিটা হাত থেকে খসে কোথায় পড়ল সেটা দেখবারও প্রয়োজন বোধ করল না। এদিক ফিরেই দেখতে পেল রানা যমজ দুই ভাই এবং টমাস—তিনজনেরই হাত চলে গেছে শোলডার হোলস্টারের কাছে।

'বের করো,' বলল রানা। 'যার সাহস আছে, বের করো পিস্তল।'

কোটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল তিনজনেরই খালি হাত। আবার

মাথার উপর চলে গেল হাতগুলো। কয়েক পা সরে গেল রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে আহত লোকটাকে ইঙ্গিত করল আর সবার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে। যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে লোকটা। বাম হাতে ডান হাতের কব্জি চেপে ধরে আদেশ পালন করল সে। এমনি সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল মাইকেল হ্যামার।

'থ্যাংকিউ, মিস্টার হ্যামার,' বলল রানা। 'কথা না শোনার অপরাধ মাফ করে দিলাম। আমার ব্যাগ থেকে ফার্স্ট-এইড বক্সটা বের করুন।' স্বর্ণকেশীর দিকে চাইল রানা। 'এদিকে এসো তুমি। হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি।' পায়ে পায়ে এগিয়ে এল মেয়েটা। 'নার্সের অভিনয় জানা আছে তোমার, কিন্তু নার্সিংটা জানা আছে কিনা দেখা যাক এবার। অভিনয়ের ঠেলাতেই বেরিয়ে গেছে হারম্যানের প্রাণ, আসল নার্সিং-এ এই ব্যাটার কি হয় দেখা যাক। এই যে ফার্স্ট-এইড বক্স। ওর হাত বেঁধে দাও।'

থুথু ছিটাল মেয়েটা রানার দিকে। বলল, 'নিজে বেঁধে নাও, হারামজাদা...'

সতর্ক হওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ দিল না রানা। ঝট করে এগিয়ে এল সে এক পা, পিস্তল দিয়ে ধাঁই করে মারল মেয়েটার নাক-মুখের উপর। চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, পিছিয়ে গেল এক পা, হাঁটু ভাঁজ হয়ে বসে পড়ল মেঝেতে, ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে চিবুক বেয়ে।

'হায় খোদা!' চেঁচিয়ে উঠল মাইকেল হ্যামার। 'কি করছ তুমি, রানা!'

'ঠিকই করছি, মিস্টার হ্যামার। করুণা জিনিসটা সবার প্রাপ্য নয়। খুনী একটা মেয়েলোককে এর বেশি দয়া দেখাতে পারব না আমি।' মেয়েটার পাঁজর লক্ষ্য করে লাথি তুলল। 'উঠে দাঁড়াও। নইলে দিলাম। উঠে ওর হাত বেঁধে দাও।' মেয়েটা এক লাফে উঠে দাঁড়াতেই বাকি পাঁজনের দিকে ফিরল রানা। 'উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো সবাই। হাত মাথার পিছনে। মিস্টার হ্যামার, এক এক করে প্রত্যেকের অস্ত্র বের করে নিন। সাবধান, এক চুল যে নড়বে সেই গুলি খাবে মাথার পিছনে। টেরও পাবে না কখন মারা গেছ।'

চারটে পিস্তল বের করা হলো ওদের কাছ থেকে। দুই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে মাইকেল হ্যামারের।

'সর্বনাশ! প্রত্যেকের কাছেই পিস্তল! কাপলানের কাছেও!'

'অবাক হবেন পরে,' বলল রানা, 'এখন দড়ি বের করুন ক্যানভাস ব্যাগ থেকে। সব ক'টার হাত বেঁধে ফেলুন শক্ত করে। রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার ভয় পাবেন না, কষে বাঁধুন! গিঠ দিন যত খুশি।'

একে একে সব ক'জনের হাত বেঁধে ফেলা হলো পিছমোড়া করে। কব্জিতে গুলি খাওয়া লোকটার হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে যেতেই তারও হাত বাঁধবার হুকুম দিল রানা। তারপর মেয়েটিরও।

কাপলানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'গেটের চাবি কোথায়?'

বিষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কাপলান রানার চোখের দিকে, জবাব দিল না। নিষ্ঠুর হাসি হাসল রানা। পিস্তলটা পকেটে ফেলে তুলে নিল ভোজালিটা।

তীক্ষ্ণ ডগাটা ঠেকাল কাপলানের গলায়, আস্তে একটা খোঁচা দিয়ে শুধু চামড়াটা ভেদ করে ধরে রাখল সেই জায়গায়।

'তিন পর্যন্ত গুনব আমি, তারপর ঠেলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেব এটা এফোঁড়-ওফোঁড়। এক···দুই···'

'হল ঘরের টেবিলের ড্রয়ারে।' ছাই বর্ণ ধারণ করেছে কাপলানের মুখ।

'উঠে দাঁড়াও এবার,' হুকুম করল রানা। 'সবাই। সেলারে চলো।'

ভীত সন্ত্রস্ত মুখে সিঁড়ি বেয়ে তলকুঠুরিতে নামছে সবাই। সার বেঁধে। ভয় পেয়েছে প্রত্যেকে। এতই ভয় পেয়েছে যে ছয়জনের মধ্যে শেষের জন, যমজ ভাইয়ের একটা, দিশে হারিয়ে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল রানাকে। উদ্দেশ্যটা ছিল রানা পড়ে গেলেই পা দিয়ে মাড়িয়ে দম বের করে দেয়ার চেষ্টা করবে, কিন্তু হলরূমে রানার আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা দেখবার পরেও কাজটা উচিত হয়নি বেচারার। বিদ্যুৎবেগে সরে গিয়ে দড়াম করে পিস্তলের বাঁট দিয়ে মারল রানা লোকটার নাকের উপর। সিঁড়ির অর্ধেক পর্যন্ত হুড়মুড় করে নেমে গেল লোকটা জ্ঞান হারিয়ে গড়াতে গড়াতে, বাকি অর্ধেক নামিয়ে আনল ওকে রানা একটা পা ধরে টেনে। প্রত্যেকটা ধাপে ঠাস্ ঠাস্ করে বাড়ি খাচ্ছে মাথাটা।

চেঁচিয়ে উঠল জ্ঞানহীন লোকটার ভাই। 'মারা যাবে তো! মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার, মাসুদ রানা!'

কটমট করে ওর চোখের দিকে চাইল রানা, কোন কথা বলল না। একই ভাবে পা ধরে ছেঁচড়ে টেনে নামিয়ে আনল লোকটাকে নিচে, টেনে ঘরের মাঝ বরাবর এনে ছেড়ে দিল পা। আবার চাইল দ্বিতীয় ভাইয়ের দিকে।

'মরে গেলে খুব বেশি ক্ষতি হবে দুনিয়ার? তাছাড়া যা মনে হচ্ছে, আমার হাতে তোদের সব ক'টারই মরণ আছে আজ। কিন্তু আগের কাজ আগে।' ফিরল টমাস মুলারের দিকে। 'মনে পড়ে, অস্ট্রিয়ায় তুমি আমার গায়ে হাত তুলেছিলে? বেশি কিছু না, পাঁজরের উপর কনুইয়ের একটা গুঁতো, আর মাজার উপর একটা লাথি। সেই পাওনাটা চুকিয়ে দেয়া যাক আগে।'

কথাটা শেষ হওয়ার সাথেই আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সাথে প্রচণ্ড এক গুঁতো মারল রানা টমাসের পাঁজরে। কড়াৎ শব্দ তুলে ভেঙে গেল পাঁজরের দুটো হাড়। পরমুহূর্তে কোমরের উপর প্রবল এক লাথি খেয়ে আছড়ে গিয়ে পড়ল লোকটা ওপাশের দেয়ালে। কয়েক সেকেন্ড মনে হলো আঠা দিয়ে সাঁটিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে দেয়ালের সাথে, তারপর ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ল টমাস দেয়াল ঘেঁষে। জ্ঞান হারিয়েছে আগেই।

রানার এই ভয়ঙ্কর নির্দয় রূপ দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল ঘরের সব ক'জন। বিশেষ করে মাইকেল হ্যামারের চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে কোটর ছেড়ে। কটমট করে সব ক'জনের মুখের দিকে চাইল রানা।

'শুয়ে পড়ো সবাই উপুড় হয়ে।'

কথাটা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শুয়ে পড়ল চারজন। ঘাবড়ে গিয়ে হ্যামারও শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল, রানার ধমক খেয়ে সোজা হয়ে গেল।

'আপনি শুচ্ছেন কেন? বাঁধবে কে তাহলে? ওদের পাগুলো একসাথে করে বেঁধে ফেলুন ঝটপট। খুব শক্ত করে, প্লীজ।'

জ্ঞানহীন দেহ দুটো টেনে চারজনের পাশে শুইয়ে দিল রানা। হঠাৎ নম্র ভদ্র, বিনয়ী ছেলেটার আশ্চর্য উগ্র মূর্তি দেখে একেবারে ভড়কে গেছে মাইকেল হ্যামার। হাঁটু গেড়ে বসে পা বাঁধায় মন দিল সে। বাঁধা শেষ হতেই আবার হুকুম এল, 'ওদের সব কটার পকেট থেকে পরিচয়পত্র বের করুন। কাপলানেরটা দরকার নেই, ওকে ভাল করেই চিনি আমরা।'

একটা চেয়ারে বসে পড়ল রানা। একবস্তা কাগজপত্র বের করে এনে রানার হাতে দিল হ্যামার। বলল, 'কিন্তু ওই ভদ্রমহিলা? ওর কাছে কোন কাগজপত্র নেই।'

'ভদ্রমহিলা? ও, এর কথা বলছেন? এখনও আপনার ঘোর কাটেনি দেখছি! জানেন, কাল দুপুরে একজন দাগী আসামীকে বিষ খাইয়ে খুন করার দায়ে পুলিস খুঁজছে ওকে?' মেয়েটার দিকে চেয়ে হাঁক ছাড়ল রানা, 'হ্যান্ডব্যাগটা কোথায়?'

'আমার হ্যান্ডব্যাগ নেই।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মেয়েটার পাশে চলে এল রানা। হাঁটু মুড়ে বসল পাশে। ভোজালিটা বের করে নাড়াচাড়া করল ওর চোখের সামনে। 'মুখটাই মেয়েদের আসল। আর সব জায়গা সব মেয়ের কমবেশি একই রকম। কাজেই মুখটাই খতম করে দেয়া যাক। শোনো সুন্দরী, এক মিনিট পর তোমার চেহারাটা আর দর্শনযোগ্য থাকবে না, চিরে ফালা ফালা করে দেব। জীবনে আর কোন পুরুষ মানুষ ফিরেও চাইবে না তোমার দিকে। অবশ্য এমনিতেও পুরুষ মানুষের দেখা পেতে কয়েক বছর দেরি আছে তোমার। গ্লাসের গায়ে তোমার আঙুলের ছাপ আছে, তার ওপর চারজন পুলিস সাক্ষ্য দেবে যে, তুমিই সায়ানাইড পিল রেখে এসেছিলে হারম্যানের মাথার পাশে টেবিলে—তুমি শেষ হয়ে গেছ এমনিতেই।' ভোজালিটা তুলল রানা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। 'কোথায় হ্যান্ডব্যাগ?'

'আমার ঘরে!' কাঁপা গলায় বলল মেয়েটা। ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে গেছে ওর মুখ।

'কোন ঘরে? কোথায়?'

'দোতলায়, করিডরের শেষ মাথার ঘর। ড্রেসিংটেবিলের ওপর।'

উঠে গিয়ে চেয়ারে বসল রানা আবার। চাইল মাইকেল হ্যামারের দিকে। 'দয়া করে নিয়ে আসবেন ওটা? আমি ততক্ষণে এগুলো দেখে ফেলি। হলরুমের টেবিলে রাখা পিস্তলগুলোও নিয়ে আসবেন সাথে করে।'

'ঠিক আছে। আনছি।' সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল হ্যামার।

মিনিট খানেক চুপচাপ দেখল রানা কাগজগুলো। পাসপোর্টের এন্ট্রিগুলো

পরীক্ষা করল। তারপর হাসল।

'বাহ্! যিমার অ্যান্ড যিমার! মনে হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত কোন আইন বিশেষজ্ঞের কোম্পানী। আসলে কর্সিকার বেআইন বিশেষজ্ঞ। তোমাদের নাম শুনেছি আমি। পুলিসও নিশ্চয়ই শুনেছে। আকাশের চাঁদ হাতে পাবে ওরা আজ। তোমাদের মত পাজির-পা-ঝাড়া যে এই বাড়িতে এমন বেকায়দা মত ধরা পড়ে যাবে সেটা শুধু তোমরা কেন, আমিও কল্পনা করতে পারিনি। অবশ্য সাদা পাউডার দেখে আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল আমার যে, এর মধ্যে তোমরা দুই শ্রীমান রয়েছ।' কথা বলতে বলতে ফার্স্ট এইড বক্স থেকে ইলাস্টোপ্লাস্ট বের করে টেনে হাত খানেক টেপ বের করল ওর থেকে, ক্ষুরধার ভোজালি দিয়ে কেটে টুকরোটা সাঁটাল হালকা করে চেয়ারের হাতলে। 'এটা কি কাজে ব্যবহার হবে টের পেলে এখুনি হার্টফেল করবে সবাই, তাই এখন বলব না।'

ফিরে এল মাইকেল হ্যামার। বেশ বড়সড় হ্যান্ডব্যাগ ঝুলছে কনুই থেকে, দুই হাতে দুটো করে চারটে পিস্তল। ব্যাগ ঘেঁটে পাসপোর্টটা বের করে আনল রানা, তারপর একটা সাইড পকেটের যিপ খুলে বের করে আনল ছোট্ট একটা পয়েন্ট টু-ফাইভ এ্যাস্ট্রা পিস্তল।

'এই দেখুন, আপনার ভদ্রমহিলা অ্যানি লরেলির আসল চেহারা দেখা যাচ্ছে কিছুটা?'

সবক'টা পিস্তল পুরল রানা ক্যানভাস ব্যাগে, কাগজপত্রগুলোও ঢুকিয়ে দিল একটা সাইড পকেটে। তারপর ফার্স্ট-এইড বক্স থেকে একটা ছোট্ট নীল শিশি বের করল। মুখ খুলে হাতের তালুতে ঢালল গোটা কয়েক সাদা ট্যাবলেট।

'বাহ্!' খুশি হয়ে উঠল রানা। 'কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেছে হিসেব। ঠিক ছয়টা আছে। ছয়জনের জন্যে ছয়টা।' নিজের মনে কথাগুলো বলে বন্দীদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'আমি জানতে চাই কোথায় আটকে রাখা হয়েছে মিসেস এলিনা হ্যামারকে। আমার হাতে সময় নেই। দুই মিনিটের মধ্যে কথা আদায় করব আমি। মিস ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল নিশ্চয়ই টের পাচ্ছেন আমার হাতের জিনিসগুলো কি?'

অ্যানি লরেলির চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওর বয়স বেড়ে গেছে কয়েক বছর। কোন কথা না বলে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে রানার দিকে। নীল হয়ে গেছে আতঙ্কে।

'কি ওগুলো, রানা!' অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করল মাইকেল হ্যামার।

সবাই যাতে শুনতে পায় এমনি স্বরে, কিন্তু নিচু গলায় রানা বলল, 'সুগার কোটেড সায়ানাইড। দেখবেন, আসলে কোন কষ্টই হবে না। মিনিট তিনেক লাগবে গলতে।'

'অসম্ভব!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মাইকেল হ্যামার। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রানার কথা শুনে। 'এ কাজ করতে পারো না তুমি রানা! অসম্ভব! এটা

তো খুন!'

'খুন করবার অধিকার কি শুধু ওদেরই রয়েছে? ওরা যা খুশি করবে সেটা সহ্য করতে হবে সাধারণ মানুষকে? কি অধিকার আছে ওদের আপনার স্ত্রীকে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে আটকে রাখার? তাছাড়া এটাকে খুন বলি না আমি। মশা, মাছি যেভাবে মেরে ফেলা হয়, পাগলা কুকুরকে যেভাবে মারা হয়, সেই রকম। এরা মানুষ হলে মশা, মাছি আর পাগলা কুকুরের সাথে তুলনা করতাম না। জানোয়ারেরও অধম এরা। বিশ্বাস না হয় পাশের ঘরে একটু উঁকি দিয়ে দেখে আসুন। কি তৈরি হচ্ছে ওখানে? জানেন? হেরোইন। ভেবে দেখুন কত হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে ওরা ওই বিষ দিয়ে, সর্বনাশ করছে কত হাজার পরিবারের। নরকের কীটকে পা দিয়ে মাড়িয়ে শেষ করে দিলে পাপ হয় না।'

রানার বক্তৃতায় হতভম্ব হয়ে গেল মাইকেল হ্যামার। কোন কথা খুজে না পেয়ে ঢোক গিলিল বার কয়েক, মাথা নাড়ল, কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছে না সে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড।

টমাস জ্ঞান ফিরে পায়নি এখনও, কিন্তু যমজ যিমার জ্ঞান ফিরে পেয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগেই। পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল ওরা। ঘেমে উঠেছে সবাই। ঠোঁট চাটল কাপলান। সবাই বুঝে গেছে যা বলছে তাই করবে রানা। রানা যে কি পরিমাণ নির্মম দুর্ধর্ষ লোক সেটা টের পেয়ে গেছে ওরা ইতোমধ্যেই। টমাসের পাঁজর ভেঙে দেয়া দেখেই নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশা এসে গিয়েছিল ওদের মধ্যে, এইবার একেবারে হাল ছেড়ে দিল। বদ্ধ উন্মাদের পাল্লায় পড়েছে ওরা। হিম হয়ে গেছে বুকের ভিতরটা।

এক হাতে ট্যাবলেট, অপর হাতে পিস্তল নিয়ে কাপলানের পাশে বসে পড়ল রানা হাঁটু গেড়ে। পাঁজরের উপর একটা গুঁতো খেয়ে হাঁ হয়ে গেল কাপলানের মুখটা। চট করে পিস্তলের সাইলেন্সারটা ঢুকিয়ে দিল রানা ওর মুখের মধ্যে। দাঁত চেপে মুখ বন্ধ করবার আর উপায় থাকল না। বাম হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে ট্যাবলেটটা ধরে নিয়ে এল মুখের কাছে।

'মিসেস এলিনা হ্যামার কোথায়?' পিস্তলটা বের করে আনল রানা প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেই।

আতঙ্কে ফোঁপাচ্ছে কাপলান। তোতলাতে শুরু করল, 'ব্যা-ব্যা-ব্যান্ডল, ব্যান্ডল। ই-ই-ইয়টে।'

'কি রকম ইয়ট? কোথায়?'

'ঘাটের কাছেই। পাঁচশো গজ। মোটর ইয়ট। পঞ্চাশ ফুট লম্বা। নী-নীল, ওপরটা সাদা। নাম: দি এইস।'

মাইকেল হ্যামারের দিকে চাইল রানা। 'ওই টেপটা নিয়ে আসুন এখানে। জলদি।' কথাটা বলেই আবার একটা গুঁতো মারল সে কাপলানের পাঁজরে। মুখটা হাঁ হতেই আবার ঢুকে গেল সাইলেন্সারটা ওর দাঁতের ফাঁকে। ট্যাবলেটটা টপ করে ছেড়ে দিল রানা ওর মুখের মধ্যে। 'তোমার

একটা কথাও বিশ্বাস করি না আমি!' টেপ দিয়ে ঠোঁট দুটো আটকে দিল সে কাপলানের। নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলল, 'থুক করে যে সায়ানাইড ট্যাবলেট ফেলে দেবে সে উপায় রইল না।'

আরেকটা ট্যাবলেট হাতে নিয়ে হাঁটু মুড়ে বসল রানা অক্ষত যমজ ভাইয়ের পাশে। কাপলানকে যেভাবে জিজ্ঞেস করেছিল ঠিক সেই একই সুরে জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস এলিনা হ্যামার কোথায়?'

হাউমাউ করে উঠল লোকটা। আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, 'মাথা খারাপ তোমার! খোদার কসম, সত্যি কথাই বলেছিল মার্কাস। দি এইস। ব্যান্ডল! নীল আর সাদা। আপন গড! পাঁচশো না, চারশো গজ দূরে নোঙর ফেলা। সত্যি বলছি।'

ভ্রূ কুঁচকে দশ সেকেন্ড চাইল রানা লোকটার আতঙ্কিত রক্তশূন্য মুখের দিকে, চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলে নিয়ে ডায়াল করল পুলিস-ইমার্জেন্সির নাম্বারে। একবার রিং হতেই রিসিভার তুলল ডিউটি অফিসার।

'রিউ জর্জেস স্যান্ডের লাভ লজ থেকে বলছি,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। এ বাড়ির তলকুঠুরিতে কয়েক কোটি টাকার হেরোইন পাবেন। হেরোইন তৈরি করবার যন্ত্রপাতিও পাবেন। পাশের ঘরে পাবেন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ছয়জন লোককে। এরা হেরোইন তৈরি এবং পাচার করবার ব্যাপারে জড়িত। এদের মধ্যে দু'জন হচ্ছে যিমার যমজ ভাই। এদের নাম বহুবার শুনেছেন, কিন্তু ধরতে পারেননি। আর একজন হচ্ছে অ্যানি লরেলি—একে আপনারা খুঁজছেন ফ্রিজ হারম্যানকে খুন করবার দায়ে। এদের প্রত্যেকের পরিচয়পত্র নিয়ে যাচ্ছি আমি, আজ রাতেই পৌঁছে দেব আপনাদের হাতে।' ওপাশ থেকে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, একরাশ কথা বলতে শুরু করছে ডিউটি অফিসার। হেসে উঠল রানা। 'আমাকে দেরি করাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, অফিসার। আমার বক্তব্য রিপিট করবারও কোন প্রয়োজন নেই। আমি জানি, প্রত্যেকটা ইমার্জেন্সী কল টেপ রেকর্ড করা হয়। আবোল-তাবোল বকে আপনাদের লোক না পৌঁছানো পর্যন্ত দেরি করতে পারবেন না আমাকে। আমার অন্য কাজ আছে, চললাম।'

এপাশের ঘরে ফিরে এসেই মুখোমুখি হলো রানা হ্যামারের। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কাপলানের দিকে চেয়ে চট করে রানার হাত ধরল। 'কথা তো আদায় করা হয়ে গেছে। তিন মিনিট পার হয়নি এখনও। কাপলানের মুখ থেকে ট্যাবলেটটা বের করে ফেলতে পারো। পুলিস যখন আসছে…'

'ও, এই কথা?' নীল শিশিটার মধ্যে একে একে চারটে ট্যাবলেট ভরল রানা। একটা দু'আঙুলে ধরে হ্যামারের চোখের সামনে ধরল। 'এর মধ্যে আছে পাঁচ গ্রেন বিশুদ্ধ এসেটিল স্যালিসিলিক অ্যাসিড। অর্থাৎ অ্যাসপিরিন। সেজন্যেই ওর মুখটা টেপ দিয়ে আটকে দিয়েছিলাম, যাতে বন্ধুদের বলে না দিতে পারে যে আসলে অ্যাসপিরিন খাওয়ানো হয়েছে ওকে। অ্যাসপিরিনের

স্বাদ চেনে না এমন সাদা চামড়ার লোক খুব কমই আছে। চেয়ে দেখুন, রাগ প্রকাশ পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আতঙ্ক কি রয়েছে ওর চেহারায়? সব ক'টা হারামীর চেহারায় দেখুন আতঙ্কের পরিবর্তে রাগের আভাস দেখা যাচ্ছে। ঠকে গিয়ে রেগে গেছে। ক্যানভাস ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল রানা। 'চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক। দেরি করলে আবার পুলিসের খপ্পরে পড়তে হবে।'

বেরিয়ে এল ওরা। দরজা লাগিয়ে দিল বাইরে থেকে। হলঘরের টেবিলের ড্রয়ার থেকে গেটের চাবি নিয়ে ছুটল গেটের দিকে। গেট দিয়ে বেরিয়ে গজ পঞ্চাশেক দূরে একটা গাছের নিচে অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইল।

'কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আমাদের?' জানতে চাইল হ্যামার।

'যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছি ঠিক লোকই প্রথমে এসে পৌঁছুচ্ছে।

আধমিনিটের মধ্যেই সাইরেন শোনা গেল পুলিসের গাড়ির। আর আধমিনিট পর পুলিসের দুটো গাড়ি আর ভ্যান ছুটে গেল লাভ লজের দিকে, এত জোরে বাঁক নিল যে, কাঁকর ছিটকে গেল এদিক ওদিক। সাঁ করে ঢুকে গেল ওরা ভিতরে।

পনেরো মিনিট পর লুইগীর ল্যাবরেটরির আর্মচেয়ারে বসে এক কাপ গরম কফি খাচ্ছে রানা, নিচে গাড়িতে বসে রানার অপেক্ষায় ছটফট করছে মাইকেল হ্যামার। কাগজপত্র থেকে চোখ তুলল লুইগী। বুড়োর ভাঁজ খাওয়া মুখে হাসি ফুটল। লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

'আশ্চর্য জীবন আপনার, মিস্টার মরিস রেনার। যেমন রেসট্র্যাকে, তেমনি এই ধরনের কাজে। আপনার সমকক্ষ পাওয়া মুশকিল। বিরাট উপকার করেছেন আপনি আমাদের। এই দু'জন সত্যিই দুর্ধর্ষ যিমার অ্যান্ড যিমার। অনেক চেষ্টা করেও আমরা এদের টিকিরও নাগাল পাইনি এতদিন। ঠিকই ধরেছেন আপনি, লোকে এদের সিসিলির লোক মনে করে, মাফিয়া বলে ভুল করে, আসলে এরা কর্সিকান। মাফিয়োসার চেয়েও ভয়ঙ্কর। এবার বাগে পেয়েছি আমরা ওদের। হ্যানসিঙ্গার আর কাপলানের সেই কোড শেষ পর্যন্ত ব্রেক করেছে জাঁ কার্লো। এই সব ঠিকানাতেই হেরোইন পৌঁছে দেয়ার বন্দোবস্ত ছিল। আপনার ইঙ্গিত পেলেই অ্যারেস্ট হয়ে যাবে সব ক'জন।'

'ভেরি গুড। মিস্টার কার্টারেটের সাথে আমার কিছু কথা বলা দরকার। যোগাযোগ করা সম্ভব হবে এখন?'

'একশোবার। দিচ্ছি কানেকশন। এক মিনিট।'

ডজন খানেক সশস্ত্র পুলিস দিয়ে ঘেরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কাপলান ও তার পাঁচ সঙ্গী থানায়, টেবিলের ওপাশে বসা সার্জেন্টের সামনে। খবর পেয়ে বড় বড় অফিসার আসছে থানায়, তারা এসে পৌঁছলে উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে বন্দীদের। মোটামুটি একটা খসড়া চার্জশীট তৈরি করছে সার্জেন্ট ভোঁতা পেন্সিল দিয়ে ঘষে। সামনে ঝুঁকে সার্জেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করল কাপলান।

'আমার বিরুদ্ধে চার্জ তৈরি করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে আমি আমার

উকিলের সাথে যোগাযোগ করতে চাই। আপনাদের কাছে কোন কথা বলবার আগে উকিলের পরামর্শ গ্রহণ করবার অধিকার আছে আমার।'

'কারও কোন পরামর্শে খুব একটা কাজ হবে কি?' বাঁকা চোখে চাইল সার্জেন্ট কাপলানের দিকে। ডেস্কের উপর রাখা ফোনের দিকে ইশারা করল, 'ঠিক আছে, করুন পরামর্শ।'

পাশের একটা ফোন বুদের দিকে বুড়ো আঙুল দিয়ে ইশারা করল কাপলান। 'ওটা রাখা হয়েছে যাতে আসামীরা উকিলের সাথে কি কথা বলছে সেটা গোপন থাকে। আমার আলাপটা ব্যক্তিগত। ওটা ব্যবহার করতে পারি?'

'পারেন।' বলল সার্জেন্ট। দু'জন সেপাইয়ের দিকে চাইল। 'তোমরা দু'জন থাকো দরজার বাইরে।'

ফোন বুদের দিকে এগিয়ে গেল কাপলান।

থানা থেকে সিকি মাইল দূরের একটা দামী আসবাবপত্রে সুসজ্জিত বিলাসী ফ্ল্যাটে বেজে উঠল টেলিফোন। কাপলানের ঘর। আজ রাত্রির জন্যে ধার নিয়েছে হ্যানসিঙ্গার। অর্ধ-উলঙ্গ সঙ্গিনীকে বুকের উপর টেনে নিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট রাখতে যাচ্ছিল, টেলিফোনের কর্কশ শব্দে মুখ বিকৃত করল সে, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল রিসিভারটা কানে। কে ফোন করেছে জেনেই রেগে গেল।

'দেখো কাপলান, কাজের সময় যদি এভাবে বিরক্ত করো তাহলে তো মহা মুশকিলের কথা। তোমার ফ্ল্যাটটা ধার নিয়েছি বলে যে যখন তখন কাজের ব্যাঘাত…'

চাবুকের মত ভেসে এল কাপলানের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

'তুমি একা?'

'না। একা থাকার তো কথা ছিল না।'

'তাহলে একা হও। জরুরী কথা আছে।'

কাপলানের কণ্ঠস্বর শুনে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল হ্যানসিঙ্গারের। ড্রেসিং রুমের দিকে ইঙ্গিত করল।

'ডার্লিং, প্লীজ যাও তো, পাশের ঘর থেকে আর একটু পাউডার মেখে এসো।'

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সুন্দরী, মাথার উপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল আলস্য ভরে, তারপর পিছন দিকে ভূমধ্যসাগরের ঢেউ তুলে চলে গেল পাশের ঘরে। মেয়েটা চলে যেতেই চাপা গলায় বলল হ্যানসিঙ্গার, 'বলো।'

'ভাগ্যিস আজ ব্যস্ত ছিলে কাজে। মেয়েটাকে হাজার ধন্যবাদ জানিয়ে কেটে পড়ো ওখান থেকে। থানা থেকে বলছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই পাঠিয়ে দেয়া হবে আমাদের জেল হাজতে। মন দিয়ে শোনো।' হ্যানসিঙ্গারের মন থেকে উড়ে গেছে সুন্দরীর রূপ-লাবণ্য, সমস্ত মন এখন স্থির হয়েছে ওর কানে এসে। কাপলানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করল ওর মুখটা। ভয় ও রাগের সংমিশ্রণ। ঘটনার বিবরণের পর এল মার্কাস কাপলানের নির্দেশ। 'আমার ওয়ারড্রোবে ওভারকোটের পেছনে পাবে একটা

টেলিস্কোপিক সাইট লাগানো লি এনফিল্ড রাইফেল। ওটা নিয়ে চলে যাও ব্যান্ডলে। ও যদি আগেই ইয়টে পৌঁছে যায়, আর মরিয়েলোর হাত থেকে বেঁচে তীরে ফিরে আসার চেষ্টা করে, ড্রামগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে খতম করে দাও। আর তুমি যদি আগে পৌঁছাও, ইয়টে গিয়ে অপেক্ষা করো ওর জন্যে। কাজ হয়ে গেলেই পানিতে ফেলে দেবে রাইফেলটা। দি এইস-এ এখন কে কে আছে?'

'মরিয়েলো। একা। আর শোনো, মার্কাস, বেশি ঘাবড়িয়ো না। এখনই যোগাযোগ করছি আমি বসের সাথে। কাল নাগাদ জামিন পেয়ে যাবে। ক্রিমিনালের সাথে বন্ধুত্ব বা যোগাযোগ থাকা অপরাধ হতে পারে না। তোমার বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রমাণও নেই ওদের হাতে।'

'সেটা কি বলা যায়, দোস্ত? কি করে নিশ্চিত হচ্ছ যে তুমি নিজে বিপদমুক্ত? হারামী রেনার যখন লাভ লজ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, বসই বা কতটা বিপদমুক্ত কে জানে? ওই বেজন্মার অসাধ্য কিছুই নেই—কতটা কি তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছে সেটা কোর্টে না গেলে বোঝা যাবে না। যাই হোক, আমার যা হবার হবে, এটা এখন আর ঠেকাবার রাস্তা নেই। তুমি আমার হয়ে এই একটা কাজ করো—শেষ করে দাও হারামীকে।'

'এজন্যে অনুরোধের প্রয়োজন নেই, মার্কাস। মহানন্দে করব আমি কাজটা।'

লুইগীর ল্যাবে টেলিফোনের রিসিভার কানে ধরে দাঁড়িয়ে আছে রানা। বলল, 'কাল ভোর পাঁচটায়।...হ্যাঁ। সবক'টাকে একসাথে ধরতে হবে। আগে পরে হলে বানচাল হয়ে যাবে আমাদের সব প্ল্যান-প্রোগ্রাম। ঠিক আছে, আমার একটু তাড়া আছে। মিস্টার লুইগীকে রিসিভারটা দিয়ে আমি রওনা হয়ে যাচ্ছি এখুনি। ওঁর কাছেই সব শুনতে পাবেন। আশা করি আজ রাতেই দেখা করতে পারব আপনার সাথে।'

এগারো

'তোমার কাজটা আসলে কি, রানা? সিক্রেট সার্ভিস বা স্পেশাল এজেন্ট বা ওই জাতীয় কিছু?'

ব্যান্ডেলের পথে ছুটে চলছে ল্যান্সিয়া। পাশ ফিরে হ্যামারের মুখের দিকে চাইল রানা। হাসল। চোখ দুটো সরে গেল রাস্তার দিকে। বলল, 'অনেকটা। কেন বলুন তো?'

'তোমার কাজকর্ম দেখে তাই মনে হচ্ছে। ফিলিপের পরিচয় জানবার পর আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে ব্যাপারটা আমার কাছে।'

'অথচ ফিলিপ কার্টারেটের কাছে ব্যাপারটা এখনও ঘোলাটে রয়ে গেছে।

আমার পরিচয় জানা নেই ওঁর। ওঁর ধারণা, আমি একজন বাঙালী ব্যবসায়ী, গাড়ি চালনায় দারুণ হাত, অথচ নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এক লোক। ওঁর অনুরোধ ঠেলতে না পেরে রাজি হয়েছি সাহায্য করতে।'

'কিন্তু আসলে?'

'আসল ব্যাপারটা বেশ একটু জটিল, এখন নাই বা শুনলেন।'

'কিন্তু তুমি যে তোমার ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলে সেটা তো সত্যি?'

'তা সত্যি। আমি জানতাম না কতটা ভাল গাড়ি চালাই। এজন্যে আমি জুলিয়া আর আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

খানিক চুপ করে থেকে হ্যামার বলল, 'পলের মৃত্যুটা স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে করতে পারেনি জুলিয়া, আমাকেও আভাস দিয়েছিল যে এর মধ্যে চক্রান্ত আছে। তোমাকে ঠিক কি ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে অনুরোধ করেছিল ফিলিপ?'

'রেস-ড্রাইভিং-এর ভেতরে ঢুকে চোখ কান খোলা রাখার অনুরোধ করেছিলেন উনি আমাকে। সবার ওপর নজর রাখবার নির্দেশ ছিল—অন্যান্য গ্র্যান্ডপ্রিক্স ড্রাইভার, মেকানিক, হেলপার, মোটামুটি রেসের সাথে জড়িত সবার ওপর। বিভিন্ন টীমের ম্যানেজার ও মালিকের ওপরও। বেশ কিছুদিন যাবৎ নানান ধরনের ঘাপলা চলছিল গ্র্যান্ডপ্রিক্স রেসিং-এ। যে গাড়ি জিতবার কথা সেটা হেরে বসে থাকছে, যেটা হারবার কথা সেটা জিতছে। অদ্ভুত ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট ঘটছে, ট্র্যাক ছেড়ে অন্যদিকে দৌড় দিচ্ছে গাড়ি, কিন্তু কোন কারণ আবিষ্কার করা যাচ্ছে না। পেট্রল ফুরিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ মাঝপথে। এঞ্জিন ওভার হিটেড হয়ে ফেঁসে যাচ্ছে মাঝপথে। উদ্ভট, বেকায়দা সময়ে অসুখে পড়ছে কোন কোন ড্রাইভার...'

'ঠিক বলেছ,' উত্তেজিত হয়ে উঠল মাইকেল হ্যামার। 'এক্কেবারে ঠিক কথা বলেছ। আমিও লক্ষ করেছি এসব। তুমি বলতে চাও এসব কোন চক্রান্তের ফল?'

'তাই'। আমার আগে কথাটা বলেছিল পল কার্টারেট। সেজন্যে মরতে হয়েছে ওকে। আমাকেও যখন বাগে আনা যাচ্ছিল না, পর পর জিতে চলেছিলাম একের পর এক গ্র্যান্ডপ্রিক্স, ক্লারমন্টফেরান্ড রেসট্র্যাকে আক্রমণ চালিয়েছিল ওরা আমার ওপরেও। নেহায়েত কপাল গুণে বেঁচে গিয়েছিলাম সে যাত্রা।'

'কি করে? মানে, চলন্ত অবস্থায় কি করে হামলা করল তোমার ওপর?'

'দুই ভাবে,' বলল রানা। 'সাসপেনশন স্ট্রাটের সাথে বাঁধা ছিল রেডিও-কনট্রোল্ড এক্সপ্লোসিভ, আর হাইড্রোলিক ব্রেক লাইনের সাথে ব্যবস্থা ছিল কেমিক্যাল-অপারেটেড বম্ব। ব্রেক চাপার সাথে সাথেই ফেটেছে সেটা। সাথে সাথেই রেডিওর সাহায্যে ফাটানো হয়েছে সাসপেনশনের সাথে বাঁধা বোমাটাও। এমন ভাবে সেট করছিল বোমাগুলো, যাতে কোন প্রমাণ না

থাকে। কিন্তু আমি প্রমাণ সংগ্রহ করেছি অন্যভাবে। ব্রনসনের প্রতিটা কাজের ছবি তুলে নিয়েছি আমি মুভি ক্যামেরায়। সেই সন্ধ্যায় সাসপেনশন স্ট্রাট আর ব্রেক লাইনিং বদলি করেছিল ব্রনসন। তারপর গ্যারেজে পৌঁছলেন আপনি আর মিস্টার কার্টারেট। ও জানাল গাড়ির কোনই দোষ ছিল না, দোষ ড্রাইভারের। গার্বারের মৃত্যুর জন্যে দায়ী আমি।'

'আচ্ছা!' বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে বলল হ্যামার। 'এই জন্যেই দুর্ঘটনার পর গাড়ি চেকিঙের সময় একা থাকত ব্রনসন!' হঠাৎ রানার দিকে পাশ ফিরল হ্যামার। 'কিন্তু···কিন্তু তুমি তো সেদিন বেহেড মাতাল! তুমি ছবি তুললে কি করে? আমি আর জেমস, থুড়ি, ফিলিপ···'

'সেদিন আমার কামরায় ঢুকেছিলেন লাথি দিয়ে দরজার ছিটকিনি ভেঙে. আমাকে পাওয়া গিয়েছিল বিছানায়, মদ টেনে বেঘোরে ঘুমাচ্ছি, হাতে তখনও ধরা আছে বোতলটা।'

'অর্থাৎ?' ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল হ্যামারের। 'অভিনয় করেছিলে তুমি? মদ খাওনি আসলে?'

'এক ফোঁটাও না। নার্ভাস ব্রেকডাউনও হয়নি সেদিন আমার। হাতের কাঁপুনিটাও অভিনয়। সেদিন আপনারা ঘরে ঢোকার আগের মুহূর্তে ফিরে এসেছিলাম গ্যারেজ থেকে ব্রনসনের ছবি তুলে।'

'তার মানে ইচ্ছে করে হেরেছ তুমি পর পর কয়েকটি গ্র্যান্ডপ্রিক্স?'

'কারণ ছিল। সেরা ড্রাইভার হিসেবে আমার চলাফেরা কঠিন হয়ে পড়েছিল, তাই লাইম লাইট থেকে সরে যেতে হয়েছিল আমাকে ভেঙে পড়ার অভিনয় করে। সবার অপ্রিয়পাত্র হওয়ার দরকার ছিল '

'তাহলে আবার ফিরে আসছ তুমি, রানা, আমাদের মধ্যে?' খুশিতে জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল হ্যামারের মুখ।

'দুঃখিত,' বলল রানা 'ফেরার উপায় নেই আমার। আজকের কাজটা চুকে গেলেই ফিরে যাচ্ছি আমি আমার আগের কাজে। গ্র্যান্ডপ্রিক্সে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।'

'বলো কি! ছেড়ে দেবে চ্যাম্পিয়ানশিপটা? বিশ্বজোড়া খ্যাতি পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে তুমি?'

'আমি যে কাজে আছি সেটার সঙ্গে খ্যাতির মস্ত বিরোধ আছে। আমার কাজটাই আমার বেশি পছন্দ।' ব্যান্ডল লেখা একটা সাইন পোস্ট দেখে গতি খানিকটা কমাল রানা।

'কিন্তু ভুলে যাচ্ছ, ইতিমধ্যেই তুমি একজন বিখ্যাত লোক। পৃথিবীর যে কোনায় যাও না কেন চিনবে লোকে তোমাকে মরিস রেনার হিসেবে। তোমার আগের কাজে ফিরে গেলেও লোকে তোমাকে চিনে ফেলবে। এসপিওনাজ ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গেছে তোমার। তার চেয়ে···'

'ইটালিয়ান রেস ড্রাইভার মরিস রেনার লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে পরিচিত, স্বীকার করি, কিন্তু মাসুদ রানাকে কে চেনে? ছদ্মবেশটা খুলে

ফেললেই আবার হারিয়ে যাব আমি জনতার ভিড়ে। কেউ চিনবে না আমাকে। আপনিও না। হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে মরিস রেন্যার। কোন চিহ্ন থাকবে না আর তার।'

বিমর্ষ ভঙ্গিতে বসে রইল হ্যামার আধ মিনিট। তারপর বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তোমাকে হাজার অনুরোধ করে কোন লাভ হবে না, জানি। তোমাকে হারাতে খুবই কষ্ট হবে, কিন্তু মেনে নিতে হবে সেটা। কিন্তু একটা কথা বলবে? আমার স্ত্রীকে উদ্ধারের ব্যাপারে পুলিসের সাহায্য না নিয়ে নিজে ঝুঁকি নিচ্ছ কেন? আমার জন্যে?'

সমুদ্রের ধার দিয়ে যেতে যেতে পরিষ্কার চাঁদের আলোয় দেখতে পেল ওরা দি এইস দাঁড়িয়ে আছে নোঙর ফেলে। নীল-সাদা পেইন্ট করা সুন্দর একটা মোটর ইয়ট। দূরে দূরে আরও অনেকগুলো ছোট বড় ইয়ট আর ক্রুজার দাঁড়িয়ে আছে এলোমেলো ভঙ্গিতে। ঝকঝক করছে নিস্তরঙ্গ উপসাগর আয়নার মত। চোখ সরিয়ে নিয়ে রানা বলল, 'ঠিকই বলেছেন। আপনার জন্যেই। আপনার স্ত্রীর হারিয়ে যাওয়ার সংবাদ পুলিসে জানাতে পারেননি, ব্যাপারটা ওদের অজানাই থাকুক। নইলে অনেক কিছু নিয়ে টান পড়বে। যদি জিজ্ঞেস করেন কেন করছি কাজটা, এক কথায় কোন উত্তর দিতে পারব না। প্রায় তিনটে মাস ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছি আমি আপনার সাথে, অনেক কাছে থেকে দেখেছি, জানবার সুযোগ পেয়েছি। নিজের অজান্তে আপনি এমন কিছু দিয়েছেন আমাকে, হয়তো সবাইকে দিচ্ছেন এই একই জিনিস, হয়তো নির্লিপ্ত ভাবে বিলিয়ে যাচ্ছেন জিনিসটা আপনি সবার মধ্যে, কিন্তু আমি বাঁধা পড়ে গেছি। যা পেয়েছি জীবন দিয়েও তার প্রতিদান দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঠিক বুঝতে পারছেন কিনা জানি না, না বুঝলেও কিছু এসে যায় না, তবে, বাপ-মা হারা মানুষ যে জিনিসটার জন্যে কাঙাল হয়ে থাকে, যে জিনিসটার বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করে দিতে পারে পানির দামে, আপনার কাছে অঢেল পেয়েছি আমি সেই জিনিস। আপনাকে আমি মনের মধ্যে যে আসন দিয়েছি, আমি চাই না বিনা দোষে সেখান থেকে নেমে কোর্টে গিয়ে সেই আপনাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হোক। মিস্টার কার্টারেটও চান না সেটা। তাই আমরা যুক্তি করে স্থির করেছি, এই ব্যাপারে পুলিস ডাকা চলবে না।'

ছোট্ট শহরটায় ঢুকে কিছুদূর গিয়েই গাড়িটা রাখার জন্যে মনের মত জায়গা পেয়ে গেল রানা। উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা দুই একর আন্দাজ জমির উপর বিশাল একটা বাড়ি উঠছে। এক তলার অর্ধেক পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে, দরজা-জানালা-গেট কিছু বসানো হয়নি। ভিতরে ঢুকে রাস্তা থেকে যেন দেখা না যায় সে রকম জায়গায় অন্ধকার ছায়ায় রেখে দিল রানা গাড়ি। নেমে হেঁটে রওনা হলো জেটির দিকে।

'ইয়টে পৌঁছবে কি করে?'

'সেই কথাই ভাবছি,' বলল রানা। 'ইয়টে পাহারা তো থাকবেই, আমাদের ধরে নেয়া উচিত যে ডাঙাতেও ব্যবস্থা থাকবে পাহারার। যদিও

যিমার ব্রাদার্সের কপালে কি ঘটেছে ইয়টের কারও জানবার কথা নয়, তবু সাবধান থাকা দরকার আমাদের। প্রথমে আবহাওয়াটা বুঝতে হবে আমাদের, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। চলুন, সামনের ওই রেস্তোরাঁয় বসে খেয়ে নেয়া যাক যাহোক কিছু।' আকাশের দিকে চাইল রানা। 'ততক্ষণে আশা করা যায় ওই মেঘটা দয়া করে হাওয়ায় ভেসে পৌঁছে যাবে চাঁদের কাছে।'

বাইরে থেকে কাফেটা পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে পা বাড়াল রানা সামনে, দ্বিতীয় কাফেও পছন্দ হলো না ওর। তিনভাগের দুইভাগ শূন্য একটা কাফেতে ঢুকল সে, পিছু পিছু হ্যামার। জানালার পাশে বসল রানা, টেবিলের ওপাশে রানার মুখোমুখি বসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল হ্যামার, 'অন্যগুলোর চেয়ে কোন দিক থেকে ভাল হলো এই কাফেটা?'

মৃদু হেসে জানালার পর্দা সরিয়ে দিল রানা। বলল, 'জ্যোছনা ধোয়া সাগরের দৃশ্য পাচ্ছেন এখান থেকে।'

জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল হ্যামার দি এইস। চট করে চোখ সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানাকে, 'কি খাবে? আমার কিন্তু খিদে নেই মোটেই।'

'যা হয় আনান। আমরও খাবার রুচি নেই।'

খেতে খেতে হঠাৎ চোখ দুটো একটু বড় হয়ে গেল হ্যামারের। চাপা গলায় ডাকল, 'রানা।'

'উত্তেজিত হবেন না,' বলল রানা। 'খাওয়া চালু রাখুন। আপনার পরিচিত কেউ ঢুকেছে কাফেতে। কে?'

'নামটা ভুলে গেছি। বছর দুয়েক আগে আমার গ্যারেজে কাজ নিয়েছিল। হ্যানসিঙ্গারের সাথে খুব বন্ধুত্ব ছিল ওর। হ্যানসিঙ্গারই ঢুকিয়েছিল ওকে আমার গ্যারেজে। চুরির দায়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম আমি ওকে। আমাকে এখানে দেখেই চমকে উঠল লোকটা। এখন বেরিয়ে যাচ্ছে।'

'কোনদিকে গেল? ডানদিকে, না বামদিকে?'

'ডান দিকে। ল্যান্ডিং স্টেপের দিকে।'

পর্দাটা সরিয়ে দি এইসের দিকে চাইল রানা। একটা আউট-বোর্ড এঞ্জিন লাগানো ডিঙি এগিয়ে আসছে দি এইসের দিক থেকে ল্যান্ডিং স্টেপের দিকে। বলল, 'তার মানে খবর পৌঁছে গেছে। আপনি এক কাজ করুন, গাড়ি থেকে রশি আর ইলাস্টোপ্লাস্টের টেপটা নিয়ে আসুন। আমার সাথে দেখা হবে ল্যান্ডিং স্টেপের পাশে রাখা ড্রামগুলোর কাছে। উঠে পড়ুন। জলদি।'

হাতের ইশারায় বিল আনতে বলল রানা ওয়েটারকে। খাওয়া ছেড়ে লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল মাইকেল হ্যামার। কিছুদূর হেঁটে এগিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। তিন মিনিটে ল্যান্সিয়ার কাছে পৌঁছে গেল। বুট থেকে এক গাছা রশি বের করল, ফার্স্ট এইড বক্স থেকে ত্রস্ত হাতে বের করল ইলাস্টোপ্লাস্ট। রওনা হতে যাচ্ছিল, কি ভেবে সীটের নিচে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল

লুকিয়ে রাখা চারটে পিস্তল। অপরাধীর মত চারদিকে চাইল একবার, তারপর সবচেয়ে ছোট পিস্তলটা পকেটে পুরল। ঢোকাবার আগে সেফটি ক্যাচটা অফ করে নিতে ভুলল না। বাকি তিনটে যথাস্থানে রেখে ছায়ায় ছায়ায় দ্রুতপায়ে এগোল সে ল্যান্ডিং স্টেপের দিকে।

গজ পঁচিশেক থাকতে রানাকে পাওয়া গেল। ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে বারণ করল সে হ্যামারকে। একটার উপর আরেকটা করে রাখা মাথা সমান উঁচু ড্রামগুলোর আড়ালে আড়ালে ল্যান্ডিং স্টেপের অত্যন্ত কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ল্যান্ডিং স্টেপের উপর দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে চেয়ে রয়েছে একজন লোক। ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ডিঙিটার উপর। অনেক কাছে চলে এসেছে ওটা। এঞ্জিনের শব্দ কমল কিছুটা, তারপর বন্ধ হয়ে গেল। পরিষ্কার ভেসে এল হ্যানসিঙ্গারের গলা।

'এখনও পৌঁছেনি এসে শুয়োরের বাচ্চা। এখানেই ড্রামের আড়ালে অপেক্ষা করব আমরা। তাহলে কাজ সেরে ভাগতে সুবিধে হবে।' গলার স্বর একটু পরিবর্তন হলো। 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে যে? খবর আছে কিছু?'

'ওরা বসে আছে ওই কাফেতে।'

'ওরা মানে?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল হ্যানসিঙ্গারের গলা।

'তোমাদের মাইক হ্যামারও রয়েছে ওর সাথে।'

'আচ্ছা!' ঘ্যাস করে ঘাটে এসে ভিড়ল ডিঙিটা। 'পিপীলিকার পাখা গজে মরিবার তরে।'

'ঠিক বলেছ!' বলল রানা। রাইফেল হাতে ডাঙায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল হ্যানিসঙ্গার মূর্তির মত। আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। 'রাইফেলটা ছেড়ে দাও হাত থেকে, তারপর মাথার ওপর হাত তুলে পিছন ফিরে দাঁড়াও। দু'জনই।' খটাশ করে পড়ল রাইফেলটা সিঁড়ির উপর। 'পানিতে ঝাঁপ দেয়ার ইচ্ছে থাকলে দিতে পারো, কিন্তু সেক্ষেত্রে লাশটা পড়বে পানিতে। চারফুট দূর থেকে মিস হবে না আমার গুলি। ফুটো হয়ে যাওয়া খুলি নিয়ে পড়বে পানিতে। পরিষ্কার?' কারও মধ্যে ঝাঁপ দেয়ার লক্ষণ না দেখে আরও এক পা এগিয়ে এল রানা। 'মিস্টার হ্যামার, যদি কিছু মনে না করেন, সার্চ করে দেখুন আর কোন অস্ত্র আছে কিনা ওদের কাছে।'

দুটো পিস্তল পাওয়া গেল। রাইফেলটা তুলে নিয়ে পিছিয়ে আসতে যাচ্ছিল হ্যামার, কথা বলে উঠল রানা।

'ওগুলো ফেলে দিন পানিতে। ফেলে এই চোরটাকে আচ্ছা করে বাঁধুন রশি দিয়ে। এই যে, তোমরা দু'জন এদিকে ফেরো একবার। এপাশে সরে এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো দু'জনেই। হাত দুটো পিঠের ওপর! একচুল নড়াচড়া করলেই গুলি খাবে কলজে বরাবর।'

দুই মিনিটে লোকটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে হ্যানসিঙ্গারের পিঠের উপর উঠে বসতে যাচ্ছিল হ্যামার, হাঁ-হাঁ করে উঠল রানা। 'আরে, আরে! করেন কী। একে বাঁধার দরকার নেই। একে সাথে করে নিয়ে যাব আমরা ইয়টে।

আপনি ওটার মুখ বন্ধ করুন।'

ইলাস্টোপ্লাস্ট সেঁটে লোকটার মুখ বন্ধ করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল হ্যামার। মাঝারি একটা লাথি চালাল রানা হ্যানসিঙ্গারের পাঁজর লক্ষ্য করে।

'উঠে পড়ো, দোস্ত। তোমাকে জিজ্ঞেস করলেই বলবে আর কেউ নেই ইয়টে। কিন্তু তাই বলে আমরা তো আর ঝুঁকি নিতে পারি না। তুমি সামনে থাকবে আমাদের, যেন প্রথম গুলিটা তোমার উপর দিয়েই যায়।'

চন্দ্রালোকিত সাগরের বুকে ভেসে পড়ল ডিঙিটা। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে দি এইসের দিকে ছুটল ওরা। সজাগ, সতর্ক।

ডিঙিটা শত খানেক গজ দূরে থাকতেই ইয়টের হুইলহাউসে বিনকিউলার চোখে ধরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন শক্ত সমর্থ চেহারার লোক প্রায় চমকে উঠল। হ্যানসিঙ্গার আর মাইকেল হ্যামারকে চিনতে পেরেছে সে, তৃতীয়জন কে হতে পারে তাও বুঝে নিয়েছে সে অনায়াসে। চট করে বিনকিউলারটা নামিয়ে রেখে ড্রয়ার থেকে বের করল একটা রিভলভার। হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে একটা মই বেয়ে উঠে গেল সে কেবিনের ছাতে। শুয়ে পড়ল ছাতের উপর ডিঙিটার দিকে মুখ করে।

ইয়টের পিছন দিকে ওয়াটার-স্কির জন্যে তৈরি সিঁড়ির কাছে এসে থামল ডিঙি। রানার নির্দেশে বেঁধে ফেলল হ্যামার ডিঙিটা। পিস্তল দিয়ে হ্যানসিঙ্গারকে এগোবার ইঙ্গিত করল রানা। ধীর পায়ে ধাপ ডিঙিয়ে উপরে উঠতে শুরু করল হ্যানসিঙ্গার, তার পিছনে পিস্তল হাতে রানা, তার পিছনে মাইকেল হ্যামার। সিঁড়ির মাথায় হ্যামারকে দাঁড় করিয়ে রেখে পিস্তলটা হ্যানসিঙ্গারের পিঠে ঠেসে ধরে সারাটা ইয়ট ঘুরে এল রানা। কেউ কোথাও নেই। উজ্জ্বল আলোকিত স্যালুনে ঢুকল এবার ওরা।

'ইয়টে আর কেউ নেই বলে মনে হচ্ছে,' বলল রানা। খুব সম্ভব নিচের ওই তালামারা ঘরটায় রয়েছেন মিসেস এলিনা হ্যামার। চাবিটা কোথায়, হ্যানসিঙ্গার?'

'আমি জানি না…উফ্।' হাঁটুর উপর লাথি খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল হ্যানসিঙ্গার। 'সত্যিই…'

গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর পিছন থেকে বলে উঠল, 'ড্রপ দ্যাট গান! খবরদার, কেউ নড়বে না!'

নড়ল না রানা, হাত থেকে ছেড়ে দিল পিস্তলটা।

হাসি ফুটে উঠল হ্যানসিঙ্গারের মুখে। বড় বাঁচা বেঁচে যাওয়া হাসি। বলল, 'ওয়েল ডান, মরিয়েলো। ঠিক সময় মতই হাজির হয়েছ। থ্যাংকিউ!'

'নো মেনশন, মিস্টার হ্যানসিঙ্গার।' কথাটা বলে এগোল মরিয়েলো। বাম হাতের কনুই দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো মারল মাইকেল হ্যামারের পাঁজরে। ছিটকে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল হ্যামার একটা ডিভানের উপর। ব্যথায় কুঁচকে গেছে মুখটা। লম্বা পা ফেলে রানার পিস্তলটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছিল মরিয়েলো, এমনি সময় চেঁচিয়ে উঠল মাইকেল হ্যামার।

'এবার তোমার পিস্তল ফেলে দাও! খবরদার, পিছন ফিরবে না!'

পাঁই করে পিছনে ফিরল মরিয়েলো, দেখল হ্যামারের কাঁপা হাতে খেলনার মত ছোট্ট একটা পিস্তল। হাসল সে। বলল, 'এই শালা আবার কবে থেকে পিস্তল ছুঁড়তে শিখল?'

কথাটা বলতে বলতে রিভলভারটা তুলছিল সে উপরে। দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুজে টিপে দিল হ্যামার ট্রিগার। গুলির আওয়াজ ছাপিয়ে বিকট আর্তনাদ ছাড়ল মরিয়েলো। রিভলভারটা খসে পড়ল হাত থেকে। বাম হাতে চেপে ধরেছে সে ডান কাঁধটা, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে রক্তের ধারার দিকে। হ্যানসিঙ্গারের হাসি মুখটাও মুহূর্তে বিকৃত হয়ে গেল নাভির উপর রানার হাতের তীব্র একটা লেফটে হুক খেয়ে। শরীরটা বাঁকা হয়ে গেল সামনের দিকে। ঘাড়ের পিছনে প্রচণ্ড এক রদ্দা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল রানার পিস্তলের উপর। কিন্তু বিড়ালের চেয়েও শক্ত জান তার। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল স্যালুনের খোলা দরজার দিকে, হ্যামারের ল্যাঙ খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ল চৌকাঠের কাছে। আবার উঠে ছুটল ডেকের দিকে। পিছন পিছন ছুটছে রানা। লাফ দিয়ে পড়ল সে হ্যানসিঙ্গারের ঘাড়ে।

জীবনের প্রথম গুলি ছুঁড়ে ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গিয়েছিল মাইকেল হ্যামারের, কিন্তু চোখ খুলে যখন দেখল মরেনি লোকটা তখন খুব দ্রুত সামলে নিল। লোকটার পায়ের কাছে পড়ে থাকা পিস্তল আর রিভলভারের দিকে চেয়ে হুকুম করল, 'ওই চেয়ারে গিয়ে বসো!'

যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছিল মরিয়েলো, কিন্তু দ্বিতীয় গুলির ভয়ে আদেশ পাওয়া মাত্র বিদ্যুৎবেগে চলে গেল ঘরের কোণে, বসে পড়ল নির্দিষ্ট চেয়ারে। বাইরে থেকে 'হুঁক, হাঁক' শব্দ আসছে মারপিটের, ধুপুড়ধাপ আছাড় খাওয়ার শব্দ আসছে। মেঝে থেকে রানার পিস্তল আর মরিয়েলোর রিভলভারটা তুলে নিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এল হ্যামার বাইরে।

রানার চেয়ে অন্তত আধফুট বেশি লম্বা, দেড়গুণ বেশি চওড়া হ্যানসিঙ্গার। কিন্তু মারের চোটে জিভ বেরিয়ে এসেছে তার। রেলিঙের ধারে ঠেসে ধরেছে রানা ওকে এক হাতে গলা টিপে। পিছন দিকে বাঁকা হয়ে আছে হ্যানসিঙ্গার। হাত-পা ছুঁড়ছে এলোপাতাড়ি। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'সাঁতার জানি না! পড়ে যাচ্ছি?'

নিজের দোষেই, রানার বুকে একটা পা ঠেকিয়ে লাথি দিতে গিয়ে ঝপাৎ করে পড়ে গেল সে সাগরে। ছিটকে একরাশ পানি উঠে এল ডেকের উপর ঠিক সেই সময় একটা ঘন মেঘের তলায় চাপা পড়ল চাঁদের আলো। ইয়টের চারিটা পাশ ঘুরে এল রানা পানির উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে। মৃদু হাসল হ্যামারের দিকে চেয়ে। 'হয়তো সত্যিই জানে না সাঁতার। যাকগে, মরুক। চলুন ভেতরে যাওয়া যাক। পুলিস এসে পৌঁছনোর আগেই কেটে পড়তে হবে আমাদের।'

'আমি জানি সাঁতার,' কোট খোলার উপক্রম করল মাইকেল হ্যামার।

'ভাল সাঁতার জানি। তুলে আনছি ওকে।'

'খেপেছেন নাকি আপনি?' কোটের আস্তিন ধরে স্যালুনের দিকে টানল ওকে রানা।

মরিয়েলোর সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। ডান কাঁধটা বাম হাতে চেপে ধরে ফোঁপাচ্ছে মরিয়েলো চোখ বুজে। রানার পিস্তলের গুঁতো খেয়ে চোখ মেলল।

'মিসেস হ্যামারের কেবিনের চাবি কোথায়?'

একটা ক্যাবিনেট ড্রয়ারের দিকে মাথা নেড়ে ইশারা করল মরিয়েলো। একটা মাত্র চাবি পাওয়া গেল ড্রয়ারে। ওটা বের করে নিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আর সব কেবিনের চাবি কোথায়? নাকি এক চাবিতেই সব দরজা খোলে?' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল মরিয়েলো, পরমুহূর্তে ককিয়ে উঠল চুলে টান পড়তেই। টেনে দাঁড় করাল ওঁকে রানা। 'চলো, নিচে চলো।'

নিচে নেমে প্রথম খোলা কেবিনটার মধ্যে ঠেলে মরিয়েলোকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা মেরে দিল রানা। তারপর আর একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল দু'জন। চাবিটা মাইকেল হ্যামারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করল রানা। 'আপনি খুলুন।'

খুলে গেল দরজাটা।

দরজার দিকে মুখ করে বিছানার ধারে বসে আছে পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের এক মহিলা। অপূর্ব সুন্দরী। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে খোলা দরজার দিকে। মুখে কোন ভাবান্তর নেই। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মহিলা, হাতদুটো সামনে বাড়িয়ে খুঁজল কিছু, এগিয়ে এল কয়েক পা।

'মাইক। তোমার গন্ধ পাচ্ছি আমি। মাইক। তুমি এসেছ।' হাত দুটো খুঁজছে সামনে। 'মাইক। ওরা আমাকে…'

উড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল হ্যামার বৃদ্ধার উপর। 'হ্যাঁ। আমি এসে গেছি। আর কোন ভয় নেই, এলিনা।' শূন্যে তুলে নিল বৃদ্ধাকে। পাগলের মত চুমো খাচ্ছে। দুই হাতে হ্যামারের মুখ ছুঁয়ে দেখল বৃদ্ধা। ওর বুকে মুখ ঘষল। মুখে অপরূপ সুন্দর হাসি। পলকহীন চোখ থেকে টপ টপ লোনা পানি নেমে আসছে গাল বেয়ে। রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে হ্যামার। 'কাঁদে না, পাগলী। এই তো এসে গেছি আমি। আর কেউ আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না তোমাকে।'

হঠ্যাৎ রানার কথা স্মরণ হলো হ্যামারের। চট করে নামিয়ে দিল স্ত্রীকে।

'হায়, হায়! আসল মানুষের সাথে পরিচয় করে দিতেই ভুলে গেছি। এদিকে এসো রানা। এলিনা, আমি না, এই ছেলেটা নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করেছে তোমাকে। ওর সাহায্য ছাড়া সম্ভবই হত না এখানে পৌঁছনো।'

হ্যান্ডশেকের জন্যে বৃদ্ধার হাত ধরেছিল রানা, টেনে কাছে নিয়ে গেল ওকে এলিনা হ্যামার। দুই হাতে স্পর্শ করে চিনে নিল রানার মুখটা। কপাল

ছুঁয়ে বলল, 'মস্ত বড় মন তোমার। আমার মাইকের মতই। আমি চোখে দেখি না, বাবা। কিন্তু মনটা অনুভব করতে পারি! তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

বিস্ময়াভিভূত রানা আমতা আমতা করে দু'একটা কথা বলল, তারপর সচেতন হয়ে ফিরল হ্যামারের দিকে।

'এক্ষুণি রওনা হয়ে যাওয়া দরকার আমাদের পুলিস এসে পৌঁছবার আগেই।'

'হ্যাঁ। চলো।' এক হাতে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে দরজার দিকে এগোল মাইকেল হ্যামার।

এদিকে টর্পেডোর বেগে ছুটছে সাঁতার না জানা হুবার্ট হ্যানসিঙ্গার। ল্যান্ডিং স্টেপে পৌঁছে দৌড়ে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে, ছুটে গিয়ে ঢুকল রাস্তার ওপাশের একটা ফোন বুদে। মিনিট তিনেক অপেক্ষার পর ভিগনোলেস পাওয়া গেল, আরও দুই মিনিট অধীর প্রতীক্ষার পর ব্রনসনকে ধরা গেল ওর বেডরুমে। সংক্ষেপে লাভ লজ এবং ইয়টের সব ঘটনা জানাল হ্যানসিঙ্গার ওকে। সব শেষে বলল, 'শেষ হয়ে গেছি আমরা, হুগো। শেষ করে দিয়েছে ওই শুয়োরের বাচ্চা।'

খাটের ধারে বসে আছে ব্রনসন। রাগে লাল হয়ে গেছে ওর মুখটা। কিন্তু কথা যখন বলল তখন গলার স্বর শান্ত।

'সব শেষ হতে দেরি আছে, হুবার্ট। অত ঘাবড়িয়ো না। এখনও একটা টেক্কা রয়েছে আমাদের হাতে। বুঝতে পেরেছ? সেই টেক্কা নিয়ে ব্যান্ডল আসছি আমি। একঘণ্টার মধ্যে। তুমি জায়গা মত অপেক্ষা করো।'

'পাসপোর্ট আনছ?'

'হ্যাঁ। লাগবে ওটা।'

'আমারটা বেড-সাইড টেবিলের ড্রয়ারে আছে। আর দয়া করে কিছু শুকনো কাপড় এনো, নইলে ঠাণ্ডায় জমে মরে যাব। ও, কে?'

'ও, কে। দেখা হবে এক ঘণ্টার মধ্যে।'

রিসিভার ছেড়ে দিয়ে খুশি মনে বেরিয়ে এল হ্যানসিঙ্গার ফোন বুদ থেকে। ড্রামগুলোর পাশে লুকিয়ে থাকবার জন্যে একটা ভাল জায়গা খুঁজতে গিয়ে চোরের গায়ে পা বেঁধে হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসে বলল, 'হায়, হায়, উইলি! তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে!' হাত-পা-মুখ বাঁধা উইলিকে কাতর দৃষ্টিতে চাইতে দেখে বলল, 'এখন খোলা যাবে না, উইলি। দুঃখিত। মরিয়েলোকে জখম করে মিসেস হ্যামারকে নিয়ে ফিরে আসছে ওরা। আমি কোনমতে পানিতে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে পালিয়ে এসেছি। এক্ষুণি এসে যাবে হারামীরা, এসেই তোমার কি অবস্থা সেটা খোঁজ করবে। যদি দেখে তুমি নেই তাহলে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তোমাকে জায়গামত পেলে আরও কিছুক্ষণের জন্যে তোমাকে এখানে ফেলে রাখলে অসুবিধে নেই মনে করে আগের কাজ আগে সারবে। আমি থাকব

আশেপাশেই। যেই ওরা চোখের আড়াল হবে ওমনি তোমার বাঁধন খুলে দেব আমি। তুমি ডিঙি নিয়ে সোজা চলে যাবে ইয়টে। চার্ট টেবিলের ওপরের দুটো ড্রয়ারে যত কাগজপত্র আছে সব একটা ব্যাগে পুরে আমার গাড়ি নিয়ে মার্সেইতে তোমার বাড়িতে চলে যাবে তুমি, ওখানে অপেক্ষা করবে আমার জন্যে। এই কাগজগুলোর ওপর তোমার নিজের নিরাপত্তাও নির্ভর করছে। পুলিসের হাতে ওগুলো পড়লে সব একেবারে শেষ হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছ? যেমন করে হোক কাগজপত্র সরাতেই হবে ইয়ট থেকে।'

বিমর্ষ বদনে মাথা ঝাঁকাল উইলি, তারপর কান খাড়া করল আউটবোর্ড মোটরের এঞ্জিনের শব্দ শুনে। ইয়টের দিকে চাইল হ্যানসিঙ্গার। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। সোজা এইদিকে ছুটে আসছে ডিঙিটা। উইলির পিঠে দুটো সান্ত্বনার চাপড় দিয়ে দ্রুতপায়ে ড্রামের আড়ালে গজ ত্রিশেক সরে গেল হ্যানসিঙ্গার। ল্যান্ডিংস্টেপের উপর প্রথম নামল রানা, পিস্তল হাতে। ডিঙিটা বেঁধে ফেলল একটা লোহার কড়ার সাথে। স্ত্রীকে শূন্যে তুলে নিয়ে নেমে এল মাইকেল হ্যামার। উঠে যাচ্ছে সিঁড়ির ধাপ ডিঙিয়ে উপরে। রানাকে অতর্কিতে আক্রমণ করবে কিনা কয়েক সেকেন্ডের জন্যে একটু ভেবে দেখল হ্যানসিঙ্গার, দূর করে দিল চিন্তাটা, নাক-মুখ-চোয়ালের ফোলা অংশে মমতার সাথে হাত বুলাল। বিফল হলে ওর ভাগ্যে কি ঘটবে ভেবে দমে গেছে। তার চেয়ে আপাতত আত্মগোপন করে থেকে ব্রনসন এসে পৌঁছলে পালিয়ে বাঁচাই বুদ্ধিমানের কাজ। খেলা শেষ।

উইলির কাছে এসে দাঁড়াল রানা, নিচু হয়ে পরীক্ষা করল ওর বাঁধন, তারপর সোজা হয়ে উঠে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। রাস্তার ওপারে ফোন বুদের সামনে দাঁড়াল তিনজন। রানা ঢুকে গেল ভিতরে। পা টিপে টিপে ফিরে এল হ্যানসিঙ্গার উইলির কাছে, পকেট থেকে ছোট্ট একটা ছুরি বের করে কেটে দিল হাত-পায়ের বাঁধন। কষে বাঁধার ফলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়েছিল, আবার চালু হয়ে যেতেই ঝিঁঝি ধরে গেল উইলির হাত-পায়ে, চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে লক্ষ করল গোঁ-গোঁ আওয়াজ বেরোচ্ছে কেবল, টেপ লাগিয়ে দেয়ায় প্রাণ খুলে চ্যাঁচাতে পারছে না। টেপ খোলার চেষ্টা করতেই ওর মুখ চেপে ধরল হ্যানসিঙ্গার।

'মুখ বাঁধা অবস্থায় যত খুশি চ্যাঁচাও,' উইলির কানে কানে ফিস ফিস করে বলল হ্যানসিঙ্গার। 'রাস্তার ওপারেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। বোধহয় খবর দিচ্ছে ভিগনোলেসে। ওদের অনুসরণ করব আমি, সত্যিই ব্যান্ডল ছেড়ে যাচ্ছে কিনা জানা দরকার। ওরা চোখের আড়াল হলেই তুমি রওনা হয়ে যাবে ডিঙি নিয়ে। খবরদার, এঞ্জিন স্টার্ট করবে না, দাঁড় বেয়ে যেতে হবে তোমার ইয়টে।' রানাকে ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেই গলার স্বর আরও কয়েক পর্দা নেমে গেল হ্যানসিঙ্গারের। 'বেরিয়েছে। আমি যাচ্ছি ওদের পিছু পিছু।'

দুটো মোড় ঘোরার পরই হারিয়ে গেল তিনজন। কোণের বাড়িটার

দেয়ালের পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে ওদের না দেখতে পেয়ে কি করবে ভাবছে হ্যানসিঙ্গার, এমনি সময়ে কাছেই কোথাও ল্যান্সিয়ার স্টার্ট নেয়ার শব্দ এল ওর কানে। এগোতে গিয়েও আড়ষ্ট হয়ে গেল হ্যানসিঙ্গার, দেয়াল ঘেরা একটা আঙিনা থেকে বেরিয়ে এল ল্যান্সিয়া, সাঁ করে বাঁয়ে কেটে সোজা উত্তর দিকে ছুটল গাড়িটা। চলে যাচ্ছে ব্যান্ডল ছেড়ে। যতক্ষণ ব্যাক লাইটের আলো দেখা গেল ততক্ষণ সেইদিকে চেয়ে রইল হ্যানসিঙ্গার। চুপচুপে ভেজা কাপড়, শীতে কাঁপছে সর্বাঙ্গ, বরফের মত জমে যেতে চাইছে দেহটা। কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এল সে ল্যান্ডিং স্টেপের কাছে রাস্তার অপর পারের ফোন বুদে।

রুডলফ গুন্থারকে পাওয়া গেল না, চলে গেছে প্যারিসে। ক্লিকি বর্গ জানাল হাত-পা ধুয়ে সাফ হয়ে চলে গেছে বস্; ব্রনসন, তার দলবল বা যিমারদের সাথে কোন সংস্পর্শ রাখবে না। চটেমটে চলে গেছে মার্সেই ছেড়ে, কোন সাহায্যও করবে না। লাইন কেটে দিয়ে আবার ভিগনোলেসে কানেকশন চাইল হ্যানসিঙ্গার। বোঝা যাচ্ছে, যা করবার নিজেদেরই করতে হবে এখন। অবস্থা খারাপ বুঝে কেটে পড়েছে গুন্থার।

'কেটে পড়েছে গুন্থার!' বলল সে কানেকশন পেয়ে।

'আমি জানি,' উত্তর এল ব্রনসনের।

'এই মাত্র রেনার আর হ্যামার রওনা হয়ে গেল মিসেস হ্যামারকে নিয়ে। যাবার আগে ফোন করেছে একটা—খুব সম্ভব ভিগনোলেসে ফোন করে সব জানিয়েছে মিচেলকে। তোমার আর ওখানে দেরি করা ঠিক হচ্ছে না।'

'ভয় নেই। হ্যামারের অ্যাস্টন মার্টিনটা দখল করে নিয়েছি, তোমার-আমার দু'জনেরই মালপত্র তোলা হয়ে গেছে। পাসপোর্টগুলো আমার পকেটে। এক্ষুণি রওনা হচ্ছি আমি। তার আগে তৃতীয় একটা পাসপোর্ট সংগ্রহ করে নেব। কারও সাধ্য নেই যে আমাদের ঠেকায়। আসছি।'

রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে টেলিফোন বুদের দরজা খুলতে গিয়ে পাথরের মূর্তির মত জমে গেল হ্যানসিঙ্গার। আলো নেভানো একটা কালো সিট্রন এগিয়ে আসছে নিঃশব্দে। ফ্ল্যাশিং লাইট নেই, সাইরেন নেই, কিন্তু একনজরেই চিনতে পারল হ্যানসিঙ্গার—পুলিসের গাড়ি! থেমে দাঁড়াল গাড়িটা। বুদের দরজাটা খুলে সামান্য একটু ফাঁক করে দিয়েছে হ্যানসিঙ্গার আগেই যার ফলে ভিতরের অটোমেটিক বাতিটা নিভে গেছে। দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে দেখল গাড়ি থেকে নেমে এল চারজন সশস্ত্র পুলিস। এদিকে একবারও না চেয়ে দৃঢ়পায়ে চলে গেল উইলিকে যেখানে বেঁধে রাখা হয়েছিল, সেখানে। দুটো টর্চ জ্বলে উঠল, একজন নিচু হয়ে ঝুঁকে তুলে নিল কাটা রশি আর কিছু ইলাস্টোপ্লাস্ট টেপ। নিচু গলায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা করল ওরা আধ-মিনিট, তারপর চারজনই নেমে গেল ল্যান্ডিং স্টেপের সিঁড়ি বেয়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল একটা দাঁড়টানা নৌকো সোজা চলছে দি এইসের দিকে, দুটো দাঁড় উঠছে, নামছে। নিঃশব্দে।

লম্বা একটা কাঁপা নিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এল হ্যানসিঙ্গার ফোন বুদ থেকে। রাগে নীল হয়ে গেছে মুখটা। বুঝতে পেরেছে সে, ভিগনোলেসে সুসংবাদ জানাবার জন্য ফোন বুদে ঢোকেনি রানা, ফোন করেছিল স্থানীয় পুলিসে। রাগে ও শীতে কাঁপছে হ্যানসিঙ্গার, মুখ দিয়ে অনর্গল খৈ ফুটছে গালির। বিড় বিড় করে একটানা গাল দিয়ে চলেছে সে। অসংখ্য শব্দের মধ্যে একমাত্র শ্রাব্য ও ছাপার যোগ্য হচ্ছে—রেনার।

বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বই পড়ছিল জুলিয়া। আসলে রানার ফিরে আসার অপেক্ষা করছে সে। মৃদু টোকা পড়ল দরজায়। দরজা খুলেই দেখতে পেল সে দাঁড়িয়ে আছে ব্রনসন। হাতে পিস্তল। ওকে ঠেলে ভিতরে ঢুকে এল ব্রনসন, ছিটকিনি লাগিয়ে দিল বাম হাতে।

'কি ব্যাপার হুগো? কি হয়েছে?'

'বিপদ। আমারও, তোমারও। আমি পালাচ্ছি। সাথে তোমাকে রাখতে চাই, যাতে যাত্রাপথে বাধা না পড়ে কোন রকম। তুমি হবে আমার বর্ডারের গেটপাস। একটা ব্যাগে দরকারী জিনিসপত্র ভরে নাও—এক্ষুণি। আর পাসপোর্টটা দাও এদিকে।'

'আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে…'

'শাট আপ!' চাপা গলায় ধমকে উঠল ব্রনসন! 'বাজে কথা বলে আমাকে দেরি করাবার চেষ্টা কোরো না। আমি বেপরোয়া লোক। সেকথা ভাল করেই জানা আছে তোমার। কোন গোলমাল করলে এখুনি এখানে খুন করে রেখে চলে যাব।'

জুলিয়া বুঝল, তর্ক করা বৃথা। গুছিয়ে নিল একটা ব্যাগ, পাসপোর্টটা তুলে দিল ব্রনসনের হাতে। দু'পা এগিয়ে এসে হ্যাঁচকা টানে ব্যাগের যিপ লাগিয়ে দিয়ে পিস্তল দিয়ে বাইরে বেরোবার ইঙ্গিত করল ব্রনসন। 'চলো, বেরোও।'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?' ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জুলিয়া।

'কোন কথা নয়। বেরোও ঘর থেকে। একটা টুঁ শব্দ করলে গুলি খাবে।' সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তলটা তুলল ব্রনসন জুলিয়ার বুক লক্ষ্য করে।

ধপ করে বসে পড়ল জুলিয়া বিছানার ধারে। 'ঠিক আছে। মারো। আট নম্বর পূর্ণ হবে তাহলে তোমার। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না জেনে এক পা-ও নড়ব না আমি।'

জুলিয়া বিগড়ে যাচ্ছে দেখে ব্রনসন বলল, 'আপাতত যাচ্ছি কুনিয়ো। সেখান থেকে অন্যখানে। উঠে পড়ো, জুলিয়া। মেয়ে-মানুষের উপর কোন লোভ নেই আমার। তাদের সাথে কোন বিরোধও নেই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দেয়া হবে তোমাকে।'

'অর্থাৎ, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মেরে ফেলা হবে আমাকে। কিন্তু সাথে না গেলে এখুনি মেরে ফেলা হবে।' হ্যান্ডব্যাগটা হাতে তুলে নিল। 'ঠিক আছে,

কয়েক ঘন্টা বেশি বাঁচতে আপত্তি নেই আমার। বাথরুম হয়ে আসতে পারি?'

বাথরুমের দরজা খুলে ভিতরটা পরীক্ষা করে দেখল ব্রনসন। বলল, 'জানালা নেই। টেলিফোন নেই। অলরাইট যাও, কিন্তু এক মিনিট—তার বেশি নয়।'

বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল জুলিয়া। চট করে হ্যান্ডব্যাগ থেকে ওর ল্যাপ রেকর্ড লেখার পেন্সিলটা বের করে একটা কাগজের টুকরোর উপর কাঁপা হাতে লিখল কয়েকটা কথা, দরজাটা যেদিকে খোলে সেইদিকে মেঝের উপর উপুড় করে রাখল কাগজটা, তারপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল। জিনিসপত্র ঠাসা ব্যাগটা বাম হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ব্রনসন। দরজা খুলে বাইরে বেরোবার ইঙ্গিত করল সে জুলিয়াকে। পিস্তলসহ ডানহাতটা চলে গেছে ওর জ্যাকেটের পকেটে। সোজা গিয়ে অ্যাস্টন মার্টিনে উঠে বসল দু'জন।

দি এইসের মধ্যে দারুণ কর্মচাঞ্চল্য চলেছে উইলির। বড়সড় একটা ব্রীফকেসের মধ্যে ভরে নিয়েছে সে ইতিমধ্যেই চার্ট টেবিলের ড্রয়ারে রাখা কাগজপত্র। স্যালুনের সোফায় ব্রীফকেসটা রেখে সারাটা ইয়ট এক পাক ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত নিল সে—যা পাওয়া যায় তাই লাভ, কেউ প্রশ্ন করতে আসবে না। একটা ক্যানভাস ব্যাগ জোগাড় করে নিয়ে তার মধ্যে পুরতে শুরু করল সে সারা ইয়টে ছোটখাট মূল্যবান জিনিস যা পেল। লাখ টাকার মত সামগ্রী সংগ্রহ হয়ে যেতেই ফিরবার তাড়া অনুভব করল সে মনের ভিতর। ব্যাগের যিপ লাগিয়ে দিয়ে ফিরে এল সে স্যালুনে। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে ব্রীফকেস হাতে বেরিয়ে এল ডেকের উপর। চার কদম এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল উইলি! মুখের চেহারায় আতঙ্ক আর অবিশ্বাসের ছাপ পড়বার কথা, কিন্তু কোন রকম ভাবান্তর হলো না ওর। ভাব প্রকাশের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে সে, একেবারে জমে গেছে সে বরফের মত।

রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারজন বিশাল চেহারার পুলিস। সবচেয়ে প্রকাণ্ড লোকটার মেশিন-পিস্তলটা ধরা আছে উইলির বুকের দিকে। একগাল হাসল লোকটা, অমায়িক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'অত তাড়াহুড়ো কিসের? কোথাও চললে, উইলি?'

বারো

ভিগনোলেসের দিকে ছুটে চলেছে ল্যান্সিয়া একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে। রানা চালাচ্ছে, পিছনের সীটে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস হ্যামার—মোটামুটি ঘটনাটা বুঝিয়ে দিচ্ছে রানা এলিনা হ্যামারকে। এক প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'দুটো ব্যাপার একসাথে এসে মিলেছে এখানে। দুটো দল কাজ করছিল

মিলেমিশে! ব্রনসনের দল গ্র্যান্ডপ্রিক্সের রেসকে কলুষিত করে দু'হাতে পয়সা লুটছিল, জনা পাঁচেক ড্রাইভার আর আট-দশজন মেকানিক যোগ দিয়েছিল তার দলে। এটা, প্রমাণ সংগ্রহ করতে না পারলেও, প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝে নিয়েছিলাম আমি। ওদের প্রত্যেকের বেতনের বহুগুণ বেশি টাকা রোজগার করছিল! কিন্তু সব রেস তো আর ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, তাই ওদের বেশির ভাগের বাড়তি রোজগারটা দেখলাম অনিয়মিত। তিন জন ছাড়া। ব্রনসন, হ্যানসিঙ্গার আর কাপলান। এই তিনজন প্রত্যেকটা রেসের পর পরই বিরাট সব অঙ্কের টাকা পাচ্ছে। টাকার অঙ্ক দেখে সহজেই অনুমান করে নিলাম কি ধরনের জিনিস চালান দিয়ে এই টাকা পাচ্ছে ওরা।'

'ড্রাগ্স। হেরোইন?'

'হ্যাঁ। যিমার ব্রাদার্স হচ্ছে প্রোডিউসার ও সাপ্লায়ার, ওরা তিনজন ডিস্ট্রিবিউটার। সারা ইউরোপ জুড়ে বিভিন্ন ঠিকানায় পৌছে দিত ওরা হেরোইন। অনেক খুঁজে টের পেলাম আমি, ব্লু অ্যাঞ্জেলের ট্র্যান্সপোর্টারটা ব্যবহার করছে ওরা এই কাজে। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম কেন পাওয়া যাচ্ছে না মিসেস হ্যামারকে। আটকে রাখা হয়েছে তাঁকে জিম্মি হিসেবে। বুঝলাম, মিস্টার হ্যামার সমস্ত ব্যাপার জেনেও চেপে যেতে বাধ্য হচ্ছেন স্ত্রীর নিরাপত্তার কথা ভেবে। গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়াল ব্রনসন—মিসেস হ্যামারকে আটকে রাখার ব্যাপারটা জানবার পরই বেনামে মিস্টার হ্যামারকে ব্ল্যাকমেইলিং শুরু করল সে, দুই মাসের মধ্যে কামিয়ে নিল দশ লাখ ডলার।'

'কাজটা ব্রনসনের, তুমি ঠিক জানো?' চোখ দুটো কপালে উঠল হ্যামারের।

'প্রমাণ করে দিতে পারি। কিন্তু এই প্রমাণটা চেপে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। ওদের বিরুদ্ধে আর যেসব তথ্য-প্রমাণ আছে সেগুলোই যথেষ্ট। রাত পোহানোর সাথে সাথেই সারা ইউরোপে অন্তত একশোজন লোক অ্যারেস্ট হয়ে যাবে।'

'মাইক গ্রেপ্তার হবে না?' হঠাৎ প্রশ্ন করল এলিনা হ্যামার।

'না। ওঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই কোথাও। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে না ওঁকে কোনদিনই।'

'কেন? অন্যায় বা বেআইনী কাজ হচ্ছে জেনেও পুলিসে না জানানোটা অপরাধ নয়?'

'এদেশের আইনে অবশ্য তাই। কিন্তু হেরোইনের ব্যাপারে উনি কিছু জানেন, বা ওঁকে ব্ল্যাকমেইল করা হয়েছিল, বা মুখ বন্ধ রাখবার জন্যে আপনাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল—তার প্রমাণ কোথায়? পুলিসের হাতে কোন প্রমাণ নেই। প্রতিপক্ষের যারা জানে তারা মুখ খুলবে না, খুললে কিডন্যাপ করার দায়ে আরও দশ বছর বেড়ে যাবে সশ্রম কারাদণ্ড।'

'এইজন্যেই তখন ইয়টে বলছিলে পুলিস এসে পৌছবার আগেই সরে পড়তে হবে ইয়ট থেকে?'

'হ্যাঁ সরে আমরা পড়েছি। কোথায় কি ঘটেছে কিছুই জানি না আমরা। হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম, ফিরে যাচ্ছি ভিগনোলেসে।'

সামনে দেখা গেল একটা গাড়ি আসছে। হেড লাইট ডিপ করা। চট করে ডিপ করল রানা ল্যান্সিয়ার হেড লাইট। কাছাকাছি এসে যেন ভুল বশে দপ করে জ্বলে উঠল সামনের গাড়ির হেডলাইটের ফুল-বীম, পরমুহূর্তে আবার ডিপ হলো আলোটা। সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা পাশ কেটে। সেই গাড়ির ড্রাইভার ব্রনসনের মুখে ফুটে উঠল বিচিত্র এক টুকরো হাসি। পাশে হাত বাঁধা অবস্থায় বসা জুলিয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'ফিরছেন বীরপুরুষ! তোমাকে না পেয়ে বড় চোট খাবে বেচারার কলজেটা। কিন্তু করবার আর কিছুই থাকবে না তখন।'

ব্যান্ডলের একটা বন্ধ কাফের সামনে এসে দাঁড়াল অ্যাস্টন মার্টিন। অন্ধকার একটা ছায়া থেকে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল হ্যানসিঙ্গার, উঠে বসল পিছনের সীটে।

'ইনশিওরেন্স পলিসিও সাথে করে নিয়ে এসেছ দেখছি,' বলল সে। 'এগোও এবার। দোহাই লাগে, ব্যান্ডল থেকে বেরিয়ে কোথাও একটা ঝোপঝাড় দেখে থামাও গাড়িটা। কাপড় না বদলালে শীতে জমে মরে যাব। আমার সুটকেসটা এনেছ না?'

'এনেছি। উইলি কোথায়?'

'হাজতে।'

'বলো কি!' চমকে উঠল ব্রনসন। 'খুলে বলো দেখি?'

'ওকে পাঠিয়েছিলাম ইয়টের কাগজপত্র সব নিয়ে আসবার জন্যে। কিন্তু আসলে রেনার ব্যাটা ইয়ট থেকে ফিরে ভিগনোলেসে ফোন করেনি, করেছিল থানায়। আমি ফোন সেরে বেরোবার আগেই এসে গেল পুলিসের গাড়ি, আমার করবার কিছুই ছিল না, নৌকায় উঠে দাঁড় বেয়ে চলে গেল ওরা দি এইসের দিকে। ফিরল গুলি খাওয়া মরিয়েলো আর কাগজপত্রসহ উইলিকে নিয়ে।

দ্রুত চিন্তা চলছে ব্রনসনের মাথায়। দুই মিনিট চুপ করে থেকে বলল, 'তার মানে এদিকের লীলাখেলা শেষ। রেনারের ফিল্ম আর এই কাগজপত্র পুলিসের হাতে যাওয়ার মানে, এখন একটাই মাত্র পথ খোলা আছে আমাদের সামনে।'

'কি পথ?'

'দ্রুতবেগে পলায়নের পথ। ছ'মাস আগেই ভেবে রেখেছি আমি এই ধরনের বিপদে পড়লে কিভাবে কি করব। আমাদের প্রথম স্টপেজ হবে কুনিয়ো।'

'আমাদের সেই ফ্ল্যাটে তো? ওটার কথা কেউ জানে না?'

'মার্কাস জানে। ও ছাড়া আর কেউ জানে না। ওর কাছ থেকে একথা

বেরোবে না। বাড়িটা আমাদের নামে নেই, কাজেই দুশ্চিন্তারও কিছুই নেই।' গোটা দুই জড়াজড়ি করে বেড়ে ওঠা গাছের নিচে গাড়ি থামাল ব্রনসন। 'বুটটা খোলাই আছে, বামপাশের সুটকেসটা তোমার। যেগুলো পরে আছ সেগুলো ওই পাশের ঝোপের মধ্যে গুঁজে দিয়ে এসো।'

'কেন? এই সেইদিন তৈরি করিয়েছি এটা। এর দাম...'

'কাস্টম চেকিং-এর সময় ভেজা কাপড় পাওয়া গেলে কি উত্তর দেবে?'

'আরে! এটা তো ভাবিনি!' বলেই নেমে গেল হ্যানসিঙ্গার গাড়ি থেকে। সুটকেস থেকে কাপড় বের করে নিয়ে চলে গেল গাছের আড়ালে। তিন মিনিট পর যখন ফিরে এল, দেখল পিছনের সীটে বসে আছে ব্রনসন। বলল, 'কি হলো? আমাকে চালাতে হবে?'

'তাড়া আছে আমাদের,' বলল ব্রনসন। 'আর আমার নাম হুবার্ট হ্যানসিঙ্গার নয়। কাজেই বুঝতে পারছ।'

ড্রাইভিং সীটে উঠে গিয়ার দিল হ্যানসিঙ্গার। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পক্ষীরাজের মত উড়ে চলল অ্যাস্টন মার্টিন। পিছন থেকে কথা বলে উঠল ব্রনসন, 'তবে একটা কথা খেয়াল রাখলে সুখী হব—এটা রাজপথ, রেসট্র্যাক নয়।' খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'মনে হয় কোল ডে টেন্ডের কাস্টমস বা পুলিসের তরফ থেকে কোন গোলমাল হবে না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কেউ টেরই পাবে না পালাচ্ছি আমরা। খুব সম্ভব এখন পর্যন্ত টেরই পায়নি ভিগনোলেসের কেউ যে জুলিয়াকে পাচ্ছে না। আর টের পেলেই কি? আমরা কোন্‌দিকে যাচ্ছি কে জানে? বর্ডার পেরোবার চেষ্টা করব কিনা বুঝবে কি করে? কাজেই আমার মনে হয় না ওরা বর্ডার পুলিসকে কিছু জানাবে। এই বর্ডারটা ডিঙিয়ে যাব সহজেই, তবে সুইস ফ্রন্টিয়ার ডিঙানো কঠিন হয়ে যাবে। যতক্ষণে আমরা সুইস বর্ডারে পৌঁছব ততক্ষণে ওদের কাছে খবর পৌঁছে যাবে, বর্ণনা পৌঁছে যাবে চেহারার।'

'তখন কি করব?'

'সহজ ব্যাপার। ঘণ্টা দুয়েক কাটাব আমরা কুনিয়োতে। গাড়ি বদলাব। অ্যাস্টনটা গ্যারেজে রেখে একটা পীগট নিয়ে রওনা হব। রওনা হওয়ার আগে ঘণ্টাখানেকের জন্যে ডেকে পাঠাব নিকোলোকে। আমাদের তিনজনেরই চেহারা পাল্টে যাবে, কালো হয়ে যাবে জুলিয়ার সোনালী চুল। ওর জন্যে সুন্দর একটা ব্রিটিশ পাসপোর্টও তৈরি হয়ে যাবে আর এক ঘণ্টার মধ্যে। তারপর নিশ্চিন্ত মনে এগোব আমরা সুইস বর্ডারের দিকে। বর্ডার পুলিস সতর্ক থাকবে। কিন্তু কি আশা করবে ওরা? ওরা নজর রাখবে ব্রনসন বলে কোন লোক জুলিয়া কার্টারেট বলে একজন ব্লন্ড মেয়েকে নিয়ে নীল অ্যাস্টন মার্টিন গাড়িতে করে বর্ডার পেরোবার চেষ্টা করে কিনা। সবুজ পীগট গাড়িতে করে দুইজন ভিন্ন নামের পুরুষের সাথে একজন ব্রুনেট মেয়েকে যেতে দেখলে একবারের জায়গায় দু'বার চেয়ে দেখবে না ওরা।'

অ্যাস্টনের ফুলস্পীড তুলে ছুটছে হ্যানসিঙ্গার। বলল, 'একবিন্দুও

ভড়কাওনি দেখছি, হুগো?'

'ভয় পাওয়ার কোন কারণ ঘটেনি এখনও··· তোমার এই বেপরোয়া গাড়ি চালানোটা ছাড়া। দেখো, হুবার্ট, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কুনিয়োতে পৌছতে চাই ঠিকই, কিন্তু তুমি যেভাবে চালাচ্ছ তাতে মনে হচ্ছে বিদেহী আত্মাটা গিয়ে পৌছলে পৌছতে পারে, সশরীরে আর পৌছানো হবে না আমাদের। আর একটু আস্তে চালালে কেমন হয়?'

মৃদু হেসে গতি সামান্য একটু কমাল হ্যানসিঙ্গার। বলল, 'ভয় নেই, আমি রেনারের সমান ড্রাইভার না হতে পারি, কিন্তু নেক্সট বেস্ট।' পাশে বসা জুলিয়ার দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করে বলল, 'আর একে? একে কি করছি আমরা? এর ভাইয়ের গায়ে হাত তুলেই আজ আমাদের এই অবস্থা—লেজ তুলে পালাতে হচ্ছে। এর কোন ক্ষতি···'

'কোন ক্ষতি করব না,' বলল ব্রনসন চট করে। 'যদি ও বাড়াবাড়ি না করে, কোন চালাকির চেষ্টা না করে, কোন ক্ষতি হবে না ওর। ইনশিওরেন্স পলিসি হিসেবে নিয়ে চলেছি ওকে। ওর কল্যাণেই উদ্ধার পাব আমরা, যদি পুলিস ধাওয়া করে।'

'কিংবা মরিস রেনার?'

'হ্যাঁ! কিংবা মরিস রেনার যদি ধাওয়া করে। জুরিখে পৌছে একজন একজন করে আমরা যাব ব্যাংকে, অর্ধেক টাকা ক্যাশ করব, বাকি অর্ধেক ট্র্যান্সফার করব অন্যদেশে।'

'দু'জন একসাথে গেলে ক্ষতি কি?'

'একজনকে থাকতে হবে জুলিয়াকে আটকে রাখার জন্যে।'

'তার মানে জুরিখে পৌছেও গোলমাল আশা করছ?'

'না। গোলমালের চেষ্টা হতে পারে, কিন্তু গোলমাল হবে না। কনভিকশন তো দূরের কথা আমাদের অ্যারেস্ট পর্যন্ত করতে পারেনি ওরা। কাজেই আমাদের নাম্বারড্ অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বরদাস্ত করবে না জুরিখ ব্যাংক। তাছাড়া ভিন্ন নামে যাচ্ছি আমরা জুরিখে। কোন ভয় নেই। কাজ সেরেই ভেসে পড়ব আমরা নীল আকাশে।'

'তারপর নীল আকাশ থেকে নেমেই ঢুকব জেলে!' বলল হ্যানসিঙ্গার। 'আমাদের ফটোগ্রাফের টেলিপ্রিন্টেড কপি ততক্ষণে পৌছে যাবে পৃথিবীর প্রত্যেকটা এয়ারপোর্টে।'

'শুধু বড় বড়গুলোতে যাবে সেটা, যদি যায়। শিডিউলড ফ্লাইট যেসব জায়গা ছোঁয় সেসব জায়গায়। আমরা ক্লোটেন এয়ারপোর্ট থেকে উঠব আকাশে। ওখানে একটা প্রাইভেট ফ্লাইট ডিভিশন আছে, একজন পাইলটের সাথে খুব ভাল দোস্তিও আছে। জেনেভা যাচ্ছি বলে উঠব আমরা প্লেনে—অর্থাৎ কাস্টমসের ঝামেলা থাকছে না। তারপর কোথায় নামি সে দেখা যাবে। ক্লোটেন এয়ারপোর্টে ফিরে গিয়ে ও কসম খেয়ে বলবে যে হাইজ্যাক করা হয়েছিল ওকে। দশ হাজার সুইস ফ্র্যাংক পেলে খুশি হয়ে করবে ও কাজটা।

'বাব্বা! সব প্ল্যান সারা!' মুগ্ধ বিস্ময়ে তারিফ করল হ্যানসিঙ্গার।

প্রশংসায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ব্রনসনের মুখটা আত্মতৃপ্তির হাসিতে।

ভিগনোলেসের রেস্ট্র্যাকের পাশে চৌকোণ দালানটার সদর দরজার সামনে দাঁড়াল ল্যান্সিয়া। নিঃশব্দে।

'সোজা নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিন ভেতরে থেকে।' মাথা ঝাঁকিয়ে নামবার ইঙ্গিত করল রানা হ্যামারকে।

'আর তুমি?'

'আমিও শুয়ে পড়ব ঘরে গিয়ে। চোখ খুলে রাখতে পারছি না আর। কাল বেলা বারোটার আগে আর উঠছি না ঘুম থেকে। তার আগে গাড়িটা ওই ওপাশে লুকিয়ে রাখতে হবে।'

স্ত্রীর হাত ধরে নেমে গেল মাইকেল হ্যামার। এমনি সময় সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ফিলিপ কার্টারেট। উষ্কখুষ্ক চুল; উদভ্রান্ত চেহারা। দ্রুতপায়ে চলে এল গাড়ির কাছে।

'দুঃসংবাদ আছে, রানা। ব্রনসন পালিয়েছে।'

'যাক,' বলল রানা। 'ওকে ধরতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না।'

'জুলিয়াকে নিয়ে গেছে সাথে।'

ঝটাং করে দরজা খুলে বেরিয়ে এল রানা। 'বলেন কি! কতক্ষণ আগে?'

'আধঘণ্টা। নিজের ঘরে শুয়েছিলাম, গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ পেয়ে নেমে এসে দেখি ঘর খালি।' এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিল সে সামনে। 'এটা পেলাম ওর বাথরুমে।'

এক থাবা দিয়ে কেড়ে নিল কাগজের টুকরোটা মাইকেল হ্যামার। জোরে জোরে পড়ল: কুনিয়োতে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে ব্রনসন।

'চললাম,' বলেই গাড়িতে ওঠার উপক্রম করল রানা।

খপ করে রানার কোটের আস্তিন ধরল হ্যামার। 'তুমি না। আমি যাচ্ছি। একটু আগেই বলছিলে ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে...'

'এখন আর আসছে না। আপনি কথা দিয়েছেন, আজ রাতে আমার আদেশ মেনে চলবেন। এখুনি রওনা হতে হবে আমাকে, অযথা দেরি করিয়ে দেবেন না।'

'আমি তো সাথে যেতে পারি...'

'না। আমি আর মিস্টার কার্টারেট যাচ্ছি। আমরা জুলিয়াকে ফিরিয়ে আনা ছাড়াও এমন কিছু করব, যেটা আপনার না দেখাই ভাল। তাছাড়া মিসেস হ্যামার থাকবেন কোথায়? ফিরে এসে যদি দেখেন মিসেস হ্যামারকেও ধরে নিয়ে গেছে, তখন? ওঁকে পাহারা দেয়া ছাড়াও আরও কাজ আছে আপনার। আপনি এই অঞ্চলের কোটিপতি, অনেক বড় বড় ফার্মের মালিকের সাথে পরিচয় আছে আপনার। এখন থেকে কুনিয়ো যাওয়ার একটাই রাস্তা। আপনি নিসে ফোন করে পরিচিত কোন বড়সড় পরিবহন সংস্থা বা ট্রাকিং ফার্মকে অনুরোধ করুন যেন কোল ডে টেন্ডের কাছে রাস্তা জুড়ে দাঁড় করিয়ে দেয় গোটা দুই ট্রাক। বুঝতে পেরেছেন? খরচ যা লাগে দেয়া যাবে, কোন

অবস্থাতেই যেন ওরা বাধা পেরিয়ে…'

কথা শেষ হওয়ার আগেই হল ঘরের দিকে ছুটল হ্যামার স্ত্রীর হাত ধরে। বলতে বলতে গেল, 'ঠিক আছে, কোন চিন্তা নেই, আমার এক বন্ধু আছে…'

অর্ধেক পথ একটি কথাও বলল না কেউ। প্রধান কারণ, কথা বলবার মত মানসিক অবস্থায় নেই দু'জনের কেউই, দ্বিতীয় কারণ, রানার সমস্ত মনোযোগ রয়েছে গাড়ি চালানোর দিকে—এক পক্ষ এত মন দিয়ে কোন কাজ করলে আলাপ জমানো দুরূহ কাজ। আর তৃতীয় কারণ, এতই বেগে ছুটেছে ল্যান্সিয়া যে প্রাণটা গলার কাছে এসে ধুক-ধুক করেছে ফিলিপ কার্টারেটের—কথা বলবার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে প্রায়, আঁধার দেখছে সে চোখে, আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সামনের দিকে—ঠিক কিসের সাথে ধাক্কা খেয়ে মারা যাচ্ছে, যেন সেটা বুঝে নিতে চায় মরার আগে।

সোজা রাস্তা পেলেই সেই বিশেষ বোতামটা টিপে দিচ্ছে রানা, বুলেটের বেগে ছুটছে ল্যান্সিয়া, বাঁকাচোরা রাস্তায় এসে অফ করে দিচ্ছে বোতাম, কিন্তু তবু যে স্পীড থাকছে সেটা যে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক আরোহীর আত্মারাম খাঁচাছাড়া করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

ক্যানেস এবং নিসের মধ্যকার অটোরুট ধরে চলছে এখন ওরা। চট করে স্পীড মিটারের দিকে এক নজর চেয়েই চক্ষুস্থির হয়ে গেল বৃদ্ধের। দুশো কিলোমিটার—অর্থাৎ, একশো ত্রিশ মাইলেরও বেশি। এখনও বেঁচে আছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে নিজের গালে চিমটি কাটল একটা। রানাকে স্পীড কমাতে বলার প্রশ্নই ওঠে না। শখ করে বা ফুর্তির জন্যে এত জোরে চালাচ্ছে না সে—এই গতির উপরই নির্ভর করছে জুলিয়ার বাঁচা-মরা। যেমন করে হোক ধরতে হবে আধঘণ্টা আগে ছেড়ে দেয়া গাড়িটাকে। সেটা বুঝতে পেরেই সীটবেল্ট বাঁধা অবস্থাতেও দাঁতে দাঁত চেপে, দরজার একটা হাতল আঁকড়ে ধরে খাড়া হয়ে বসে আছে ফিলিপ কার্টারেট, নইলে অনেক আগেই রানাকে স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়ে নেমে যেত সে গাড়ি থেকে।

সামান্য একটু ব্রেক করল রানা গিয়ার ডাউন করে। তারপর রাস্তার উপর চার চাকার তীব্র আর্তনাদ উপেক্ষা করে মোড় নিল প্রায় নব্বই মাইল স্পীডে। নিঃসন্দেহে বলে দেয়া যায়, যত ভাল ড্রাইভারই হোক, এই বাঁকে পঞ্চাশ মাইল স্পীডে মোড় নিতেও কলজে কেঁপে যাবে যে-কোন লোকের।

চোখ বুজে ফেলেছিল ফিলিপ কার্টারেট, আবার হ্যাঁচকা টানে গাড়ির গতি বাড়ছে দেখে বুঝতে পারল মারা যায়নি এখনও। সভয়ে চোখ খুলল আবার। বলল, 'দারুণ গাড়ি চালাও তুমি, রানা। রেস-ড্রাইভারকে এত ভয়ঙ্কর সব ঝুঁকি নিতে হয় জানা ছিল না আমার।'

'তিনমাস আগে আমারও জানা ছিল না যে এইসব আপাত-দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি আসলে ঝুঁকি নয়—দক্ষতা। এজন্যে চিরকৃতজ্ঞ থাকব আমি মিস্টার হ্যামারের কাছে। উনি হাতে ধরে শিখিয়েছেন আমাকে আশ্চর্য কিছু

টেকনিক।'

'তোমাকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি আমি, রানা। এই বয়সে এত বিনয় এল কি করে তোমার মধ্যে। তোমার কথা শুনে মনে হয় মাইকেল বুঝি আর কাউকে শেখায়নি টেকনিকগুলো। টীমের সবার প্রতি সমান ভালবাসা ওর। কই, আর কেউ তো টেকনিক শিখে নিয়েই সেরা ড্রাইভার হয়ে যেতে পারল না? এখন যদি আমি তোমার সাহায্যের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে যাই, ওমনি তুমি বলবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন প্রয়োজন নেই, কোলিগের জন্যে করছ কাজটা।'

'সেটা বললে তো মিথ্যে বলা হবে না, মিস্টার কার্টারেট। সত্যিই তো জুলিয়া আমার কোলিগ।' হাসল রানা। 'অন্তত এখন পর্যন্ত একই টীমে কাজ করি আমরা।'

আরেকটা বাঁক নিতে দেখে চোখ বন্ধ করল কার্টারেট, আবার সোজা রাস্তায় এসে চোখ খুলল। বলল, 'অর্থাৎ কাল থেকে তুমি আর কাজ করছ না ব্লু অ্যাঞ্জেলে?'

'না।'

'রেস ড্রাইভিং ছেড়ে দিচ্ছ? জগৎজোড়া খ্যাতি এখন হাতের মুঠোয়—এটা হারাতে খারাপ লাগবে না তোমার?'

'নাহ্। মরিস রেনারের খারাপ লাগতে পারে, আমার লাগবে না। কাল সকালে ছদ্মবেশ খুলে রেখে আমি চলে যাব প্যারিসে। ভিগনোলেসে ফিরছি না আর।'

নিস থেকে লা গিয়ানডোলা, অর্থাৎ এন টু-ও-ফোর সড়কটা শুধু যে আঁকাবাঁকা তাই নয়, উঁচু-নিচুও। জায়গায় জায়গায় তিন হাজার ফুট উঁচু হয়ে গেছে রাস্তাটা, তার উপর রয়েছে কয়েকটা মারাত্মক হেয়ারপিন বেন্ড। কিন্তু রানা ছুটেছে এমন ভাবে, যেন এটা সাধারণ একটা অটোরুট।

নির্জন রাস্তা। কোল ডে ব্রাউস পেরিয়ে সসপেলের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গেল, কোল ডে ব্রুইস পেরিয়ে চলে এল লা গিয়ানডোলায়। পথে একটা গাড়িরও দেখা পাওয়া গেল না। এবার উত্তরে ছুটল ল্যান্সিয়া, সাওর্জ, ফনটান পেরিয়ে পৌঁছে গেল টেন্ডে শহরে। অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে অনেকটা আপন মনেই বলে উঠল বৃদ্ধ, তোমাকে পেয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছিল মাইকেল। তোমার অভাব বড় বেশি করে অনুভব করবে মানুষটা।'

'কিন্তু আমি আমার আগের কাজে ফিরে না গেলে আমার অভাব আরও বেশি করে অনুভব করবেন আরেকজন বৃদ্ধ। পঙ্গু হয়ে যাবেন…' থেমে গেল রানা কথার মাঝখানে। বলল, 'হ্যানসিঙ্গার!'

ঝট করে সামনের দিকে চাইল কার্টারেট। বহুদূরে লাল দুটো ব্যাগ লাইট দেখা যাচ্ছে। বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার সেই বিশেষ বোতামটা টিপে দিল রানা। ক্ষুধার্ত বাঘের মত লাফ দিল ল্যান্সিয়া সামনের দিকে।

'হ্যানসিঙ্গার? ওটা অ্যাস্টন মার্টিন? তুমি চিনলে কি করে?'

'গাড়িটা চিনতে পারিনি, কিন্তু চালানোটা চিনতে পেরেছি অনায়াসে। সামনে গাড়িটা যেভাবে চালানো হচ্ছে সেভাবে চালাবার ক্ষমতা রয়েছে সারা ইউরোপের মধ্যে বড়জোর ছয়জন লোকের। সেই ছয়জনের কে কেমন ভাবে গাড়ি চালায়, আমার মুখস্থ। হ্যানসিঙ্গারের অভ্যাস হচ্ছে টার্নিং-এর সময় ঠিক যখন ব্রেক করা দরকার তার একটু আগে ব্রেক করে অ্যাক্সিলারেটার চেপে ধরে বাঁক নেয়া।' টায়ারের কর্কশ আওয়াজ তুলে তীব্র বেগে বাঁক নিল ল্যান্সিয়া। আবার দেখা যাচ্ছে সামনের গাড়ির ব্যাক লাইট। এবার বেশ খানিকটা কাছে। রানা বলল, 'হ্যানসিঙ্গারই, কোন সন্দেহ নেই তাতে।'

সত্যিই সন্দেহ নেই। অ্যাস্টনের পিছনের সীটে বসা ব্রনসন বার বার উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাইছে পিছন ফিরে। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, 'হুবার্ট, পিছনে আসছে কারা যেন।'

'আসুক,' বলল হ্যানসিঙ্গার। 'এটা আমার বাপের রাস্তা নয় যে আপত্তি থাকবে। পাবলিক রোড যে কেউ ব্যবহার করতে পারে।'

'এটা যে কেউ নয়, হুবার্ট!' ব্রনসনের কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাসের আভাস উবে গেছে বেমালুম। 'লক্ষ করে দেখো, যে-কেউ এভাবে গাড়ি চালাতে পারে না। এগিয়ে আসছে কাছে। যে-কেউ হতেই পারে না!'

তুমুল বেগে উঠে যাচ্ছে দুটো গাড়ি কোল ডে টেন্ডের চূড়োর দিকে। বিপজ্জনক টার্নিং নিচ্ছে, ছুটছে আবার। উর্ধ্বশ্বাসে। ক্রমে এগিয়ে আসছে পিছনের গাড়িটা, দূরত্ব কমছে। আর একশো গজ! নব্বই! আশি!

'প্রস্তুত হয়ে নিন, মিস্টার কার্টারেট,' বলল রানা। পিস্তলটা বের করে রাখল সীটের পাশে। 'তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে জুলিয়াকে গুলি করবেন না যেন আবার।'

পকেট থেকে নিজের পিস্তল বের করল ফিলিপ কার্টারেট। বলল, 'রাস্তাটা ব্লক করা গেল কিনা কে জানে!'

রাস্তা আসলে ঠিকই বন্ধ হয়ে গেছে। একেবারে বন্ধ। বিশাল দুটো ফার্নিচার ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে রাস্তা জুড়ে, আটটা হেডলাইট একবার জ্বলছে, একবার নিভছে—যেন ঠাট্টা করছে।

শেষ বাঁকটা ঘুরেই তিক্তকণ্ঠে কুৎসিত কয়েকটা গালি দিয়ে উঠল হ্যানসিঙ্গার। ব্রেক চাপল। ভ্যানের কাছাকাছি এসে থেমে দাঁড়াল অ্যাস্টন মার্টিন। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে পিছন ফিরে চাইল হ্যানসিঙ্গার ও ব্রনসন, দু'জনই। জুলিয়াও চেয়ে আছে পিছনে, তবে ভয়ে নয়, আশায়।

'হঠাৎ দুটো ভ্যান রাস্তায় ফেঁসে গিয়ে রাস্তা জাম করে ফেলেছে, এটা হতেই পারে না। গাড়ি ঘোরাও, হুবার্ট। এটা আমাদের আটকাবার ব্যবস্থা। এসে পড়ল! ঘোরাও!'

শেষ বাঁকটা ঘুরল ল্যান্সিয়া। এগিয়ে আসছে হু-হু করে। পাগলের মত চেষ্টা করছে হ্যানসিঙ্গার গাড়িটা ঘুরাতে, কিন্তু তার আগেই এসে পড়ল ল্যান্সিয়া। ব্রেক চাপল রানা, কিন্তু এমন ভাবে, যে সোজা এসে অ্যাস্টন

মার্টিনের পেটে চুঁশ খেয়ে তারপর থামল ল্যান্সিয়া। ব্রনসনকে পিস্তল বের করতে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'ব্রনসনকে তাক করুন! হ্যানসিঙ্গারকে মারতে গেলে জুলিয়ার গায়ে লাগবে।'

সামনে ঝুঁকে একসাথে গুলি করল রানা ও কার্টারেট। তার আগেই ব্রনসনের গুলি লেগে চুর হয়ে গেল ল্যান্সিয়ার উইন্ডস্ক্রীন। গুলি করেই নিচু হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু একসাথে দুটো গুলি প্রবেশ করল ওর বাম কাঁধে। চিৎকার করে উঠল ব্রনসন। এদিকে গাড়িটা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে হ্যানসিঙ্গার পাগলের মত। গোলমালের মধ্যে সুযোগ বুঝে ঝটাং করে ওপাশের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল জুলিয়া—ব্রনসন বা হ্যানসিঙ্গার ঠেকাবার চেষ্টা করবার আগেই।

নিচু হয়ে রয়েছে হ্যানসিঙ্গার, কপালটা শুধু দেখা যাচ্ছে উইন্ডস্ক্রীনের নিচের দিকে, কোনমতে সরিয়ে নিল গাড়িটা, তারপর ল্যান্সিয়ার বাম্পারটা ভেঙে দিয়ে ছুটল উল্টোদিকে। ঠিক চার সেকেন্ডের মধ্যে ঘুরিয়ে নিল রানা ল্যান্সিয়া। এরই ফাঁকে একলাফে গাড়ি থেকে নেমে হাত ধরে টেনে তুলে ফেলল কার্টারেট জুলিয়াকে। ব্যস্ততার মধ্যেও ঠোঁটজোড়া মেয়ের কপালে ছোঁয়াতে ভুলল না। ওরা দু'জন গাড়িতে উঠে আসতেই ছুটল রানা। এক থাবড়া দিয়ে ধসিয়ে দিল উইন্ডস্ক্রীনের চুর হয়ে যাওয়া একাংশ। বাকিটুকু পিস্তলের বাঁট ঠুকে পরিষ্কার করে ফেলল কার্টারেট। জুলিয়াকে পিছনের সীটে মাথা নিচু করে বসে থাকবার নির্দেশ দিয়ে সীট ডিঙিয়ে সামনে চলে এসেছে ফিলিপ কার্টারেট, পিস্তলটা অ্যাস্টন মার্টিনের দিকে তাক করে গুলি শুরু করল। পাগলের মত নেমে আসছে রানা কোল ডে টেন্ডের পাহাড় থেকে, যে গতিতে বাঁক নিচ্ছে তাতে আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠার কথা ফিলিপ কার্টারেটের, কিন্তু তার পরিবর্তে ধকধক করে জ্বলছে বৃদ্ধের চোখ, বিড় বিড় করছে আপন মনে। 'এতদিনে পেয়েছি তোকে, ব্রনসন! পল, তোর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব এবার, নিয়েই ছাড়ব, দেখিস!'

'হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসল জুলিয়া। রানার বেপরোয়া গাড়ি চালানো দেখে চেঁচিয়ে উঠল সে।

'এ কী করছ, রানা! সবাই মিলে মারা পড়ব তো?'

'ভয় নেই,' বলল রানা। 'আজ রাতে মরণ নেই আমাদের। যদি কেউ মারা পড়ে, মরবে ওরা দু'জন।'

'কিন্তু…কিন্তু পুলিসই তো ধরতে পারবে ওদের। আমরা ঝুঁকি না নিলেই কি নয়? পুলিস…'

'ওরা পুলিসের হাতে ধরা পড়লে তোমার বা তোমার বাবার কি লাভ হলো? আমার তিন মাসের খাটুনিরই বা কি ফল পাওয়া গেল? পলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চাও না তুমি?'

কোন জবাব দিল না জুলিয়া। একশোবার চায় সে ভাইয়ের হত্যার বদলা নিতে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি ঠিক জানো যে ব্রনসনই দায়ী

পলের মৃত্যুর জন্যে?'

'প্রমাণ আছে আমার হাতে। কিন্তু এখন তা দেখাতে পারব না তোমাকে। জেনে রাখো, আমরা অন্যায় কিছুই করছি না। ব্রনসনই তোমার ভাইয়ের হত্যাকারী, হ্যানসিঙ্গার তার সহযোগী।'

আর একটি কথাও বলল না জুলিয়া।

হ্যানসিঙ্গারও প্রাণপণে চালাচ্ছে, কিন্তু রানার সাহস, ওর মত ইস্পাতের স্নায়ু আর দক্ষতা থাকলে অনেক আগেই ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যেত সে, বে-আইনী ভাবে টাকা রোজগারের প্রয়োজন থাকত না। পঞ্চম বাঁকেই ধরে ফেলল রানা অ্যাস্টন মার্টিনকে। কয়েক গজ সামনে তাড়া খাওয়া কুকুরের মত লেজ দাবিয়ে ভাগছে।

'আর গুলি করবেন না,' বলল রানা হঠাৎ।

'কেন?'

'গুলি শেষ হয়ে গেছে আপনার পিস্তলের,' মৃদু হাসি খেলে গেল রানার ঠোঁটে।

ফিলিপ কার্টারেটের চোখের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। এই গোলমালের মধ্যে কয়টা গুলি করেছে সেকথা তার নিজেরই মনে নেই যখন, মাসুদ রানা নির্ভুলভাবে বলে দেয় কি করে? পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে সামনের দিকে লক্ষ্য করে চাপ দিল ট্রিগারে। ক্লিক করে শব্দ হলো শুধু—গুলি বেরোল না। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কার্টারেট, কিন্তু তার আগে রানাই কথা বলে উঠল।

'ওই সামনের বাকেই শেষ করে দিই, কি বলেন?'

জবাব দেয়ার সময় ছিল না, এসে গেল হেয়ারপিন বেন্ড, ডানদিকে বাঁক। বাঁক নিচ্ছে হ্যানসিঙ্গার। ব্রেক না চেপে অ্যাক্সিলারেটর টিপে ধরল রানা ফ্লোর বোর্ডের সাথে। পিছন থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল জুলিয়া। সাঁই সাঁই করে স্টিয়ারিং কাটল রানা, কিন্তু গতির আতিশয্যে বাম পাশে খাদের দিকে সরে যাচ্ছে গাড়িটা মারাত্মক ভঙ্গিতে। যেন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু না। হিসেব করেই করেছে রানা কাজটা। দড়াম করে অ্যাস্টন মার্টিনের পেটে ধাক্কা দিল ল্যান্সিয়া পেট দিয়ে। ল্যান্সিয়ার পতন ঠেকিয়ে দিল অ্যাস্টন মার্টিন ঠিকই, কিন্তু নিজে চলে গেল আয়ত্তের বাইরে। ধাক্কা খেয়ে রাস্তার মাঝখানে ফিরে এসেছে ল্যান্সিয়া, থেমে এসেছে গতি। ব্রেক চাপল রানা, পুরোপুরি থেমে দাঁড়াবার আগেই হ্যান্ডব্রেক টেনে দিয়ে ঝটাং করে দরজা খুলে লাফিয়ে নামল রাস্তায়। কোনাকুনি খাদের দিকে এগিয়ে গেল অ্যাস্টন মার্টিন, রাস্তা ছেড়ে অর্ধেকটা শরীর বেরিয়ে যেতেই ডিগবাজির ভঙ্গিতে উল্টাতে শুরু করল। দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল রানা খাদের কিনারায়। ফিলিপ কার্টারেট ও জুলিয়াও ছুটে এল।

নিচের দিকে একবার চেয়েই চক্ষুস্থির হয়ে গেল জুলিয়ার। বহু নিচে—অন্তত দু'হাজার ফুট হবে—আলো দেখা যাচ্ছে একটা। অদৃশ্য হয়ে গেছে অ্যাস্টন মার্টিন। পাহাড়ের গায়ে কোথাও ঠোকর খেল, শব্দ পাওয়া

গেল। পরমুহূর্তে কয়েকশো ফুট নিচে আবার দেখতে পেল ওরা গাড়িটাকে। এখনও নামছে, কিন্তু মনে হচ্ছে একটা মশাল জ্বেলে নিয়েছে কোথায় যাচ্ছে দেখার সুবিধের জন্যে। দাউ দাউ করে আগুন জলছে এঞ্জিন কম্পার্টমেন্টে। অদৃশ্য হয়ে গেল আবার। বেশ কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ, তারপর বহু নিচে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল, কয়েকশো ফুট উঁচু হয়ে উঠল আগুনের শিখা। তারপর এসে পৌঁছল পতনের কর্কশ শব্দ। তারপর আবার সব নিঝুম, নিস্তব্ধ।

মস্ত বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'চলুন, রওনা হওয়া যাক। এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হচ্ছে না।'

যেন একটা দুঃস্বপ্নের ঘোরে ছিল, চমকে বাস্তবে ফিরে এল দু'জন।

হঠাৎ রানার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জুলিয়া। 'তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই আমাদের, মাসুদ ভাই।' কৃতজ্ঞতায় চোখের জল বেরিয়ে এল জুলিয়ার।

দুই হাতে জুলিয়াসহ রানাকে জড়িয়ে ধরল ফিলিপ কার্টারেট। 'তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম আমরা, রানা। তোমার এই ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব না।'

বুড়োর গলাটাও ভেজা ভেজা হয়ে আসছে দেখে আর্তনাদ করে উঠল রানা। 'আপনারা দু'জন মিলে ঠেসে ধরলে দম বন্ধ হয়েই মারা যাব! ছাড়ুন, ছাড়ুন!'

রানাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা গিয়ে ড্রাইভিং সীটে বসল জুলিয়া। বুড়ো আঙুল দিয়ে পিছনের সীট দেখাল রানাকে, বলল, 'বিশ্রাম করো। ভয়ানক ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।'

পিছনের সীটে রানার পাশে উঠে বসল ফিলিপ কার্টারেট। গাড়ি রওনা হয়ে গেল। পাঁচ মিনিট চুপচাপ বসে থেকে রানার কাঁধের উপর হাত রাখল কার্টারেট।

'রানা, তুমি বলেছিলে আমাদের কাজটা শেষ হলে তারপর তোমার কাজের কথা বলবে। আমাদের কাজ শেষ। এবার বলো তো, কি কাজে চলেছিলে তুমি প্যারিসে?'

এক গাল হাসল রানা। 'কিছু মনে করবেন না। আমি প্যারিসে যাচ্ছিলাম একজন অত্যন্ত কড়া লোকের মন ভজাতে। বাংলাদেশ থেকে পাঠানো হয়েছিল আমাকে পেরেকের মত শক্ত এক ক্ষমতাশালী বৃদ্ধের সহযোগিতা আদায় করবার জন্যে।'

'কে? কি নাম তার?'

'তার নাম ফিলিপ কার্টারেট।' হাসল রানা। 'ইন্টারপোলের নারকোটিক সেকশনের চীফ।'

এক মিনিট হাঁ করে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধ, কোন কথা সরল না মুখে। তারপর সামলে নিয়ে বলল, 'ধন্য দেশের ধন্যি ছেলে! বুঝতে পেরেছি এবার। সব বুঝতে পেরেছি। গত তিনটে মাসে তোমার সম্বন্ধে অসংখ্য 'কেন' এসে ভিড় করেছে আমার মনে, কোনটারই সদুত্তর পাইনি—

এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে সব। ওফ, অনেক আগেই বুঝতে পারা উচিত ছিল আমার! তুমি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে এসেছ অ্যামস্টারডামে কিছু কাজ করবার ব্যাপারে। তাই না? তোমাকে পাঠিয়েছেন আমার চেয়েও শক্ত আর এক বৃদ্ধ—মেজর জেনারেল রাহাত খান। তাই না? আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম আগের ছেলেটাকে...'

'তখন আপনার মানসিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল।'

'ঠিক সেজন্যে নয়, রানা। পলের মৃত্যুতে খুব আপসেট ছিলাম ঠিকই, কিন্তু আসলে আমি কল্পনাও করতে পারিনি এত উঁচু মানের যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। তোমাদের প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম তোমাদের অযোগ্য মনে করে। ছি! এতবড় ভুল বোধহয় জীবনে করিনি আর। আমার কপাল ভাল যে ভুলটা শোধরাবার সুযোগ পেয়েছি তোমার মাধ্যমে।'

'মত পাল্টাচ্ছেন তাহলে?'

'একশোবার! সকালের ফ্লাইটে আমিও ফিরছি প্যারিসে। চলো, আমার ওখানেই উঠবে। কালই অফিসে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দেব।'

'ভেরি গুড। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'আমাকে ধন্যবাদ দেয়ার কিছুই নেই, রানা। ধন্যবাদ আমি দেব তোমাকে। তোমার করুণায় আজ রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাব আমি। বহুদিন পর। এখনই চোখ ভেঙে ঘুম আসছে আমার। এর সাথে ওটা জড়াতে যেয়ো না কখনও, তাহলে আমার ওপর অবিচার করবে, বাবা। তুমি আমাকে সাহায্য করেছ বলেই যে আমি তোমার দেশকে সাহায্য করব, তা নয়। আমার সহযোগিতা অর্জন করে নিয়েছ তুমি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে। বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝেছি। ঘুমিয়ে পড়বার আগে আমারও একটু ব্যাখ্যা দেবার আছে। দয়া করে ভুলেও মনে করবেন না, যে আপনাকে ঋণী করবার জন্যে সাহায্য করেছিলাম আমি আপনাদের। আসলে জুলিয়ার ঋণ শোধ করবার জন্যে নেমেছিলাম আমি এই কাজে। ওকে সাহায্য না করে উপায় ছিল না আমার। যখন অবলীলাক্রমে বড় ভাইয়ের আসনে বসিয়ে দিল আমাকে, উপায়ান্তর ছিল না কোন। প্যারিস থেকে ফিরে আমি ঠিকই খুঁজে বের করতাম ব্লু অ্যাঞ্জেল টীম, আপনি এসে হাজির হওয়ায় দেরির প্রয়োজন আর থাকল না, বিনা দ্বিধায় যোগ দিলাম ওর টীমে। আর তিনটে মাস কেটে গেল মহানন্দে। যাই বলুন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উপভোগ করেছি আমি প্রতিটি দিন। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে কেটেছে সময়টা।'

'ওর ঋণ বলছ কেন, রানা?'

'আমার বাবা-মা-ভাই-বোন কেউ নেই কিনা, কেউ বড় ভাই ডেকে বসলে ঋণী হয়ে পড়ি। মনে হয় এই কঠিন দুনিয়াতে আমি আর একা নই।'

কয়েক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল বৃদ্ধ, তারপর ওর কাঁধে দুটো চাপড় মেরে চোখ বুজল সীটে হেলান দিয়ে। রানাও চোখ বুজল।

ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীরটা।

পাগল বৈজ্ঞানিক

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৭৬

এক

উলঙ্গ ঠিক বলা যায় না ওকে।

ছোট্ট একটা সাদা কাপড়ের ত্রিভুজ রয়েছে মেয়েটির পরনে। টু-পিস বিকিনির বাকি এক চিলতে সিল্ক দিয়ে কষে বাঁধা রয়েছে বুক। বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছে সাদা কনভার্টিবল স্পোর্টস কার। হাওয়ায় নিশানের মত উড়ছে লম্বা সোনালী চুল।

একহাতে স্টিয়ারিং ধরে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে মেয়েটা রাস্তার দিকে। এঁকে বেঁকে চলে গেছে পিচ-ঢালা রাস্তা ভূমধ্যসাগরের উত্তর তীর ঘেঁষে। পড়ন্ত বিকেলের ম্লান রোদ পড়ে ঝিলমিলে সোনালী হয়ে গেছে সাগরের এক অংশ। নীরবে উড়ছে সী-গাল ঘুরে ঘুরে। শান্ত, সমাহিত, স্নিগ্ধ পরিবেশ।

ডানদিকে মোড় নিল গাড়িটা। সোজা সমুদ্রের দিকে চলে গেছে একটা 'কজওয়ে'। ব্রিজটা ডিঙিয়েই দেখা গেল কলিনকে।

সিকি মাইল দূরে গার্ড-রেইলে হেলান দিয়ে ছিপ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল কলিন, ঘাড় ফিরিয়ে সাদা কনভার্টিবলটাকে দেখল। মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। মেয়েটার দিকে হাত নেড়ে রীল ঘুরিয়ে তুলে ফেলল বড়শী, ছিপটাকে রেলিঙের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে এল কয়েক পা। গাড়ির গতি কমিয়ে ডান হাতটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে একটা উড়ন্ত চুম্বন উপহার দিল মেয়েটি ওকে। প্রাথমিক দু'য়েকটা কথার পর নামবে ওরা সাগরে। মনের সুখে সাঁতার কেটে উঠে আসবে বালুকা বেলায়। তারপর কি ঘটবে ভাবতে গিয়ে আরও একটু বিস্তৃত হলো কলিনের মুখের হাসি। আরও এক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

ও কি! হঠাৎ বেড়ে গেল কেন গাড়ির গতি!

সগর্জনে ছুটে আসছে কনভার্টিবল সোজা ওর দিকে। মুহূর্তে মিলিয়ে গেল ওর মুখের হাসি হাসি ভাবটা, পরমুহূর্তে ফুটে উঠল তীব্র আতঙ্ক। পিছাতে গিয়ে হোঁচট খেল সে। বুকের ওপর উঠে এল গাড়িটা। ভয়ে কুঁকড়ে বসে পড়েছে কলিন। দড়াম করে সামনের বাম্পারের সঙ্গে ধাক্কা খেল ওর বুকটা। ছিটকে গিয়ে পড়ল সে গার্ড-রেইলের উপর। প্রাণপণে স্টিয়ারিং ঘোরাল মেয়েটা শেষ মুহূর্তে। গার্ড-রেইলের সঙ্গে প্রেমিকের দেহটা থেঁতলে পিষে দিয়ে এগিয়ে গেল কয়েক গজ। জোরে ব্রেক কষে থামাল গাড়িটা। চিঁ হিঁ হিঁ আওয়াজ তুলল টায়ারগুলো পিচের ওপর দিয়ে গজ দুয়েক ছেঁচড়ে যাওয়ায়।

ঘাড় ফিরিয়ে কলিনকে একবার দেখে নিল মেয়েটা, তারপর ব্যাক গিয়ার দিয়ে নিয়ে এল গাড়িটা গার্ড-রেইলের খুব কাছ ঘেঁষে। আবার চ্যাপ্টা হয়ে গেল একতাল মাংসপিণ্ডের মত কলিনের রক্তাক্ত শরীরটা, অদৃশ্য হয়ে গেল চাকার নিচে। আরও খানিকটা পিছিয়ে আবার সামনের দিকে চলল গাড়ি। এবার কলিনের গলার ওপর দিয়ে চলে গেল পর পর দুটো চাকা। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে কলিনের থেঁতলে যাওয়া শরীরের ওপর দিয়ে আর একবার ডিঙাল প্রেমিকা। এবার আর থামল না—গর্জন তুলে ফিরে চলে গেল গাড়িটা শহরের দিকে।

ক্যাপ্টেন সন্ডার্সের ভাড়াটে ফিশিং বোটটাকে লক্ষই করেনি মেয়েটা। ব্রিজের নিচে ছিল ওটা। দূর থেকে পুরো ঘটনাটাই দেখল সন্ডার্স। যখন কলিনের পাশে এসে পৌঁছল তখনও প্রাণ-স্পন্দন রয়েছে কলিনের দেহে। মুখটা একেবারে থেঁতলে গেছে। চেনার উপায় নেই। থুতনির যেটুকু অংশ ভাল আছে তার ওপর দিয়ে কষ গড়াচ্ছে। সেই সঙ্গে রক্ত। হাত-পা যে ভঙ্গিতে পড়ে আছে তাতে বোঝা যায় মাল্‌টিপল্‌ ফ্র্যাকচার হয়েছে একাধিক জায়গায়। হাঁটু গেড়ে বসে কানের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার করল ক্যাপ্টেন সন্ডার্স, 'এই যে মিস্টার, কি হয়েছে? শুনতে পাচ্ছেন?'

সামান্য একটু ফাঁক হলো চোখের পাতা। রক্তাক্ত ঠোঁটদুটো কাঁপল একটু। কিছু বলবার চেষ্টা করছে সে। একটু আওয়াজ বেরোল গলা দিয়ে। আরও খানিকটা ঝুঁকে এল সন্ডার্স। 'এক…' ফুঁপিয়ে শ্বাস নিল কলিন। 'অ্যাকোয়া…' আর শোনা গেল না কিছু। শিথিল হয়ে গেল মুখের পেশী। চোখের পাতা বুজে গেল ওর। মাথাটা একটু হেলে পড়ল ডানদিকে।

পাল্‌স দেখে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন সন্ডার্স।

প্যারিসের অত্যন্ত বিখ্যাত এক রেডিও এবং ইলেকট্রোনিকস-এর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শো-কেস পর্যবেক্ষণ করছে রানা। মাস চারেক আগে ঢাকা থেকে রওনা হবার সময় এক লম্বা লিস্টি দিয়েছিল গিলটি মিঞা। 'রানা এজেন্সী'র জন্যে গোটাকয়েক ইলেকট্রোনিক ডিভাইস দরকার তার। বারবার করে সাবধান করে দেয়া সত্ত্বেও লিস্টটা হারিয়ে ফেলেছে রানা। কি কি যন্ত্রপাতি চেয়েছিল গিলটি মিঞা আন্দাজও করতে পারছে না, কারণ একবারও চোখ বুলায়নি সে লিস্টের ওপর। ইউরোপের কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ ব্যাপারটা মনে পড়ায় একেবারে অকূল পাথারে পড়ে গেছে সে। আগামীকাল সকালের টিকেট কেটে বসে আছে সোহানা, এখান থেকে গিলটি মিঞার সঙ্গে যোগাযোগ করবার কোন উপায় নেই, কাজেই অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়বারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা। একেবারে খালি হাতে ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। গিলটি মিঞা এমনিতেও চটবে, ওমনিতেও—তবু যদি যা-হোক-কিছু দিয়ে ওকে খুশি করা যায় সে চেষ্টা করাই ভাল।

বিরাট স্বচ্ছ কাঁচের ওপাশে সাজানো যন্ত্রপাতিগুলোর ওপর নজর

বোলাচ্ছে আর চিন্তা করছে রানা ঠিক কি ধরনের কি জিনিস গিলটি মিঞার পক্ষে চাওয়া সম্ভব, কি নিলে খুশি হবে। একটা নতুন মডেলের থ্রী-হেড ফিলিশেভ পছন্দ হলো ওর, কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝতে পারল এ জিনিস কিছুতেই ব্যবহার করবে না গিলটি মিঞা। ব্যক্তিগত প্রত্যেকটা ব্যাপারে ওর নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ রয়েছে, নিজের রুচির বাইরে ওকে দিয়ে কিছুই করানো যাবে না। আচ্ছা, ফটো ইলেকট্রিক সেল বা ইনফ্রা রে-র কোন বার্গলার্স অ্যালার্ম জাতীয় কিছু নেবে? বলেছিল, অফিস চালাতে হলে ওর ওসব জিনিস দরকার-- কি কি দরকার হতে পারে একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটারের? চট করে মনে পড়ল টেপ-রেকর্ডার, মিনি মাইক্রোফোন, ইত্যাদি কয়েকটা যন্ত্রপাতির কথা।

সাত-পাঁচ ভেবে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। মেইন এন্ট্রান্সের সামনেই নো-পার্কিং লেখা একটা সাইনবোর্ডের গায়ে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সাদা রঙের কনভার্টিবল। পার্কিং অফেন্সের জন্যে ঠিক ওয়াইপারের নিচে সেলোটেপ দিয়ে আঁটা রয়েছে পুলিসের হলুদ পার্কিং টিকেট। হাসল রানা—এই ভয়েই প্রায় পৌনে একমাইল দূরে জায়গামত গাড়ি পার্ক করে পায়ে হেঁটে এসেছে সে এতদূর।

বাহ! চমৎকার ফিগার তো মেয়েটার! এমন আকর্ষণীয় ব্লন্ডি সচরাচর চোখে পড়ে না। দোকান থেকে বেরিয়েই সামনে পার্ক করা সাদা গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটা। হাতে মাঝারি সাইজের একটা পার্সেল। পার্সেলটা পেছনের সীটে রেখে ড্রাইভিং সীটে বসল মেয়েটা। নজর গেল ওর পার্কিং টিকেটটার দিকে। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওটা নিয়ে গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে রেখে দিল। তারপর ওপাশের দরজাটা খুলে দিল ওর সঙ্গীর জন্যে। এতক্ষণ মেয়েটাকেই লক্ষ করছিল রানা, বেশ কিছুটা পেছনে যে ওর আরেক সঙ্গী রয়েছে সেটা খেয়াল করেনি। আবছাভাবে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে দোকানে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল রানা। ঝট করে চাইল আবার।

কবির চৌধুরী না?

অস্বাভাবিক লম্বা এক লোক, প্রকাণ্ড এক মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল, জুলফির কাছে পাক ধরেছে। উঠে বসল লোকটা প্যাসেঞ্জার সীটে। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানার দিকে। তিন সেকেন্ড স্থির থাকল দৃষ্টিটা রানার ওপর, তারপর নির্বিকার ভঙ্গিতে ফিরিয়ে নিল চোখ। হুশ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

একলাফে রাস্তার ওপর চলে এল রানা। ট্যাক্সির জন্যে চাইল এদিক ওদিক। একটা খালি ট্যাক্সিও চোখে পড়ল না। নিজের ল্যান্সিয়াটা রয়েছে পৌনে একমাইল দূরে। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। পিছু নেয়ার কোন উপায় নেই। অসহায় বোধ করল রানা। কিন্তু করবার কিছুই নেই।

ফুটপাথ ডিঙিয়ে দোকানে ঢুকল রানা। এখানে কিছু তথ্য পাওয়া অসম্ভব নয়। কয়েক পদের বার্গলার্স অ্যালার্ম, মিনি ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, মাইক্রোফোন, ইত্যাদি পছন্দ করল সে কয়েকটা কাউন্টারে। প্রত্যেক

কাউন্টারেই জিজ্ঞেস করল স্বর্ণকেশী আর তার সঙ্গীর কথা। ইনফ্রা রেড লেন্স ফিট করা একটা শক্তিশালী বিনকিউলার কিনতে গিয়ে অনুকূল সাড়া পাওয়া গেল সেলসগার্লের কাছে।

'হ্যাঁ। চিঠিতে স্পেশাল অর্ডার প্লেস করেছিলেন ওঁরা আগেই, আজ কালেক্ট করে নিয়ে গেলেন। কেন বলুন তো?'

'ভদ্রলোক আমার পরিচিত। দেশী মানুষ। দূর থেকে দেখলাম গাড়িতে উঠছেন। তাড়াতাড়ি হেঁটেও ধরতে পারলাম না, পৌঁছবার আগেই ছেড়ে দিল গাড়ি। যাক, ভালই হলো, আপনার কাছ থেকে ওঁর ঠিকানাটা পাওয়া যাবে। ওঁর সঙ্গে দেখা করা আমার একান্ত প্রয়োজন।'

একটু ইতস্তত করল মেয়েটা। রানার চোখের দিকে চেয়ে আশ্বাস খুঁজল। তারপর বলল, 'আপনি যখন বলছেন ভদ্রলোক আপনার বন্ধু, আপনাকে ঠিকানা দেয়া হয়তো তেমন দোষের কিছু হবে না। কিন্তু বুঝতেই পারছেন আমাদের কাস্টোমারদের সম্পর্কে এরকম ইনফরমেশন দেয়ার ঠিক নিয়ম···'

'বুঝতে পারছি,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আগামীকাল দেশে ফিরে যাচ্ছি আমি, হাতে সময় নেই, তাই আপনাকে বিরক্ত করা।'

'না, না। বিরক্ত কিসের।' একটা ফাইল বের করে কয়েকটা পাতা উল্টে একটা কাগজে চোখ রাখল মেয়েটা, কয়েক সেকেন্ড ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আপনার বন্ধুর নাম কি?'

প্রমাদ গুনল রানা। কবির চৌধুরী নিশ্চয়ই স্বনামে চিঠি দেয়নি ওদের। কি নাম নিয়েছে তা রানা জানবে কেমন করে? বলল, 'দেখুন, ও আমার একেবারে ছেলেবেলার বন্ধু। চৌধুরী বলে ডাকি আমরা ওকে। ওর পুরো নামটা জানবার দরকার হয়নি আমার কোনদিন।'

ফাইলটা বন্ধ করে আবার যথাস্থানে রেখে দিল সেলসগার্ল। 'দুঃখিত। উনি চৌধুরী নন। আপনি নিশ্চয়ই চিনতে ভুল করেছেন।' যেন ব্যাপারটার এইখানেই সমাপ্তি ঘটেছে, এমনি ভঙ্গিতে বিনকিউলারের মেমো কেটে দিল মেয়েটা।

আর কথা না বাড়িয়ে দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা।

'না, স্যার। আমি নিজের চোখে দেখেছি। কোন সন্দেহ নেই।'

'এক মিনিট।' পরিষ্কার ভেসে এল বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। ঠিক ত্রিশ মিনিট পর আবার কথা বলে উঠলেন তিনি, 'খুবই আশ্চর্যের কথা। ছ'মাস আগে ওকে বম্বে থেকে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে চালান করা হয়েছিল। এখনও ওর কলকাতাতেই থাকবার কথা—অথচ তুমি বলছ··· আচ্ছা এক কাজ করো। স্ট্যান্ড বাই—আধঘণ্টার মধ্যেই খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি আমি লেটেস্ট নিউজ।'

'থ্যাংক ইউ, স্যার। ওভার অ্যান্ড আউট।'

একটা সিগারেট ধরাল রানা। বিশাল, কাঁচ-ঢাকা মেহগনি ডেস্কের ওপাশে রিক্লাইনিং চেয়ারে বসে মিটিমিটি হাসছেন ফিলিপ কার্টারেট রানার দিকে চেয়ে। ইন্টারপোলের নার্কোটিক সেকশনের বাঘা চীফ ফিলিপ কার্টারেট। কিন্তু এখন যে অফিসটায় বসে আছেন সেটা হচ্ছে ফ্রান্সের গুপ্তচর বিভাগ ডুক্সেম ব্যুরোর চীফের খাস কামরা। এখান থেকে অবসর গ্রহণ করেই ইন্টারপোলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু হঠাৎ জরুরী তলবে ফিরে আসতে হয়েছে তাঁকে আবার ডুক্সেম ব্যুরোতে। ঠিক দু'হপ্তা আগে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত পাওয়া গেছে প্রাক্তন চীফকে তাঁর নিজের বেডরুমে। অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কাজের ভার নিতে হয়েছে ফিলিপ কার্টারেটকে।

আজ থেকে চার মাস আগে এই বৃদ্ধের কাছেই সাহায্য চাইবার জন্যে রওনা হয়েছিল রানা বাংলাদেশ থেকে। রানার আগে আরও দুই একজন এসেছিল, কট্টর বুড়োকে ভজাতে না পেরে বিফল হয়ে ফিরে গিয়েছিল দেশে—কাজেই সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে চলেছিল সে প্যারিসের পথে বন্ধু সালেহীনের লাল ল্যান্সিয়ায় চেপে। পথে প্রতিযোগিতার ছলে পরিচয় হয়ে গেল মহিলা গ্র্যান্ড-প্রি চ্যাম্পিয়ান জুলিয়ার সাথে। গ্র্যান্ড-প্রি প্রতিযোগিতায় নামার জন্য চেপে ধরল ওকে জুলিয়া—আব্দার ধরল ব্লু অ্যাঞ্জেল টীমের হয়ে চালাতে হবে গাড়ি। রানা চলেছে কাজে, এই রকম একটা অনুরোধ রক্ষা করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়, কাজেই নিরাশ করতে হলো মেয়েটাকে। পরদিন দুপুরবেলা নিসের এক রেস্তোরাঁয় বসে লাঞ্চ সারছে রানা, এমনি সময় গায়ে পড়ে আলাপ করল ওর সঙ্গে এক বৃদ্ধ। জানা গেল, লোকটা জুলিয়ার বাবা, গত বছরের নিহত চ্যাম্পিয়ান পল ছিল তার একমাত্র পুত্র। লোকটার ধারণা পলের মৃত্যুটা সাধারণ কোন দুর্ঘটনা নয়, হত্যা করা হয়েছে তাকে, ভয়ানক কোন ষড়যন্ত্র রয়েছে ওর মৃত্যুর পেছনে, রানা যদি তাকে এই রহস্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করে, চিরকৃতজ্ঞ থাকবে বৃদ্ধ রানার কাছে। প্রস্তাবটা ভদ্রভাবে কি করে প্রত্যাখ্যান করা যায় ভাবছিল রানা, এমনি সময়ে চমকে উঠল বৃদ্ধের পরবর্তী কথায়। জানতে পারল এই লোকই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ফিলিপ কার্টারেট। এরই কাছে চলেছিল সে সাহায্যের আশায়।

নিজের পরিচয় গোপন রেখে সাহায্য করেছিল রানা বৃদ্ধ ফিলিপ কার্টারেটকে। ধ্বংস করে দিয়েছিল পল কার্টারেটের হত্যাকারীদের। উল্কার মত রেসিংট্র্যাকে দেখা দিয়েছিল ইটালিয়ান ড্রাইভার মরিস রেনার, অর্থাৎ মাসুদ রানা—ঠিক তিনমাস পর উল্কার মতই উবে গিয়েছিল বেমালুম। জয় করে নিয়েছিল ফিলিপ কার্টারেটের আস্থা। রাজি হয়েছিল ফিলিপ কার্টারেট ইন্টারপোলের ছত্রছায়ায় অ্যামস্টার্ডামে গিয়ে রানাকে কিছু কাজের সুযোগ দিতে।

সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ করে, অর্থাৎ ভয়ঙ্কর এক ড্রাগ রিঙ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়ে ফিরে এসেছে রানা প্যারিসে। তিনদিন বিশ্রামের পর

আগামীকাল দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ওর। এমনি সময়ে হন্তদন্ত হয়ে রানাকে তাঁর অফিসে এসে হাজির হতে দেখে অত্যন্ত অবাক হয়েছেন ফিলিপ কার্টারেট। ঢাকার সঙ্গে অয়্যারলেসে কথা বলবার অনুমতি চাওয়ায় বিস্মিত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বিস্মিত হয়েছেন কয়েকটা তথ্য সংগ্রহ করে দেয়ার অনুরোধে। কোন প্রশ্ন না করেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। এতক্ষণ চুপচাপ দেখছিলেন রানার দক্ষ হাতে রেডিও অপারেট করবার ক্ষমতা, কথাবার্তার কিছুই বোঝেননি তিনি—বাংলায় কথা হচ্ছিল, কিন্তু একটা নাম যতবারই উচ্চারণ করা হলো ততবারই কিসের যেন একটা ঝঙ্কার শুনতে পেলেন তিনি, টোকা পড়ল যেন স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে তুলে-রাখা কোন সেতারের চিকারির তারে। মৃদু হেসে বললেন, 'ব্যাপারটা কি বলো তো, রানা? ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজ হলো?'

'কাজ চলছে,' বলল রানা। 'আধঘণ্টার মধ্যেই খোঁজ খবর নিয়ে জানানো হবে আমাকে। কিন্তু আপনার অসুবিধে হলে আমি না হয়...'

'অসুবিধে নয়, কৌতূহল হচ্ছে। কিসের এত খোঁজ করছ তুমি, রানা? ব্যাপারটা কি? ঝড়ের বেগে এসে দাবি করছ তোমার অয়্যারলেস সেট চাই, একটা বিনকিউলারের ক্যাশমেমো দিয়ে চাইছ আগের কাস্টোমারের নাম ঠিকানা, আবার সেই দোকানের সামনে পার্কিং টিকেট পাওয়া গাড়ির মালিকের নাম-ধামও তোমার চাই। ঘটনাটা কি?'

'পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম ক্রিমিনালকে এই কিছুক্ষণ আগে দেখলাম প্যারিসে। কুখ্যাত মাফিয়া বা কোসানোস্ট্রা ওর ক্ষমতার কাছে নস্যি। লোকটা নিজে একজন মস্ত বড় প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক, কিন্তু মিস্ গাইডেড। বারকয়েক জোর সংঘর্ষ হয়েছে ওর সঙ্গে আমার, একের পর এক ওর মারাত্মক সব প্ল্যান আমি বানচাল করে দিয়েছি। শেষবার বম্বেতে আমি নিজের হাতে গুলি করে ওর ডানহাতের কব্জি ভেঙে পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছিলাম ওকে। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, জেলের ঘানি টানছে লোকটা। কিন্তু আশ্চর্য, খানিক আগে ওকে দেখলাম, দিব্যি উঠে বসল একটা সাদা কনভার্টিবলে, সাঁ করে বেরিয়ে গেল আমার চোখের সামনে দিয়ে।'

'নামটা কেন জানি বেশ পরিচিত ঠেকছে, রানা। আচ্ছা, এই লোকই কি ইটালীর...'

'ঠিক ধরেছেন। কাসা বিলাভিস্টার সেই পাগল বৈজ্ঞানিক। আগ্নেয়গিরির মধ্যে...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ সব মনে পড়েছে!' বিস্ফারিত হয়ে গেল ফিলিপ কার্টারেটের চোখ। 'সব্বোনাশ।' মাথা চুলকালেন সিলিঙের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। 'বড় ভয়ঙ্কর কথা। এই লোক প্যারিসে কেন?'

'আমিও সেই কথাটাই জানতে চাই।'

'কিন্তু ওর নাম-ঠিকানা নিয়ে তুমি কি করবে? তুমি তো কালই ফিরে

যাচ্ছ দেশে।'

'সেটা নির্ভর করবে...' থেমে গেল রানা টেবিলের ওপর ইন্টারকমের বাযার বেজে উঠতেই।

একটা বোতাম টিপে হাঁক ছাড়লেন ফিলিপ কার্টারেট, 'ইয়েস, মাদমোয়াযেল।' সেক্রেটারির বক্তব্য শুনতে পেল না রানা। কয়েক সেকেন্ড নীরবে শুনে মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'ঠিক আছে। নিয়ে এসো। সেই সাথে দু'কাপ কফি আনতে ভুলো না।' রানার দিকে চেয়ে হাসলেন, 'এসে গেছে তোমার ইনফর্মেশন।'

রিক্লাইনিং চেয়ারে হেলান দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সোজা হয়ে বসতে হলো ফিলিপ কার্টারেটকে। ডেস্কের কাছেই একটা র‍্যাকের ওপর সাজানো ডজনখানেক টেলিফোন। দ্বিতীয়বার রিঙ হতেই গোক্ষুরের মত ছোবল দিয়ে তুলে নিলেন একটা রিসিভার। দশ সেকেন্ড চুপচাপ শুনবার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'ডিপার্টমেন্ট এক্স কি সন্দেহ করছে এই লোকটাই—' বলতে বলতে থেমে গেলেন ফিলিপ কার্টারেট। অল্পক্ষণ পর বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা যোগাযোগ করো ডিপার্টমেন্ট এক্স-এর সাথে, ওদের মতামতটাও জানা দরকার।' রিসিভার নামিয়ে রেখে চেয়ারের পিঠে হেলান দেয়ার আগেই বেজে উঠল আরেকটা ফোন। রিসিভার কানে তুলেই ভুরুজোড়া কুঞ্চিত হয়ে গেল বৃদ্ধের, 'আশ্চর্য। কম্পিউটার সেকশন বলছে এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে আর্থারের মৃত্যুর! ...কলিনেরও? ও. কে. ফাইলটা পাঠাও। হ্যাঁ, এক্ষুণি।'

ট্রে হাতে ঘরে এসে ঢুকল সেক্রেটারি। ছিমছাম গড়ন। বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ। রানার সাথে চোখাচোখি হতেই ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস দেখা দিল মেয়েটির। কফি আর বিসকিট সার্ভ করে বৃদ্ধের হাতে একটা মুখ-খোলা খাম দিয়ে রানাকে আর একটুকরো হাসি উপহার দিয়ে বেরিয়ে গেল রোজমেরী ডুফঁ।

কফিতে চুমুক দিয়ে এনভেলাপ থেকে একটা কাগজ বের করে তার মধ্যে ডুবে গেলেন ফিলিপ কার্টারেট। হঠাৎ চোখ তুলে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, লোকটার ডান হাতের কব্জি গুঁড়ো করে দিয়েছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ। ডানহাত।' মৃদু হাসল রানা। 'তখন জানতাম না যে একটা গুলিশূন্য পিস্তল তাক করেছিল ও আমার বুকের দিকে।'

আবার হাতের কাগজে মন দিলেন বৃদ্ধ। কাগজটা শেষ হওয়ার আগেই ফাইল হাতে ঘরে ঢুকল আবার রোজমেরী ডুফঁ। রানার উপস্থিতি বেমালুম ভুলে গিয়ে ফাইলের মধ্যে ডুবে গেলেন ফিলিপ কার্টারেট। সেই সুযোগে আরও একটু আন্তরিক হাসি উপহার দিল ডুফঁ রানাকে, বেরিয়ে গেল।

ফাইলের কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টে আবার চোখ তুললেন ফিলিপ কার্টারেট। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন রানাকে, এমনি সময় আবার টেলিফোনের রিঙ শুনে ছোবল দিলেন রিসিভারের ওপর। চোখমুখ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে উঠল বৃদ্ধের। কিছুক্ষণ শোনার পর বললেন, 'ঠিক আছে। বুঝলাম। তুমি

প্রোজেকশন রুমে ইনফর্ম করো, আসছি আমরা।' রিসিভার নামিয়ে রেখে জ্বলজ্বলে চোখে চাইলেন তিনি রানার মুখের দিকে। 'আগামীকাল খুব সম্ভব তোমার যাওয়া হচ্ছে না, রানা। কফিটা খেয়ে নাও, তোমাকে একটা ফিল্ম দেখাব।'

রেডিও সিগন্যাল পাওয়া গেল। ঝুঁকে পড়ল রানা অয়্যারলেস সেটটার ওপর। নিজের কোড নাম্বার দিতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল মেজর জেনারেল রাহাত খানের গম্ভীর কণ্ঠস্বর 'ঠিকই দেখেছ তুমি, রানা। এইমাত্র জানা গেল, আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে কবির চৌধুরীর জায়গায় রয়েছে এক বদ্ধ উন্মাদ। মুখে রবারের মুখোশ—হুবহু কবির চৌধুরীর চেহারা। ডানহাতে প্লাস্টার। ওটা কেটে দেখা গেছে কোনদিন জখম হয়নি ওর কব্জি। জেল কর্তৃপক্ষ টেরই পায়নি কবে কখন বদলি হয়ে গেছে কয়েদী। ওরা ধারণা করেছিল কবির চৌধুরীই জেলে থাকতে থাকতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে ধীরে ধীরে।'

'তাহলে আমি কি কিছুদিন ফ্রান্সেই থাকছি?' নিজের ইচ্ছেটা ব্যক্ত করল রানা।

'ইয়েস। ডেফিনিটলি। মনে হচ্ছে : দিস ম্যান ইজ আপটু সামথিং ভেরি স্পেশাল। হি মাস্ট বি ফাউন্ড অ্যান্ড স্টপ্‌ড্ অ্যাট এনি কস্ট—আই রিপিট, মাস্ট বি ফাউন্ড অ্যান্ড স্টপ্‌ড্ অ্যাট এনি কস্ট। হি ইজ এ পোটেনশিয়াল ডেঞ্জার টু ম্যানকাইন্ড। আমি ইন্টারপোল আর ডুক্সেম ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আশা করা যায়, ওর সম্পর্কে সবকিছু জানালে ফ্রেঞ্চ গভমেন্টের ফুল অফিশিয়াল কোয়াপরেশন তুমি পাবে।'

'সোহানাকে কি...'

'না। সোহানা থাকছে প্যারিসেই। প্লেনের রিজার্ভেশন ক্যানসেল করে দাও। আমার বিস্তারিত ইন্সট্রাকশন পাঠাচ্ছি আরিফ আখন্দের কাছে, কালেক্ট করে নিয়ো।'

'অলরাইট, স্যার। অ্যান্ড থ্যাংকিউ। ওভার অ্যান্ড আউট।'

ডুক্সেম ব্যুরোর প্রোজেকশন রুম।

পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে একটা রীল দেখছে রানা ও ফিলিপ কার্টারেট। পর্দায় দেখা যাচ্ছে একটা বোয়িং সেভেন ও সেভেন ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে গোলাকার সাদা চক্রটার মধ্যে থেমে দাঁড়াল। বেশ কিছুটা দূরে আর একটা বোয়িংকে দেখা যাচ্ছে—আউট অভ ফোকাস। চলন্ত সিঁড়ি দুটো এগিয়ে যাচ্ছে বোয়িং এর দুই দরজার দিকে।

নিচু গলায় ফিলিপ কার্টারেট বললেন, 'এখন শিফল এয়ারপোর্টে যতগুলো প্লেন আসে আর যতগুলো যায়, প্রত্যেকটার ছবি তুলে নেয়া হয় মুভি ক্যামেরায়। গোপনে। সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় যাতে একজন যাত্রীও বাদ না পড়ে। গত বছর পর পর কয়েকটা বোমাবাজি আর হাইজ্যাকের পর নেয়া

হয়েছে এই ব্যবস্থা। এই ছবিটা মাস ছয়েক আগের তোলা। কয়েকটা রহস্যজনক ঘটনা ধরা পড়েছে এই ছবিতে—দেখলেই বুঝতে পারবে। ঘটনাগুলো ঘটে ডান হাতের কব্জিতে প্লাস্টার বাঁধা একজন লোককে কেন্দ্র করে। আমার ধারণা, এই লোকটারই খোঁজ জানতে চেয়েছ তুমি আজ আমাদের কাছে। দেখ তো চিনতে পারো কিনা?'

আনমনে ছবি দেখছিল আর কথা শুনছিল রানা। প্লেনে সিঁড়ি লাগানো হয়ে গেছে। প্যাসেঞ্জাররা একে একে নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। সিঁড়ির মাথায় এবার দেখা দিল ডান হাতে প্লাস্টার বাঁধা লম্বা এক লোক। সোজা হয়ে বসল রানা। কোন সন্দেহ নেই, কবির চৌধুরী। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে পাগল বৈজ্ঞানিক।

'কিন্তু আপনি কি করে জানলেন যে আমি এই লোককেই দেখেছি?' প্রশ্ন করল রানা। 'নিশ্চয়ই আরও কিছু ঘটেছে এখানে? কি সেটা?'

'সে কথায় আসছি আমি একটু পরেই। ছবিটা সম্পূর্ণ দেখে নাও আগে।'

এয়ারপোর্ট বাসে করে প্যাসেঞ্জাররা সব টার্মিনাল বিল্ডিঙে গিয়ে নামল। এগিয়ে যাচ্ছে সবাই ওয়েটিং রূমের দিকে। প্লেন থেকে মালগুলো নামানো হয়ে গেলেই সেগুলো নিয়ে যাওয়া হবে কাস্টমস্ চেকিং হলে। যতক্ষণ মাল নামানো না হয় ততক্ষণ সবাইকে অপেক্ষা করতে হবে ওই ওয়েটিং রূমে। বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এবার কবির চৌধুরীকে। ঠিক দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকবার সময়ে একটা লোক একটা কাগজের মোড়ক গুঁজে দিল কবির চৌধুরীর হাতে। শেষ হয়ে গেল ফিল্মটা।

'চার্লস্ হিকারী। কুখ্যাত ডায়মন্ড স্মাগলার। আগে থেকেই ইনফর্মেশন এসে গিয়েছিল কাস্টমসের কাছে। জানা ছিল, একটা বিরাট কনসাইনমেন্ট আসছে হিকারীর সাথে। কায়রো থেকে ফলো করা হচ্ছিল ওকে। কিন্তু হাত বদল হওয়ার পর ওই মোড়কটা একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। থরো সার্চ করা হয়েছিল কবির চৌধুরীকে। ও যে বাথরূম ব্যবহার করেছিল সেটাও খুঁজে দেখা হয়েছিল তন্নতন্ন করে, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি।'

মন দিয়ে শুনছিল রানা, মৃদু হেসে মন্তব্য করল, 'কবির চৌধুরীর ডান পাটা কাঠের।'

'একটা ধাঁধার উত্তর পাওয়া গেল। এখন বোঝা যাচ্ছে এত খোঁজাখুঁজি করেও কিছুই পাওয়া যায়নি কেন। যাই হোক, যা বলছিলাম, এয়ারপোর্ট থেকে বের হওয়ার পরেও কিন্তু এই লোকটাকে ফলো করা হয়েছিল। কিন্তু যাকে পাঠানো হয়েছিল সে আর ফিরে আসেনি।'

'খুন?'

'হ্যাঁ। তিরিশ মাইল দক্ষিণে একটা টেলিফোন বুদের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল ওকে—মৃত। তারপর থেকে একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কবির চৌধুরী। মাস দুয়েক আগে আমাদেরই এক এজেন্ট স্পট করে ওকে টুলন শহরে। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই আমাদের হাতে না থাকায় কিছুই

করা সম্ভব হয়নি আমাদের পক্ষে।'

'প্রমাণ সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে কোন এজেন্টকে লাগানো হয়নি?'

'লাগিয়েছিল। অবজার্ভেশনে রাখা হয়েছিল ওকে। ওই রকম একজন রহস্যময় লোক টুলনে কি করছে জানা প্রয়োজন মনে করেছিল ডুক্সেম ব্যুরোর তদানীন্তন চীফ—আমার প্রিয় শিষ্য আর্থার। খুন হয়ে গেছে ছেলেটা নিজের বেডরূমে। কোথাও কোন চিহ্ন বা প্রমাণ রেখে যায়নি হত্যাকারী, একেবারে নিখুঁত।'

'আর টুলনে কবির চৌধুরীর ওপর নজর রাখার জন্যে যাকে পাঠিয়েছিলেন?'

'মাইকেল কলিন। মাছ শিকারীর ছদ্মবেশে পাঠানো হয়েছিল ওকে। তিন দিন আগে খবর এসেছে, হিট-অ্যান্ড-রান অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে কলিন। খুন করা হয়েছে ওকে, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন প্রমাণ নেই কারও বিরুদ্ধে।'

'রিপ্লেসমেন্ট পাঠিয়েছেন?'

'না। এখনও পাঠানো হয়নি কাউকে। বুঝতে পারছি, ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে, প্রচণ্ড এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে এবার ডুক্সেম ব্যুরোকে। কিন্তু এই প্রতিপক্ষের ধরন-ধারণ বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের হাতে কোন তথ্য নেই। কিছু আঁচ করাও সম্ভব হচ্ছে না।'

'আগামীকাল খুব সম্ভব আমার দেশে ফেরা হচ্ছে না—এই কথাটা দিয়ে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিলেন আপনি?'

'এই লোকটার প্রতি তোমার আগ্রহ দেখে আশা করছিলাম, তুমি হয়তো কলিনের রিপ্লেসমেন্ট হতে চাইবে। যদি চাও সে ব্যবস্থা করা অসম্ভব হবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে হঠাৎ ভাবছি, সেটা খুব অন্যায় হবে আমার। জেনে শুনে তোমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া অমানুষের কাজ হবে।'

'আমার চীফের আদেশ তো নিজের কানেই শুনেছেন।'

'তা ঠিক। কিন্তু বিপদের পরিমাণ হয়তো জানা নেই ওঁর। হয়তো হাল্কাভাবে নিয়েছেন ব্যাপারটাকে।'

হেসে উঠল রানা। 'কোন কিছুকেই হাল্কাভাবে গ্রহণ করবার লোক মেজর জেনারেল রাহাত খান নন। ভাল করেই জানা আছে তাঁর কবির চৌধুরীর আসল রূপ। আপনারা আর কতটুকু দেখেছেন—বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সকে পাঁচ-পাঁচবার নামতে হয়েছে ওর বিরুদ্ধে সাংঘাতিক সংঘর্ষে, ধ্বংস করতে হয়েছে একের পর এক ওর ভয়ঙ্কর সব মহা-পরিকল্পনা। আদেশের গুরুত্ব ভালভাবে বুঝে নিয়ে তারপরেই উচ্চারণ করেছেন তিনি কথাগুলো। তিনি চেনেন কবির চৌধুরীকে, জানেন তার বিরুদ্ধে লাগতে যাওয়ার অর্থ কি।'

'অর্থাৎ, আমি অফার করলেই তুমি কলিনের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে রাজি হবে টুলনে যেতে?'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা। হবে।

'অলরাইট, মাই বয়।' উঠে দাঁড়ালেন ফিলিপ কার্টারেট। 'চলো, তোমাকে আরও কয়েকটা ব্যাপার দেখাব।'

দুই

স্যালন পেরিয়ে সোজা দক্ষিণে ছুটল রানার লাল ল্যান্সিয়া। মার্সেই হয়ে টুলন যাচ্ছে সে 'পিকচার নিউজ' পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে।

একঘণ্টার মধ্যে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ফিলিপ কার্টারেট। কাগজপত্র, আইডেন্টিটি কার্ড, পেছনের সীটে রাখা পুরানো পোর্টেবল-টাইপ রাইটার, এমন কি সেকেন্ড হ্যান্ড একখানা রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা পর্যন্ত সবই পেয়েছে সে বেনসনের কাছে। ডুক্সেম ব্যুরোরই একজন অপারেটার বেনসন। স্যালনে স্টেশনড। পাঁড় মাতাল লোকটা। সর্বক্ষণ মদ খেয়ে চুর হয়ে রয়েছে। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে মোটামুটি একই আকৃতির হওয়ায় বেনসন সাজতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি রানাকে। একটা পাওয়ারলেস চশমা, চুলের জন্যে কিছু ডাই, আর এখানে ওখানে সামান্য কিছু রঙ ব্যবহার করা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই দরকার পড়েনি তেমন। বেনসনের ওপর কড়া আদেশ হয়েছে, রানার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক পা বেরোতে পারবে না বাড়ি থেকে।

মার্সেই পেছনে ফেলে টুলনের দিকে ছুটল ল্যান্সিয়া। রানার ছদ্মবেশে খুঁত নেই কোথাও, খুঁতটা রয়েছে যার ছদ্মবেশ নেয়া হয়েছে তার মধ্যে। ইচ্ছে করেই এই বেনসন লোকটাকে বাছাই করা হয়েছে, যদিও ফিলিপ কার্টারেটের ভাল করেই জানা আছে মাতাল বেনসনের আসল পরিচয় এতদিনে সবার জেনে যাওয়ার কথা। ওকে বরখাস্ত করবার সব ব্যবস্থা নেয়া হয়ে গেছে হেড অফিসে। ঠিক এমনি সময়ে, অর্থাৎ চাকরি থেকে বের করে দেয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ভাঙা কুলোও যেমন কাজে লাগে, তেমনি কাজে লেগে গেছে লোকটা। ওর ছদ্মবেশে রানাকে পাঠানো হচ্ছে টুলনে প্রতিপক্ষকে সজাগ করে দেয়ার জন্যে, আশা করা হচ্ছে সহজ টার্গেট পেয়ে আক্রমণ করবে ওরা।

বেলা বারোটা নাগাদ পৌঁছে গেল রানা টুলন। সী ভিউ হোটেলেই উঠল সে। সৌখিন মাছ শিকারী মাইকেল কলিনও উঠেছিল এই হোটেলেই।

আগে থেকে বুক করা ছিল কামরা। বেল বয়ের পিছু পিছু নিজের ঘরে পৌঁছে মোটা বকশিশ দিল রানা বেল বয়কে। খুশি হয়ে সালাম জানিয়ে চলে যাচ্ছিল সে। ডাকল রানা, 'শোনো?'

'ইয়েস, মশিয়ে।' ঘুরে দাঁড়াল বেল বয়।

'গত তিন চার দিনের লোকাল নিউজপেপার আমার দরকার। জোগাড় করে আনতে পারবে?'

'নিচে আছে, মশিয়ে। আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।' দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা।

ঘর আর বাথরূম চট করে সার্চ করে নিল রানা। গোপন মাইক্রোফোন পাওয়া গেল না কোথাও। মিনিট তিনেক পর দরজায় নক করে কয়েকটা কাগজ দিয়ে গেল বেল বয়।

কাজ চালানোর মত ফ্রেঞ্চ জানা আছে রানার। মুখে কথার তুবড়ি ছোটাতে কোন অসুবিধে নেই, বরং চেহারার দিকে না চাইলে বুঝবার উপায় নেই যে লোকটা বিদেশী, কিন্তু ফ্রেঞ্চ লেখা পড়তে হলে পদে পদে হোঁচট খেতে হয় ওকে—শর্টহ্যান্ড লেখার অর্থ উদ্ধারের মত। ধৈর্যের অভাব নেই, সময়ও আছে হাতে, কাজেই খুঁজে খুঁজে মাইকেল কলিনের দুর্ঘটনার খবরটা বের করে ফেলল সে। ছোট্ট কয়েক লাইনের খবর। জানা গেল, ভাড়াটে ফিশিং ক্রুজার এস এস সান্তামারিয়ার ক্যাপ্টেন সভার্স ঘটনাস্থলে পৌছায় সবার আগে। সে পৌছবার পরপরই নাকি মারা যায় মাইকেল কলিন, কিভাবে কি ঘটেছে বলে যেতে পারেনি মৃত্যুর আগে। এ ব্যাপারে জোর তদন্ত চালাচ্ছে ইন্সপেক্টার এডি মর্গান।

রূম সার্ভিসকে স্যান্ডউইচ আর কফির অর্ডার দিয়ে বাথরূমে ঢুকল রানা। ঝাড়া আট মিনিট গরম, আর শেষ দু'মিনিট ঠাণ্ডা শাওয়ারে ভিজে লম্বা যাত্রার সব গ্লানি দূর করে দিল সে শরীর থেকে। তাজা একটা ফুরফুরে ভাব নিয়ে বেরিয়ে এল বাথরূম থেকে। ততক্ষণে এসে গেছে কফি আর স্যান্ডউইচ। আধ ডজন স্যান্ডউইচ, আর সেই সঙ্গে ছোট ছোট চুমুকে এক কাপ কফি খেয়ে সম্পূর্ণ চাঙ্গা হয়ে উঠল সে। আর এক কাপ কফি ঢেলে নিয়ে দাঁড়াল গিয়ে ব্যালকনির রেলিঙে হেলান দিয়ে। সিগারেট ধরাল একটা। তিন মিনিটে ঠিক করে নিল পরবর্তী কর্মপন্থা। কাপটা শেষ করে ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল হোটেল থেকে।

সী ভিউ থেকে আধমাইল পুবে জীর্ণ কাঠের জেটির কাছে পৌছে ক্যাপ্টেন সভার্সের দেখা পেল রানা। খদ্দের চিনতে দেরি হলো না চতুর ক্যাপ্টেনের, এগিয়ে এল হাসিমুখে।

'ক্রুজার চার্টার করবেন বুঝি? হায়াসের আশেপাশে ভাল শিকার পাওয়া যাচ্ছে এই সময়ে।'

'ওদিকে নয়। সিসি যেতে চাই আমি।'

সিসির নামে একটু যেন চমকে উঠল ক্যাপ্টেন। সতর্ক দৃষ্টিতে রানার মুখটা পরীক্ষা করে নিয়ে বলল, 'মাছ নেই ওদিকে।' ঠোঁটের এককোণ থেকে আরেক কোণে নিয়ে এল সে দাঁত খোঁচাবার খেলালটা হাত দিয়ে স্পর্শ না করে শুধু জিভের কৌশলে। 'অ্যাকোয়া সিটি তৈরির তোড়জোড়ে সব মাছ ভেগেছে ওই এলাকা ছেড়ে।'

'যাক না,' হাসল রানা। 'আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। অ্যাকোয়া সিটিরই ছবি তুলতে এসেছি আমি। উইকলি পিকচার-নিউজের পক্ষ থেকে।'

এটাই রানার কাভার। পানির নিচে আমেরিকার ডিজনিল্যান্ডের অনুকরণে ইহুদি কোটিপতি মাহমুদ বেগ যে অ্যাকোয়াসিটি তৈরি করছে সে খবর পেয়েছে রানা আগেই, ডুক্সেম ব্যুরোতে। প্যারিসে কবির চৌধুরীকে যে গাড়িতে উঠতে দেখা গেছে, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থেকে জানা গেছে সে গাড়ির মালিক মাহমুদ বেগ। মাহমুদ বেগের গাড়িতে চড়ে বেড়াচ্ছে কবির চৌধুরী. কাজেই দু'জনের মধ্যে একটা সম্পর্ক যে রয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। অ্যাকোয়া সিটি সম্পর্কে ফিলিপ কার্টারেটকে জিজ্ঞেস করে তেমন কিছুই তথ্য জানা যায়নি। প্যারিস মেলায় যদিও একটা স্কেল মডেল ডিসপ্লে করা হয়েছিল, এবং তা নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনারও সৃষ্টি হয়েছিল সবার মধ্যে, কিন্তু সেসব এক বছর আগেকার ব্যাপার। কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে সিসিতে ফটোগ্রাফার বা রিপোর্টারদের প্রবেশ নিষেধ থাকায় ব্যাপারটা পাবলিসিটির অভাবে চাপা পড়ে গেছে। ধন-কুবের মাহমুদ বেগ কন্সট্রাকশনের সময় সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করে একেবারে ওপেনিং সেরিমনিতে সবাইকে চমক লাগিয়ে দেয়ার পক্ষপাতী। এই কারণেই খেয়ালী লোকটা সিসির আশেপাশের বিরাট এলাকা কিনে নিয়ে সেটা সাধারণের জন্য আউট অভ বাউন্ডস করে দিয়েছে। কড়া পাহারার ব্যবস্থাও করা হয়েছে সেই সঙ্গে। কাকপক্ষীরও ঢুকবার উপায় নেই।

মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন সন্ডার্স। 'না, মশিয়ে। দুঃখিত। ওদিকে যাচ্ছি না আমি। এই তো সেদিন কচ্ছপ ধরতে গিয়ে দুই জেলে নৌকো নিয়ে ঢুকে পড়েছিল ওদের এলাকার মধ্যে। দেখামাত্র গুলি ছুঁড়তে শুরু করে গার্ডরা। নৌকো ফেলে কোনমতে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে দুজন। সিসির ধারে কাছে যাব না আমি।'

'গুলি ছোঁড়ে...' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। 'খুব ধুমসে কাজ হচ্ছে বুঝি ওখানে?'

'আল্লাই মালুম!' দুই হাতের তালু ওল্টাল সন্ডার্স। 'লোকজন তো দেখা যায় না।'

'তাই নাকি? শুনেছি দেড়শো ট্রেইন্ড ডাইভার কাজ করছে ওখানে? তারা থাকে কোথায়?'

'ওই এলাকার ভেতরেই। বিরাট এক বাড়ি আছে ওখানে মাহমুদ বেগের, খুব সম্ভব সেই বাড়িতেই থাকে। কেউ কোনদিন ওদের বাইরে আসতে দেখেনি। আমার এক বন্ধু ওখানকার রসদ সাপ্লাই করে। প্রতি সপ্তাহে মালপত্র নিয়ে যায় সে এলাকার সীমানা পর্যন্ত। গার্ড রয়েছে, গার্ডের কাছেই মাল বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে আসে সে। ওর মুখে শুনেছি, রসদ সাপ্লাই দিতে গিয়ে কোনদিন কন্সট্রাকশন ওয়ার্কার চোখে পড়েনি ওর। ওরা ওই এলাকার ভেতরেই কোথাও আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, নইলে অত খাবার খায় কে? কিন্তু দেখা যায় না তাদের।'

'সমুদ্রের নিচে কাজ করলে ওপর থেকে দেখা না যাওয়ারই কথা,' বলল

রানা। 'যাকগে···ছবি তুলতে গিয়ে গুলি খেতে আমিও রাজি না। তবে বোট চার্টার করবার খরচা যখন আমার পকেট থেকে যাচ্ছে না, পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দিচ্ছে, তখন কোম্পানীর খরচায় উন্মুক্ত সমুদ্রের কিছুটা নির্মল বায়ু সেবনে দোষ কি? কি বলেন?'

বত্রিশপাটি দাঁত বের করে হাসল ক্যাপ্টেন সন্ডার্স। উঠে পড়ল রানা।

ক্রুজারটা আকারে বাংলাদেশের ছোটখাট একটা লঞ্চের সমান হবে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে হুইল ধরল ক্যাপ্টেন। তীর ঘেঁষে ডানদিকে যাবার নির্দেশ দিল রানা। রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে ক্রুজার থেকে। সমুদ্রের ধার দিয়ে এঁকে বেঁকে বহুদূর চলে গেছে রাস্তাটা, তারপর একসময় বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেছে ডাঙায়। বহুদূরে সমুদ্রের ধারে বিন্দু বিন্দু বাড়ি দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো। ওইদিকটায় রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ক্যাপ্টেন বলল, 'ওই দেখা যায় মাহমুদ বেগ সিটি। চার বছর আগে বানিয়েছিল ওটা মাহমুদ বেগ বুড়োদের জন্যে। রিটায়ার করার পর বুড়োদের অবসর জীবন কাটাবার জন্যে আদর্শ। আছে না, ওই আমেরিকায়, ফ্লোরিডা না কি নাম···ওরই অনুকরণে তৈরি হয়েছে ওই সিটি। ওটা পেরিয়ে আরও তিন মাইল গেলে শুরু হবে সিসির সীমানা।'

ছোট ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে। আরও কিছুদূর এগিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'ওইখানেই তো সৌখিন মাছ শিকারীটা মারা পড়েছিল সেদিন, তাই না?' আঙুল তুলে জায়গাটা দেখাল রানা। আড়চোখে লক্ষ করল, স্টিয়ারিং হুইলটা খামচে ধরে আড়ষ্ট হয়ে গেছে ক্যাপ্টেন প্রশ্নটা শুনেই। হাসিটা মিলিয়ে গেছে মুখ থেকে। 'কাগজে দেখলাম আপনার চোখের সামনেই নাকি পুরো ঘটনাটা ঘটে?'

সরাসরি না চেয়েও রানা বুঝতে পারল, চঞ্চল হয়ে উঠেছে ক্যাপ্টেন আচমকা এই প্রশ্ন শুনে। কথা বলবার আগে বার দুই ঢোক গিলে নিল।

'ও ব্যাপারে আপনার এত আগ্রহ কেন?' নিচু গলায় জানতে চাইল ক্যাপ্টেন।

'আপনিই বা নার্ভাস হয়ে পড়লেন কেন বলুন তো?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'এর মধ্যে রহস্যময় কিছু রয়েছে নাকি আবার?'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে সাবধানে মুখ খুলল সন্ডার্স। 'আমি কিছুই দেখিনি। এইদিক দিয়েই জেটিতে ফিরছিলাম সেদিন।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, বুঝতে পারল, অসম্পূর্ণ উত্তরে সন্তুষ্ট হয়নি রানা, এখনও অপেক্ষা করছে সে সঠিক উত্তর শুনবার আশায়। বলল, 'হুইলটা একটু ধরুন—মোটর চেক করতে হবে। কোর্সটা বুঝতে পারছেন তো? দুশো পঁচিশে রাখতে হবে।'

নীরবে হাল ধরল রানা। কি ঘটতে যাচ্ছে সেটা আন্দাজ করে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। বেচারা জানে না, ঝাড়া এক মাইল দূর থেকেও শোনা যায় ওর চিন্তা-ভাবনা পরিষ্কার। ক্যাপ্টেন সন্ডার্সকে ফায়ার এক্সটিংগুইশারের পাশে ঝোলানো ইউটিলিটি নাইফটা খুলে নিয়ে ফেরত

আসা পর্যন্ত সময় দিল সে। মনে মনে তিন পর্যন্ত গুনে সাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল পিছন ফিরে।

লোকটা যে ঠিক খুন করবার জন্যেই ছুরি তুলেছে তা মনে হলো না রানার, কিন্তু তাই বলে ঝুঁকি নেয়া যায় না। ধাঁই করে এক বাংলাদেশী রদ্দা পড়ল ক্যাপ্টেনের কাঁধের ওপর। টলে উঠল ক্যাপ্টেন। বাঁ হাতে মোটরের সুইচটা অফ করে দিয়েই এক পা এগিয়ে লোকটার পাঁজর বরাবর চালাল রানা লাথি। সামলে উঠবার আগেই আরেকটা জুডো চপ পড়ল ক্যাপ্টেনের ঘাড়ে। হাত থেকে ছিটকে সশব্দে ছুরিটা পড়ল প্রথমে, তারপর পড়ল ক্যাপ্টেন। ডেকের ওপর থেকে ছুরিটা তুলে নিল রানা। বুড়ো আঙুলে ধারটা পরীক্ষা করে নিয়ে চোখা দিকটা ক্যাপ্টেনের গলার ওপর ঠেকিয়ে চাপ দিল একটু। যাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো সামান্য চাপেই।

বিস্ফারিত হয়ে গেছে ক্যাপ্টেন সন্ডার্সের চোখ দুটো। ককিয়ে উঠল, 'দাঁড়ান! মারবেন না। যা জানি সব বলছি, জানে মারবেন না! ছুরি সরান।'

ছুরি সরাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না রানার মধ্যে। বলল, 'খবরদার। একটা মিথ্যে কথা বললে পুরো দাবিয়ে দেব।'

গড়গড় করে বলে গেল ক্যাপ্টেন যা যা দেখেছে সব।

'মেয়েটা কে?' ছুরির চাপ আর একটু বাড়াল রানা। 'কি নাম?'

'ট্রিসা।' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ক্যাপ্টেন। 'ওর নাম ট্রিসা। ওর বাবা রিটায়ার্ড প্রফেসর। মাহমুদ বেগ সিটিতে থাকে। প্যাট্রিসিয়া আর কলিন হাবুডুবু খাচ্ছিল প্রেমে পড়ে। সবাই জানে সে কথা। সেদিন সকালে কি নিয়ে ওদের ঝগড়া হয়। সবাই দেখেছে। সবাই জানে এ কাজ ট্রিসা ছাড়া আর কারও হতে পারে না। এর যে কোন বিচার হবে না, সেটাও জানা আছে সবার। ইন্সপেক্টার এডি মরগ্যান চার্জ আনবে না ওর বিরুদ্ধে।'

'কেন?

'ট্রিসার বাবার সঙ্গে চুক্তি রয়েছে তার। মেয়েটাকে সমস্ত গোলমাল থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব রয়েছে এডি মরগ্যানের ওপরেই।'

'বুঝলাম,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বেশ। এবার ফেরা যাক।' ছুরিটা সরিয়ে নিল সে। 'উঠে পড়ুন।'

জেটিতে ফিরে ক্যাপ্টেন সন্ডার্সের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হোটেলের দিকে এগোল রানা, কিন্তু গজ পঞ্চাশেক গিয়ে বাঁক নিয়েই থেমে দাঁড়াল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, দূর থেকে দেখতে পেল হন্তদন্ত হয়ে এইদিকেই আসছে সন্ডার্স। একটা দোকানে ঢুকে সিগারেট কেনার ছলে দেরি করল রানা তিন মিনিট। কোনদিকে না চেয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল সন্ডার্স দোকানটা ছাড়িয়ে। ওকে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যেতে দিয়ে পিছু নিল রানা। আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে মাইলখানেক হেঁটে এক জায়গায় থেমে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। একটু এদিক ওদিক চেয়ে ঢুকে গেল ভিতরে। দ্রুত পা চালাল রানা। সুইট শেরি বার-এর লনে বসে বিয়ার আর স্যান্ডউইচ খাচ্ছে কয়েকজন লোক। একটু

দূরে বসা একজন বিশাল আকৃতির লোকের সঙ্গে নিচু হয়ে ঝুঁকে কথা বলছে ক্যাপ্টেন। ওর সম্পর্কেই যে আলাপ হচ্ছে সেটা বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। ডানদিকের গিফ্‌ট শপে ঢুকে পড়ল সে। এখান থেকে কাঁচের ভিতর দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সুইট শেরি বার-এর লনটা। পিকচার পোস্ট কার্ডের স্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে কার্ড ঘাঁটতে ঘাঁটতে ওদের ওপর নজর রাখল রানা। ক্যাপ্টেনের বক্তব্য শেষ হতেই বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে দাঁড়াল পর্বতপ্রমাণ লোকটা, প্রায় ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল বাইরে দাঁড়ানো একটা গাড়িতে। সাঁ করে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা। যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে চলল ক্যাপ্টেন সভার্স।

অন্য খরিদ্দার থাকায় এতক্ষণ রানার দিকে নজর দিতে পারেনি মধ্য বয়সী সেল্‌স-লেডি। এবার এগিয়ে এল রানার কাছে, 'আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি, মশিয়ে?'

'হ্যাঁ। এই পোস্টকার্ডগুলো দেখছিলাম। কিন্তু স্লিসির কোন কার্ড খুঁজে পাচ্ছি না এর মধ্যে।'

'কিন্তু ওটা তো প্রাইভেট প্রপার্টি। ওই এলাকার পিকচার কার্ড তৈরি করা নিষিদ্ধ। কোথাও পাবেন না।'

'ওখানেই তো অ্যাকোয়া সিটি তৈরি হচ্ছে, তাই না? ডিজনিল্যান্ডের মত এটাও তো পাবলিক প্লেসই হবে শেষ পর্যন্ত। তবে কেন এত ঢাকাঢাকি? পিকচার নিউজের পক্ষ থেকে আমি এসেছি কিছু মেটেরিয়াল জোগাড় করতে, অথচ কোন তথ্যই পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। আপনি তো স্থানীয় বাসিন্দা, বলুন তো কিছু উপায় করা যায় কিনা?'

'উপায় কিছুই নেই, মশিয়ে। স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে আমার পরামর্শ যদি চান, আমি বলব, ও সম্পর্কে কোন তথ্য বের করবার বৃথা চেষ্টা না করাই ভাল হবে। মাহমুদ বেগের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই আপনার। ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওর এলাকায় উঁকিঝুঁকি মারা কারও জন্যেই নিরাপদ নয়।'

সদুপদেশ দান করার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে গোটা কয়েক পিকচার কার্ড কিনে বেরিয়ে পড়ল রানা। হোটেলের দিকে দশ পা এগিয়ে কি ভেবে আবার ফিরে এল সে দোকানটার সামনে। পেছন ফিরে কথা বলছে মহিলা টেলিফোনে। চাপা, উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। বাক্যের একটা টুকরো অংশ কানে যেতেই দোকানে ঢোকার ইচ্ছে বর্জন করে এগিয়ে গেল সে সামনের দিকে। কাকে যেন বলছে মহিলা, '...এইমাত্র বেরিয়ে গেল লোকটা এখান থেকে!'

আশেপাশেই এ দোকান ও দোকানে ঘোরাফেরা করল রানা বেশ কিছুক্ষণ, যেন আপন মনে শো কেসের সাজানো জিনিসগুলো দেখছে। হঠাৎ ঘাড়ের পেছনে কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হলো ওর। রাস্তাঘাটে অনেক লোক। সবার ওপরেই আলতোভাবে একবার চোখ বুলাল রানা। বেশ ভিড়,

কিন্তু ভিড়ের মধ্যেও ওর অভ্যস্ত চোখ খুঁজে বের করে ফেলল লোকটাকে।
অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে।

তিন

সন্ধ্যায় ফ্লেমিঙ্গো রয়ালে ঢুকল রানা। মাঝারি মানের বার। তাকে দেখেই বারটেন্ডার যেভাবে পরিচিতের মত হেসে পুরো এক গ্লাস জিন আর সেই সঙ্গে এ্যাঙ্গোসতুরা বিরাট লেমনের বোতল এগিয়ে দিল তাতে পরিষ্কার বোঝা গেল আসল বেনসনের পদধূলি এখানে আগেই পড়েছে। রীতিমত পরিচিত লোক সে এখানে।

বারটেন্ডারকে ধন্যবাদ জানিয়ে জিনের গ্লাস আর লেমনের বোতলটা নিজের দিকে টেনে নিল রানা।

'কি খবর? কেমন চলছে আপনার?' পাশের টুলে বসা মোটাসোটা এক লোক প্রশ্ন করল জড়িয়ে জড়িয়ে। কাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে বুঝতে না পেরে এপাশ ওপাশ চাইল রানা। ঢুলু ঢুলু চোখ তুলে রানার মুখের দিকে চাইল লোকটা। 'সেদিন যেন কার খোঁজ করছিলেন? তার দেখা পেয়েছিলেন?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে খোলা দরজার দিকে মন দিল রানা। সোজাসুজি ভিতরের দিকে না চেয়ে দরজার বাইরে থেকে আড়চোখে এইদিকেই নজর রেখেছে লোকটা। সেই যে লেগেছে, এখন পর্যন্ত পিছু ছাড়েনি লোকটা রানার।

'আপনি কি সী ভিউতেই উঠেছেন?' জোর করে আলাপ জমাবেই মোটা লোকটা। বলল, 'আমি কিন্তু উঠিনি এবার। ব্যাটারা এক প্যাকেট তাস আনতে বললে টিপসের লোভে বাহান্ন বারে বাহান্নটা তাস আনবে। ইনটলারেবল্!'

সত্যিই ইনটলারেবল্! ড্রিংক নিয়ে জানালার ধারের টুলটায় গিয়ে বসল রানা। মাতালটার পাশে থাকলে কথা থামবে না ওর। খোলা দরজা দিয়ে লক্ষ করল দুইহাত জড়ো করে বাতাস বাঁচিয়ে সিগারেট ধরাল লোকটা, তারপর একবার এদিক ওদিক চেয়ে নিয়ে চলে গেল শহরের দিকে।

কয়েক মিনিট পরেই সুপারচার্জড ইঞ্জিনের গর্জনে মুখ তুলে চাইল রানা দরজার দিকে। সাদা, টু-সিটার রেসিংকারটা ক্যাঁচ শব্দ তুলে থামল ফ্লেমিঙ্গো রয়ালের সামনে। সেই গাড়ি! ড্রাইভিং সীটে সেই মেয়েটা! পাশে বসা টাক-মাথা এক লোক। গতকাল প্যারিসে পাশের ওই সীটে কবির চৌধুরীকে উঠে বসতে দেখেছিল রানা। গতকাল লক্ষ করেনি, কিন্তু আজ খেয়াল করল গাড়িটার বাম্পার আর গ্রিল মেরামত করা হয়েছে দু'একদিনের মধ্যেই—বেশি তাড়াহুড়ো করায় অসমান রয়ে গেছে এখানে ওখানে। গাড়ি থেকে নেমে

সোজা এসে বারে ঢুকল মেয়েটা। লো নেকলাইনের কালো ড্রেস, কালোর উপর ঝকঝক করছে একটা ডায়মন্ড ব্রোচ। মেয়েটার পিছু পিছু হাসিমুখে বারে ঢুকল টেকো লোকটা।

'হ্যালো, ট্রিসা। তোমার রোজকার পশ্ বার "ডি রিগাল" ফেলে এখানে কি মনে করে?' বাঁকা হাসি হাসল মাতাল লোকটা। 'তোমাকেও ঠকিয়েছে বুঝি?'

'হ্যালো, স্যাম।' আন্তরিকতার সাথে হাসল ট্রিসা। সাথের টেকো লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'জিমি ফিশিং নিয়ে আলাপ করতে চায় ওর বন্ধুদের সাথে, আর আমি চাই নাচতে যেতে। দুজনে আপোস নিষ্পত্তি করে এখানে এসেছি।' মাছ শিকারীদের টেবিলটায় গিয়ে বসল ওরা দুজন।

মাতালটার বকবকানির ঠেলায় দূরে জানালার ধারে পালিয়েছিল রানা। এবার সে এগিয়ে গেল আলাপ জমাতে। বেনসনের সঙ্গে মাতালটার পরিচয় আগেই হয়েছে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু যতদূর মনে হয় মেয়েটার সাথে ওর পরিচয় হয়নি—হলে কিছু না কিছু আভাস পাওয়া যেত। বারটেন্ডারকে দুটো ড্রিংকের অর্ডার দিয়ে কথা পাড়ল রানা, 'বার ডি রিগালে যান না আর?'

'আর বলবেন না। চোর সব। রেগুলার যেতাম ওখানে। একদিন আমাকে মাতাল মনে করে ড্রিংকের সঙ্গে পানি মিশিয়ে সার্ভ করে বসল। তুমুল ঝগড়া। তারপর থেকে বন্ধ করে দিলাম ওখানে যাওয়া। আচ্ছা, আপনিই বলুন—'

'আকর্ষণীয় মেয়েটা,' ভুরু নাচিয়ে ট্রিসার দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'আপনাদের অনেক দিনের পরিচয় বুঝি?'

'ওই বার ডি রিগালেই দেখা হত রোজ। আলাপ করবেন নাকি? দেব পরিচয় করিয়ে?'

'তাহলে তো চমৎকার হয়। অবশ্য আপনার যদি কোন অসুবিধে না থাকে।'

হৈ হৈ করে উঠল মোটা লোকটা। 'আরে, এ আর এমন কি কথা···আসুন, এক্ষুণি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আপনাদের।' উঠে দাঁড়াল স্যাম। রানার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল কোণের টেবিলে। রানাকে এগোতে দেখে খুশি খুশি মনে হলো ট্রিসার চোখমুখ। উজ্জ্বল চোখে চাইল। 'পরিচয় করে দিচ্ছি,' যথেষ্ট গাম্ভীর্যের সঙ্গে শুরু করল মাতাল, 'ইনি হচ্ছেন আমার বহু পুরানো বিশিষ্ট বন্ধু মিস্টার—' এই পর্যন্ত এসে হঠাৎ তার খেয়াল হলো রানার নামটা তার জানা নেই। মাতাল স্যামকে কে না চেনে, রানার নামটা স্মরণ করবার চেষ্টায় মাথা চুলকাতে দেখে হো হো করে হেসে ফেলল সবাই। এবং হাসবার সুযোগ পেয়ে সহজ হয়ে গেল পরিচয় পর্বের আড়ষ্টতা। নিজেকে চার্লস বেনসন বলে পরিচয় দিল রানা।

টেকো লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে পরিচয় দিল, 'আমি ডক্টর জিমি ক্রিদারো। সাইজ দেখে নিশ্চই বুঝতে পারছেন আমি সেই বিখ্যাত ব্রিটিশ কমেডিয়ান

বামন ক্লিদারো নই?' আবার একচোট হাসল সবাই। তারপর সে প্যাট্রিসিয়া আর তার মৎস্য শিকারী দুই বন্ধুর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিল। রানার কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দ্বিতীয়বার টুলনে কি মনে করে?'

ধ্বক্ করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। তবে কি বেনসন তাকে জিমি ক্লিদারোর সঙ্গে আলাপের কথা বলতে ভুলে গেল? নাকি সে এমনই মাতাল অবস্থায় ছিল যে নিজেই জানে না জিমির সঙ্গে পরিচয়ের কথা?

'আমার ম্যাগাজিন একটা ফিচার করতে চায় অ্যাকোয়াসিটির ওপর।' সাবধানে বলল রানা।

'কলিন আর তার ফিশিং অ্যাডভেঞ্চার সম্পর্কে কি একটা লিখছিলেন সেটা কি শেষ হয়েছে?'

'নাহ্। কলিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ওটারও ইতি হয়ে গেছে।'

ট্রিসা হঠাৎ উঠে জুকবক্সের দিকে চলে গেল।

গলা নিচু করে জিমি বলল, 'ট্রিসার সাথে ভাব হয়ে গিয়েছিল কলিনের। ও মারা যাওয়ার পর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছে মেয়েটা।' এইসব কথাবার্তায় রানাকে অপ্রস্তুত হতে দেখে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলল, 'আপনার অপ্রস্তুত হবার কিছুই নেই, মিস্টার বেনসন। আলাপ আগেই হয়েছিল আমাদের। কিন্তু সে রাতে এত ড্রিংক করেছিলেন যে শুধু আমার কথা কেন, কোন কথাই আপনার মনে থাকবার কথা নয়।'

'রানা।' ট্রিসার গলা শোনা গেল। চোখ তুলে তাকাতেই ট্রিসা হাতছানি দিয়ে ডাকল রানাকে জুকবক্সের কাছে। এক ডাকেই হিম হয়ে গেছে রানার কলজেটা। এক চুমুকে বেশ অনেকটা জিন গিলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। চিন্তার ঝড় উঠে গেছে মাথার ভিতর। তবে কি প্যারিসে চিনে ফেলেছিল ওকে কবির চৌধুরী? সে-ই কি পাঠিয়েছে ট্রিসাকে এই বারে? বেনসনের ছদ্মবেশ ভেদ করে ওর আসল পরিচয় জেনে গেছে ওরা? কি করে জানল ট্রিসা ওর আসল নাম? নাকি আন্দাজে ছুঁড়ছে ঢিল? নানান প্রশ্ন ঠেলে আসতে চাইছে, কিন্তু মুখটা নির্বিকার রেখে এগিয়ে গেল সে। কাছে যেতেই মিষ্টি লজ্জিত হাসি হাসল ট্রিসা। 'চেঞ্জ মোটেও নেই আমার কাছে। ২৯-এ গানটা একটু বাজিয়ে শোনাবেন?'

কয়েন ঢুকিয়ে ২৯-এ টিপে দিয়ে গানের কথাগুলো পড়ল রানা।

ওতে লেখা রানা রানা রানা রানা রানা রানা,
লালা লালা ংকারট লালা ডুভিডু।।

ইটালিয়ান জেলেদের গান একটা। ট্র্যাডিশনাল জ্যাজ। ব্যাপারটা কি ঘটনাচক্রের মিল, নাকি ইচ্ছে করে জেনেশুনেই তাকে খোঁচা দিয়ে ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে? একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়ার কোন উপায় নেই।

গানটা আরম্ভ হয়ে গেছে। চোখ বুজে তালে তালে কয়েক সেকেন্ড শরীর দোলাল ট্রিসা, তারপর জিজ্ঞাসু চোখ রাখল রানার চোখে, 'আসুন না, নাচি?

পারেন?' রানা মৃদু হাসতেই বাড়িয়ে দিল হাত। নাচে যোগ দিল রানা। দু'মিনিট নেচেই অবাক হয়ে গেল ট্রিসা। 'দারুণ নাচতে পারেন তো আপনি!'

জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল রানা আবার।

'কিন্তু এই ঘুপচির মধ্যে সুন্দর সন্ধ্যাটা নষ্ট করছেন কেন?' এবার আরও একটু সরাসরি ট্রিসার প্রশ্ন।

'একা একা এখানেও যা অন্যখানেও তাই,' বলল রানা। 'সুন্দরী সাথী কই যে জমবে সুন্দর সন্ধ্যা?'

'সত্যি? আমিও সাথী পাচ্ছিলাম না বলে টেকো জিমির সাথে নষ্ট করছিলাম সন্ধ্যাটা। মাছ আমার দুচোখের বিষ, অথচ মাছ ছাড়া আর কিছু বোঝেই না ও। সব সময় শুধু ফিশিঙের চিন্তা।'

শেষ হয়ে গেল গান।

রানার হাত ধরে জিমির উদ্দেশে বলল ট্রিসা, 'আমরা বার ডি রিগালে চললাম। তুমি আসবে?'

গভীর আলাপে মত্ত ছিল জিমি তার দুই বন্ধু আর সেই মাতালটার সাথে, আঙুল তুলে কি যেন বোঝাচ্ছিল ওদের। সেই অবস্থাতেই বক্তব্যের মাঝপথে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল ট্রিসার গলা শুনে। বলল, 'ঠিক আছে, তোমরা যাও। আমি আসছি যত শীঘ্রি পারি, তবে আমার অপেক্ষায় না থাকাই ভাল। শুভ ইভনিং।'

তিন মিনিটের পথ বার ডি রিগাল। গাড়ি নিল না ওরা, রওনা হলো হেঁটেই। চলতে চলতে লক্ষ করল রানা এখন আর কেউ অনুসরণ করছে না ওকে। কারণ কি? আরও ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণের লোক জুটে গেছে বলে?

বার ডি রিগালে ঢুকবার পথটা ঝিনুক আর নানান ধরনের শেল দিয়ে সুন্দর করে বাঁধানো। সোজা নাচের ঘরে গিয়ে বসল ওরা। মাঝারি আকারের হলঘর। মাঝখানটা নাচবার জন্যে ফাঁকা রেখে চারপাশ দিয়ে পাতা রয়েছে টেবিল চেয়ার। দু'জনের জন্যেই ভোদকা-মার্টিনির অর্ডার দিল রানা।

বার ডি রিগালের নিজস্ব ব্যান্ড বাজাচ্ছে 'দ্য ওয়ে ইউ লুক টু নাইট'। উঠে দাঁড়াল রানা। 'চলুন, একটু নেচে আসা যাক।'

নাচতে গিয়ে ট্রিসার শরীরের আশ্চর্য ছন্দময় বাঁক লক্ষ না করে পারল না রানা। আগের চেয়ে অনেক সহজ ভাবে নাচছে ওরা এখন, অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে। ছোঁয়া লেগে যাচ্ছে শরীরের এখানে ওখানে—বিদ্যুৎ বয়ে যাচ্ছে রানার সর্বশরীরে, গরম হয়ে উঠতে চাইছে রক্ত। নিজেকে সাবধান করল রানা, এই শরীরের টানেই প্রাণ দিয়েছে কলিন, সতর্ক না থাকলে একই পরিণতি ঘটবে তোমারও।

বদলে গেল বাজনার ছন্দ। হাসিমুখে রানার চোখে চোখ রাখল ট্রিসা। 'এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা!'

'কোন্‌টা?' জানতে চাইল রানা।

'তোমার সাথে নাচা। এত ভাল লাগছে, বেনসন, মনে হচ্ছে সারারাত

নাচলেও সাধ মিটবে না। বহুদিন এত ভাল পার্টনার পাইনি।'

'শুধু নেচেই শেষ করে দেবে রাতটা?'

চট করে রানার চোখের দিকে চেয়ে আরও ঘনিষ্ঠ হলো ট্রিসা। রানার বাঁহাতের আলতো আদরে আবেশে বুজে আসতে চাইল ওর চোখ। রানার বুকে মাথা রেখে নিচু গলায় বলল, 'একটা বীচ আছে এখান থেকে বেশ অনেকটা দূরে। কেউ যায় না ওদিকে। একেবারে নির্জন। ঠিক একঘণ্টা পর তোমার সাথে দেখা করব আমি ওই বীচে।' ফিসফিসে গলায় কানে কানে চিনিয়ে দিল সে বীচটা রানাকে।

ভিতর ভিতর হোঁচট খেল রানা। ঠিক ওই জায়গায় কলিনও অপেক্ষা করেছিল ট্রিসার জন্যে। সেই একই জায়গায় ডাকছে এবার ও রানাকে। চট করে মনে পড়ে গেল সাদা কনভার্টিবলের দোমড়ানো বাম্পারের কথা। কিন্তু ব্যাপারটার শেষ দেখতে হবে ওর। এই সূত্র ছেড়ে দিলে পিছিয়ে যাবে ও অনেকখানি। কাজেই সম্মতি জানাল সে একটা চোখ টিপে। ঠিক হলো, রানা নিজের গাড়ি নিয়ে যাবে। অপেক্ষা করবে ট্রিসার জন্যে। ট্রিসা ফিরে যাবে ফ্লেমিঙ্গো রয়ালে। ওখানে জিমিকে মাথা ধরেছে বলে বাড়ি ফেরার নাম করে বীচে গিয়ে দেখা করবে রানার সাথে।

ড্রিংক শেষ করে বেরিয়ে পড়ল রানা। চাঁদ উঠেছে আকাশে। এলোমেলো মাতাল হাওয়া আসছে সাগর থেকে। বিপজ্জনক প্রেমের রাত আজ।

ব্রিজটার কাছেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। ল্যান্সিয়াটা পার্ক করেছে সে আরও সিকি মাইল দূরে এমন এক জায়গায় যাতে সহজে কারও চোখে না পড়ে। ঘড়ি দেখল। প্রায় আধঘণ্টা আগে পৌঁছেচে সে ব্রিজটার কাছে। বারবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইছে চারপাশে। কেউ নেই। অথচ কেন যেন মনে হচ্ছে ওর অলক্ষ্যে কেউ নজর রাখছে ওর ওপর। বার ডি রিগাল থেকে বেরিয়ে ফ্লেমিঙ্গো রয়ালের সামনে আসবার পর থেকেই এই অনুভূতিটা আবার পেয়ে বসেছে ওকে। কিন্তু অনুসরণকারীকে খুঁজে বের করতে পারেনি সে কিছুতেই। গাড়িতে উঠবার আগে ভালমত পরীক্ষা করে দেখেছে সে কেউ কিছু ফিট করে রেখেছে কিনা, বীচে আসবার পথে দু'দুবার থেমেছে সে, অপেক্ষা করেছে বাতি ও ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে। রিয়ার ভিউ মিররে দেখা যায়নি কিছুই, কোন গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দও আসেনি কানে। এত সাবধানতার পরও মন থেকে দূর করতে পারছে না সে অস্বস্তিটা। কিছু একটা গোলমাল নিশ্চয়ই রয়েছে কোথাও।

ট্রিসার আকস্মিক আমন্ত্রণ কিছুতেই স্বাভাবিক ব্যাপার হতে পারে না। জুকবক্সের সামনে হঠাৎ 'রানা' বলে ডেকে ওঠার পেছনেও হয়তো স্পষ্ট কোন উদ্দেশ্য রয়েছে ওর। বেনসনের ছদ্মবেশ যদি ওরা ভেদ করতে না-ও

পারে তবু খোঁজখবর নিতে দেখে রানার উদ্দেশ্য কিছুটা অন্তত আঁচ করে নিয়েছে ওরা। আজকের এই আমন্ত্রণ কি আরও খবর জানার জন্যে? নাকি ফাঁদ? যদি তাই হয়, কি ফাঁদ পাতা হয়েছে ওর জন্যে এই নির্জন সাগর তীরে?

হঠাৎ দূরে সুপারচার্জড রেসিং কারের শব্দ পেল রানা। লক্ষ্য রাখল দূরের হেডলাইটের দিকে। একটাই গাড়ি আসছে—কেউ ফলো করছে না ট্রিসাকে। অর্থাৎ, আপাতত আক্রমণের উদ্দেশ্য নেই ওদের, এটা ধরে নেয়া যায়?

রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল রানা। ছুটে আসছে গাড়িটা ওর দিকে। হাত নাড়াল রানা, তারপর হাসিমুখে এগোল সামনের দিকে। কিন্তু মেয়েটা গতি কমাচ্ছে না কেন গাড়ির? চেষ্টা করে হাসিটা ধরে রাখল সে। এদিকে প্রতিটা পেশী টানটান হয়ে রয়েছে, দরকার হলে শেষ মুহূর্তে যেন লাফিয়ে ডিগবাজি খেয়ে সরে যেতে পারে গাড়ির সামনে থেকে। দরকার হলো না। চ্যাক করে টায়ারের শব্দ তুলে কয়েক গজ স্কিড করে থেমে দাঁড়াল গাড়িটা। রানার তিনহাত সামনে।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল ট্রিসা গাড়ি থেকে।

'এত জোরে গাড়ি চালিয়ে ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিলে একেবারে। এমন বেপরোয়া চালালে দেখ আবার অ্যাক্সিডেন্ট না করে বসো কোন্‌দিন।'

উঁচু গলায় হেসে উঠল ট্রিসা। 'মিছে কথা বোলো না। মোটেও ভয় পাওনি তুমি। আমি লক্ষ করেছি, মুখের হাসিটা পর্যন্ত মলিন হয়নি তোমার একটুও।' গাড়ির প্যাসেঞ্জার সীটে রাখা ক্যারিয়ার ব্যাগটা হাতে তুলে নিল সে, অপর হাতে রানার বাহু জড়িয়ে ধরে টানল বড় পাথরটার দিকে। কিছুক্ষণ আগেও এখানে পানি ছিল—ভাটায় সরে গেছে। মসৃণ বালি থেকে ভেজা ভেজা ভাবটা যায়নি এখনও। ক্যারিয়ার ব্যাগ থেকে কম্বল বের করে রাস্তাটাকে আড়াল করে বিছাল ট্রিসা পাথরের পেছনে। স্যান্ডেল দুটো লাথি মারার ভঙ্গিতে ছুঁড়ে ফেলল দূরে। রানার দিকে ঘাড় কাত করে চেয়ে মিষ্টি হাসল। 'কি ব্যাপার, সাঁতার জানো না?'

ডান হাতে জিপারটা টেনে নামিয়ে শোল্ডার স্ট্র্যাপদুটো কাঁধ থেকে সরিয়ে দিতেই ঝুপ করে গোল হয়ে পড়ল জামাটা পায়ের কাছে। ট্রিসার পরনে কালো বিকিনি। চাঁদের আলোয় অপরূপ লাগছে ওর দেহের বাঁক।

কোটের বোতাম খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। খিলখিল হেসে সাগরে নেমে গেল ট্রিসা। এই মুহূর্তে ভাবাই যায় না তিন দিন আগে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে মেয়েটা তার প্রেমিককে। কোথাও কিছু একটা ভুল হয়েছে বলে মনে হলো ওর। পরমুহূর্তে মনে মনে কান চেপে ধরল নিজের—ব্যাটা, বিটলেমী হচ্ছে? কবির চৌধুরীর সাথে দেখনি তুমি ওকে কাল? তোমার সামনে আধ ন্যাংটো শরীর দেখলেই সাত খুন মাফ হয়ে যেতে পারে না ওর। ভাল চাও তো তোবড়ানো বাম্পারটার কথা খেয়াল রেখো।

দশমিনিট জলকেলির পর ধীরে ধীরে উঠে এল ওরা সাগর থেকে। পায়ে পায়ে এগোল পাথরের পেছনে বিছানো কম্বলের দিকে।

আরও দশমিনিট পর ক্লান্ত ভঙ্গিতে একটা হাত রাখল ট্রিসা পাশে শোয়া রানার বুকে। আলতো ভাবে বিলি কাটছে রানার লোমশ বুকে।

'ট্রিসা।'

'উঁ।' কনুইয়ে ভর দিয়ে পাশ ফিরল ট্রিসা। মাথা রাখল হাতের তালুর ওপর।

'তোমার কথা বলো।'

'বলার মত তেমন কিছুই নেই। আজকের সন্ধ্যেটা ছাড়া আমার জীবন একেবারেই ঘটনাবিরল। নীরস।'

'সবারই বোধহয় কোন না কোন সময়ে জীবন সম্বন্ধে এই রকম ধারণা জন্মে।'

'এটা ক্ষণিকের ধারণা নয়, চার্লস্। তুমি নিশ্চয়ই গভমেন্ট প্রজেক্টে কোন কাজ করোনি কোনদিন। তাহলে কিছুটা আন্দাজ করতে পারতে আমি কেন একথা বলছি।'

'গভমেন্ট প্রজেক্টে কাজ করো বুঝি তুমি? কি প্রজেক্ট?'

'ওটা গোপন ব্যাপার, চার্লস্। এটুকু বলতে পারি যে আমি ইলেকট্রোনিক্স-এর ওপর কাজ করছি। এক একবারে অনেক দিনের জন্যে আটক থাকতে হয় ওই একঘেয়ে কাজে। যখন আর পারি না তখন ওরা আমায় এখানে বাবার কাছে পাঠিয়ে দেয় কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেতে। তারপর আবার ছ'মাসের জন্যে ঢুকতে হবে আমাকে সেই একঘেয়ে কয়েদখানায়।' কথা বলতে বলতে রানার কনুইয়ের একটু ওপরে ছোটকালে দেওয়া প্রথম টিকার দাগটার ওপর হাত বুলাচ্ছিল ট্রিসা। রানার হাতটা আদর করে একটু টিপে দিয়ে বলল, 'কিন্তু আজ রাতের পর তো আরও অসহ্য ঠেকবে আমার—কি করে সহ্য করব ভাবছি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ট্রিসা।

'মেয়েরা তো সাধারণত ইলেকট্রোনিক্স-এর মত কঠিন লাইনে যায় না—সুন্দরী মেয়েরা তো নয়ই। তুমি এর মধ্যে ঢুকলে কেমন করে?'

'আমার বাবার মুখ চেয়েই ঢুকেছিলাম এই লাইনে। ভাই নেই বলে ছেলের জায়গা আমাকেই পূরণ করতে হয়েছে।'

'তোমার পুরো নাম প্যাট্রিসিয়া ব্র্যান্ড না?' হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা রানার কাছে। 'প্রফেসর আর্থার ব্র্যান্ড তোমার বাবা?'

'হ্যাঁ, তুমি তাঁর নাম জানো দেখছি?'

'এটমিক সাবমেরিনের আবিষ্কর্তা প্রফেসর আর্থার ব্র্যান্ড-এর নাম কে না জানে?'

'সে অবশ্য অনেকদিন আগের কথা—এখন উনি রিটায়ার করে ওই মাহমুদ বেগ সিটিতে বসবাস করছেন।' আঙুল দিয়ে দূরের বাড়িগুলোর দিকে দেখাল

ট্রিসা।

এক ঝাপটা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে দু'জনের দেহে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। এতক্ষণ টের পায়নি—বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। দূরে মিলিয়ে গেল শব্দটা।

'বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। ফেরা দরকার—এখানে বেশিক্ষণ থাকলে নিউমোনিয়া হয়ে যাবে।' বলল ট্রিসা।

'আচ্ছা, জিমির সাথে তোমার কি রকম সম্পর্ক?' ট্রিসার সম্বন্ধে সব না জেনে উঠতে চায় না রানা।

মাথাটা একটু পেছনে হেলিয়ে ফেটে পড়ল ট্রিসা। 'বাবার ডাক্তার জিমি। তিনমাস আগে বাবার একটা স্ট্রোক হয়েছিল, তারপর থেকেই...'

কথা শেষ হলো না ট্রিসার, ঝট করে গড়িয়ে সরে গেল রানা। চিৎকার করে উঠল ট্রিসা। স্টিল টিপ বুট সুদ্ধ একটা পা প্রচণ্ড বেগে এসে পড়ল রানার মাথাটা যেখান থেকে সরে গেল ঠিক সেই জায়গায়। শুয়ে থেকেই পা চালাল রানা লোকটার বুক বরাবর। অতর্কিত আঘাতে এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা। সেই সুযোগে উঠে দাঁড়াল রানা—হাত দুটো একত্র করে মিড্ অনে বাউন্ডারি মারার ভঙ্গিতে মারল লোকটার সোলার প্লেক্সাসে। আশ্চর্যজনক ভাবে হজম করল লোকটা ওই প্রচণ্ড মার। এক পা পিছিয়েই পা চালাল রানার তলপেট লক্ষ্য করে। সাঁৎ করে একপাশে সরে পায়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া পা'টা দু'হাতে ধরে সজোরে ঠেলে দিল রানা ওপর দিকে। দড়াম করে পাথরটার সঙ্গে ঠুকে গেল লোকটার মাথা। ঝপাৎ করে পড়ল নিচে। জ্ঞান হারায়নি লোকটা এখনও। ডান হাত পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছে সে। এক লাফে এগিয়ে ধরে ফেলল রানা লোকটার রিভলভার সুদ্ধ হাত। ধরেই শরীরের সব শক্তি দিয়ে মোচড় দিল নির্দয় ভাবে। কড়াৎ করে হাড় ফুটল কাঁধের—চিৎকার করে উঠল লোকটা।

'গাড়ির দিকে দৌড়াও, ট্রিসা।' ট্রিসার কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েই রানা দেখতে পেল তিনশো পঞ্চাশ পাউন্ডের একটা পাহাড় ছুটে আসছে ওর দিকে। ইন্সপেক্টার এডি মরগ্যান! পেট বরাবর একটা ঘুসিই মরগ্যানের জন্যে যথেষ্ট হবে। মোটু ইন্সপেক্টার দম ফিরে পেতে পেতেই রানা পগার পার হয়ে যাবে গাড়ি নিয়ে। বাঁ পা সামনে বাড়িয়ে বিরাশি সিক্কা ঘুসি চালাল রানা ওর পেট লক্ষ্য করে। রানাকে অবাক করে দিয়ে চট্ করে থেমে গেল মরগ্যান ওই বিরাট শরীর নিয়ে। পা দুটো দু'পাশে সরে গেল। রানার ঘুসিটা ওর গায়ে লাগবার আগেই ওর হাতটা ঘুরে এসে বাড়ি মারল রানার হাতে। এই ভঙ্গি রানার অপরিচিত নয়—জাপানের ক্লাসিক সুমো। নিচু মার প্রতিহত করবার জন্যে প্যারি ডিফেন্স। দূর থেকে যাকে নরম মাংসপিণ্ড বলে মনে হয়েছিল তার হাত যে স্টীলের মত শক্ত হতে পারে কল্পনাও করেনি রানা—হাড়ে হাড়ে টের পেল। রানার হাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই ডান হাতটা ভাঁজ

করে থুতনিতে মারল লোকটা খোলা তালু দিয়ে প্রচণ্ড জোরে। সেই সাথে ঘোঁৎ করে আওয়াজ করল মুখ দিয়ে। বিজয় ধ্বনি। সুমো কুস্তিতে ইয়োকোযুমা বা গ্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ান এই রকম আওয়াজ করে। প্রথম চোটে অবাক হলেও উল্টো মার মারতে পারত রানা—কিন্তু তাতে মরগ্যানের নির্ঘাত মৃত্যু হত। পুলিসের লোক মেরে খুনের দায়ে পড়তে চায় না রানা। পেছনে সরে মারটা এড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু পুরোপুরি এড়াতে পারল না সে। রানার শরীরটা মাটি ছেড়ে দুই ইঞ্চি শূন্যে উঠে গেল। পেছনে সরে মারটা হালকা করে না নিলে ওই মারেই ঘাড়টা মটকে যেত ওর। রানার দেহ মাটি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডান হাতের চপ পড়ল ওর কণ্ঠার ওপর। ডেথ ব্লো! মাথার ভিতরে বোমা ফাটল রানার। যখন সুযোগ ছিল তখন এডি মরগ্যানকে মেরে না ফেলার জন্যে মরার আগে নিজেকেই গাল দিল রানা—শুয়োর!

চার

'দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি শালাকে! সবসুদ্ধ কেটেই ফেলব আমি।'

তাহলে মরেনি রানা! কথাগুলো কানে গেলেও প্রথমে মানে বুঝতে পারল না সে। নগ্ন দেহে ঠাণ্ডা ধাতব ছোঁয়া পেতেই চোখ খুলল। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখল একটা বড় ছুরি নিয়ে তার পুরুষাঙ্গ কাটার যোগাড় করছে লোকটা। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে এডি মরগ্যান ট্রিসার পাশে। সমস্ত মনোবল একত্র করে ঘুসি চালাল রানা। ঘুসিতে জোর হলো না মোটেও। অতি সহজেই হাত দিয়ে ঘুসিটা প্রতিহত করে তার বুকে চেপে বসল লোকটা। দাঁত বের করে হিংস্র হাসি হাসল রানার অসহায় অবস্থা দেখে। চেহারা দেখে বোঝা যায় সুযোগ পেলে দাঁত দিয়ে কামড়ে টুকরো টুকরো করবে সে রানাকে।

'ফ্রান্সেসকো!' চাবুকের মত শোনাল এডির গলা। 'মিছে সময় নষ্ট হচ্ছে। সময় নেই এখন। তুমি মেয়েটাকে বাসায় পৌঁছে দাও ওর গাড়িতে করে। তোমাকে পরে তুলে নেব আমি।'

'নিজের চোখেই তো দেখলেন এই হারামি কি করেছে মেয়েটাকে।' মৃদু আপত্তি জানাল ফ্রান্সেসকো।

রানার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে এডি। 'ওর চেয়ে ট্রিসারই তো আগ্রহ বেশি ছিল বলে মনে হলো আমার।' হাত বাড়িয়ে ছুরিটা ফ্রান্সেসকোর হাত থেকে নিয়ে নিল এডি।

এরা লুকিয়ে পুরো ব্যাপারটাই দেখেছে। কিন্তু আগে থেকে ওরা কি

করে জানল যে রানারা এইখানেই আসবে? নিশ্চয়ই ট্রিসা নিজেই খবর দিয়েছে ওদের। যে বারে কোনদিন যায়নি ট্রিসা, হঠাৎ সেই বারে যাওয়া—রানাকে ভজিয়ে ভাজিয়ে বীচে নিয়ে আসা—ট্রিসার গাড়িতে ক্যারিয়ার ব্যাগে কম্বল, তোয়ালে, ইত্যাদি রেডি থাকা সব কিছুর মানেই পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। রানাকে নির্জনে একা পাওয়াই ছিল ওদের লক্ষ্য। কিন্তু কেন? ইন্টারোগেশন?

'জামাকাপড়গুলো চটপট পরে ফেলো, বাছা।' এডি মরগ্যান তাগাদা দিল রানাকে।

হাত পা চালাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে রানার। শরীরটা আগের চেয়ে চারগুণ ভারী ঠেকছে। কৈফিয়তের সুরে বলল, 'মেয়ের ওপর একটু নজর রাখার জন্যে মেয়ের বাবা আমায় মাসে মাসে কিছু দেয়। নিজে হুইল চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারে না বলে এদিক ওদিক বিশেষ যেতে পারে না বেচারা। আর মেয়েটাও হয়েছে একেবারে বন্য প্রকৃতির। অবশ্য ওর কোন চালাকিই আর আমার অজানা নেই—যেমন জানি, কোন মোটেল-রূম ব্যবহার না করে ও এই বীচেই আসবে।'

মিছে কথা, ভাবল রানা। মুখে বলল, 'দৃশ্যটা লুকিয়ে পুরোপুরি উপভোগ করে নিয়ে তারপর মেয়েটাকে সামলাও বুঝি?'

'তুমি হলে কি করতে? দেখতে না?' হাসল এডি।

রানা কাপড় পরে তৈরি হতেই এগিয়ে এসে তার বগলের কাছে হাত ধরে গাড়ির দিকে নিয়ে চলল এডি মরগ্যান। স্লো মোশন মুভির মত হাত পা চলছে রানার। দূরে দেখা যাচ্ছে ট্রিসা গাড়িতে উঠে বসেছে—ফ্রান্সেসকোর ডান হাতটা অকেজো হয়ে ঝুলছে। বাঁ হাত দিয়ে দরজা খুলে পাশের সীটে উঠে বসল সে। গর্জন তুলে ছুটে গেল গাড়িটা মাহমুদ বেগ সিটির দিকে।

'চলো, এগোও রিপোর্টার সাহেব।' হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল এডি রানাকে। একেবারে কাছাকাছি পৌঁছবার পর লুকিয়ে রাখা পেট্রোল কারটা চোখে পড়ল রানার। প্রফেশনাল হাতে ডাল পালা দিয়ে লুকানো হয়েছে গাড়িটা। কিন্তু কাছাকাছি গিয়ে মত পরিবর্তন করল এডি। পেট্রোল কারের দিকে না গিয়ে ল্যান্সিয়াটার কাছে নিয়ে এল সে রানাকে।

'ওঠো।'

উঠে বসল রানা কোনমতে। সব কিছু স্বপ্নের মত লাগছে—ভীষণ ক্লান্ত ঠেকছে।

'সরে বসো—আমি চালাব।'

সরে বসল রানা। ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে—ঘুম পাচ্ছে রানার—একটু যদি ঘুমিয়ে নিতে পারত!

দু'হাতে পেট চেপে কোনমতে স্টিয়ারিং হুইল বাঁচিয়ে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল এডি মরগ্যান।

গলাটা ব্যথা করছে। হাত বোলাতেই চটচটে রক্ত আঙুলে ঠেকল

রানার। বালি উড়িয়ে ছুটল গাড়িটা। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা মুখে লাগতেই মাথা কিছুটা পরিষ্কার হয়ে আসছে টের পেল রানা। স্পষ্ট হয়ে উঠল সব।

কিন্তু রক্ত এল কেমন করে? স্টিয়ারিং হুইলের ওপর রাখা এডির ডান হাতের দিকে নজর পড়ল রানার। ডান হাতের কড়ে আঙুলে রয়েছে ভারী একটা অদ্ভুত ধরনের আংটি। মিনিয়েচার হাইপোডারমিক নিড্‌ল্‌ওয়ালা আংটি চিনতে দেরি হলো না রানার। ড্রাগ করা হয়েছে। সেই জন্যেই এমন ঘুম ঘুম স্বপ্নের রাজ্যে আছে বলে মনে হচ্ছে ওর। সমস্ত মনোবল একত্র করে নিজেকে সজাগ করল রানা। পুলিস ইন্সপেক্টারের হাতে এই আংটি কেন? ওটা তো এসপিওনাজ এজেন্টদের ব্যবহারের জিনিস। সুমো কুস্তির কথা মনে পড়ল রানার। ফ্রান্সের পুলিস ইন্সপেক্টার এমন উন্নত মানের সুমো কুস্তি শিখল কেমন করে?

'তুমি কি ''সুনা'' পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

' ''সুনা'' সম্বন্ধে তুমি আবার কি করে জানলে?' পাল্টা প্রশ্ন করল এডি। অবাক হয়েছে সে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার মুখে ফুটে উঠল গর্বের ভাব।

'কোদোকানে কুস্তি দেখেছি আমি।' বলল রানা। এডির মুখটা কেমন যেন অবাস্তব দেখাচ্ছে না?

'হ্যাঁ, সুনা ধারণ করার সম্মান অর্জন করেছি আমি কোদোকানেই। কিন্তু আর কথা নয়—আরাম করে বসো—কোন চিন্তা নেই তোমার।'

আবার ঘুম ঘুম ভাবটা চেপে ধরছে রানাকে। এডির কথায় কি যেন গরমিল আছে। কিন্তু ঠিক ধরতে পারছে না রানা—মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে।...কোদোকান...সুমো কুস্তির পবিত্র মন্দির...বিদেশী কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ওখানে কুস্তি করতে দেওয়া হয় না। সাদা বেণীর মত সেই গ্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ানের বেল্ট ধারণ করার সম্মান অর্জনের সুযোগ কোন বিদেশী কোনদিন পায়নি। এডি কি করে সেই বেল্ট পেয়েছে?

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। এডির থুতনির ভাঁজে হাত দিয়ে দিল হ্যাঁচকা টান। বিকৃত হয়ে গেল এডির মুখ—রানার হাতে উঠে এল রবারের মুখোশটা। চ্যাপ্টা মঙ্গোলিয়ান চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। চমকে উঠল এডি মরগ্যান, পরমুহূর্তে ভীষণ আকার ধারণ করল ওর চোখ মুখ। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্য হাতে রানাকে একটা ঝাপটা মেরে হাত বাড়াল, ফ্রান্সেসকোর কাছ থেকে নেওয়া ছুরিটা বের করার জন্যে। রানা বাঁ হাতে ধরে রেখেছে ছুরির খাপটা। মাতালের মত গাড়িটা রাস্তার ওপর এপাশ থেকে ওপাশ করছে। ব্রেক কষল এডি। ছুরিটা বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। ঠেকাতে পারেনি রানা। সমস্ত শক্তি একত্র করে শেষ চেষ্টা করল সে। হাতের আঙুলগুলো সোজা রেখে হাত চালাল এডির চোখ লক্ষ্য করে। বেশ অনেকদূর ঢুকে গেল রানার হাত। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে দু'হাতে মুখটা চেপে ধরল এডি। স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে দিয়েছে সে। এদিকে নিজের অজান্তেই টিপে ধরেছে অ্যাক্সিলারেটার! সোজা এগিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা গার্ড-রেইলের দিকে।

দরজা খুলে লাফ দিল রানা। জুডোর কায়দায় কাঁধের ওপর পড়ল—কিন্তু সামলাতে পারল না—ওর দেহটা গড়াতে গড়াতে চলল পিচ ঢালা রাস্তার ওপর দিয়ে। প্রচণ্ড বেগে গাড়িটা গিয়ে গার্ড-রেইলের সঙ্গে ধাক্কা খেল। এডির প্রকাণ্ড দেহটা ছিটকে গিয়ে পড়ল নিচে সমুদ্রে।

এখানে এই অবস্থায় ধরা পড়লেই বিপদ। যতটা সম্ভব দূরে সরে যাওয়া দরকার। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে মাথার ভিতর। উঠে দাঁড়াল রানা। টলতে টলতে মাতালের মত চলছে। আর পারছে না রানা—কিসে যেন হোঁচট খেল। রাস্তার ওপর পড়ে গেল মুখ থুবড়ে, উঠবার শক্তি পেল না। মনের জোরও হারিয়ে গেছে। ক্লান্ত দেহ আর কোন আদেশ মানতে রাজি নয়—বিশ্রাম চায়। বি-শ্রা-ম ঘু-ম।

গাড়ির শব্দে আবার সজাগ হলো রানা। কতক্ষণ পর, তা মনে নেই ওর। বহু কষ্টে উঠে দাঁড়াল। আর রক্ষা নেই—পালাতে হবে। নিশ্চয়ই ফ্রান্সেসকো ফিরে আসছে এডির দেরি দেখে। সামনের দিকে এগোল সে। দ্রুত এগিয়ে আসছে গাড়িটা। গাড়ির হেডলাইট পড়েছে রানার ওপর। গার্ড-রেইলের ফাঁক দিয়ে গলে ওপাশে চলে গেল সে। এসে গেল গাড়িটা। ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল দুটো বুড়ো অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। নামছে গাড়ি থেকে। সমুদ্রের দিকে দৌড় দিল রানা। কিন্তু পা টলছে। দেহের ভার রাখতে পারছে না আর। পড়ে গেল।

জ্ঞান ফিরল রানার। চোখ খুলতেই উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। রোদ। সূর্য উঠছে। আবার চোখ বুজল। চোখ বুজেই মনে পড়ে গেল গত রাতের ঘটনাটা। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ঘড়িতে দেখল সকাল ছ'টা। এখনও রাস্তায় গাড়ি চলাচল আরম্ভ হয়নি। দূরে দেখা যাচ্ছে ল্যান্সিয়াটা গার্ড-রেইলের ধারে। তাহলে কাল রাতের ঘটনা সবই বাস্তব—দুঃস্বপ্ন নয়। তবে কি ফ্রান্সেসকোর আবার ফিরে আসা—রানার চোখে উজ্জ্বল আলো ধরে তাকে জেরা করা—ফ্রান্সেসকোর হলুদ দাঁত বের করা হাসি—এসব যে কাল রাতে রানা দেখল, সেগুলোও বাস্তব? নিজের শরীরটা পা থেকে মাথা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দেখল রানা—নাহ্, শুধু গলার ব্যথাটা আর কাঁধের কাছে একটু ব্যথা ছাড়া সুস্থই আছে সে। কোথাও কোন হাড়গোড় ভাঙা নেই। ফ্রান্সেসকোর হাতে পড়লে রানাকে সে আস্ত ছাড়ত না। ওটুকু নিশ্চয়ই স্বপ্ন।

ধীর পায়ে নিজের ল্যান্সিয়ার কাছে এসে দাঁড়াল রানা। বাঁদিকের বাম্পার আর উইং একেবারে দুমড়ে গেছে। কিন্তু চালানো যাবে মনে হয়। গাড়িতে বসে সেল্‌ফ দিতেই স্টার্ট নিল গাড়ি। হোটেলে না ফিরে গাড়ি ঘোরাল রানা সেই নির্জন বীচের দিকে।

পেট্রোল কারটা নেই। দ্রুত চিন্তা চলছে রানার মাথায়। ফ্রান্সেসকো যদি গাড়ি নিতে এসে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই রানাকে ও এডিকেও খুঁজেছে সে। রানার গাড়ি দেখে আশেপাশে খুঁজে রানাকে বের করা এমন কিছু কঠিন কাজ

নয়। রানাকে পেয়ে জেরাও নিশ্চয়ই করেছে। কিন্তু কতখানি জানতে পেরেছে জেরা করে ওরা ওর কাছ থেকে? যতটুকুই জেনে থাকুক না কেন রানাকে তার ভোল পাল্টাতেই হবে। শহরের দিকে ফিরল সে। যেখানে গাড়িটা ছিল সেখানে ঠিক যেমন ছিল তেমনি ভাবে রেখে দিয়ে পায়ে হেঁটে শহরে ফিরল রানা। শহরে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়ে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরল। কেউ ফলো করছে না সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে কোচ স্টেশনে মার্সেইগামী কোচে উঠে বসল। মার্সেই শহরে কিছুক্ষণ ঘুরে স্যালনের বাস ধরল রানা। বেনসনের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেখল এতক্ষণ মিছেই লুকোচুরি খেলেছে সে। বেনসনের ঠিকানা ওদের অজানা নেই—হয়তো ওষুধের প্রভাবে রানা নিজেই নিজের অজান্তে জানিয়েছে ওদের। ঘরের দিকে চেয়ে মনে হয় যেন ঘরের মধ্যে বাঘ-সিংহের লড়াই হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা ড্রয়ার খোলা—ড্রয়ারের সব জিনিস মাটিতে ছড়ানো। বিছানার তোষক চিরে, সুটকেস কেটে প্রতিটি জিনিস ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

দরজা লক করে এগিয়ে গেল সে টেলিফোনের কাছে। পিটার গিল্ ডুক্সেম ব্যুরোর দক্ষিণ অঞ্চলের ইনচার্জ। পিটারকে আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছে ফিলিপ কার্টারেট রানাকে সব রকম সহযোগিতা দেয়ার জন্যে। পিটারের টেলিফোন নাম্বারে ডায়াল করল রানা—মেডিক্যাল অ্যাটেনশন দরকার ওর। এবং খুব দ্রুত। ভারসাম্য ফিরে পাচ্ছে না সে কিছুতেই। সব ঘোলাটে। বেনসনের কাভারও আর ব্যবহার করতে পারছে না রানা—অন্য কাভারে কাজ করতে হবে, যদি ওষুধের প্রভাব কাটিয়ে সেরে উঠতে পারে।

'পিটার গিল্ বলছি।' শোনা গেল রিসিভারে। টেলিফোন ধরেছে পিটার। এটা পিটারের নিজস্ব নাম্বার।

'বেনসনের ফ্ল্যাট থেকে বলছি—রানা। বেনসন নেই এখানে—ফ্ল্যাটের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে কোন কঠিন বিপদ ঘটেছে ওর।'

'কঠিন বিপদই বটে। আজ সকালে গুলি খেয়ে খুন হয়েছে বেনসন। ওর ফ্ল্যাটে ও একটা ইলেকট্রোনিক ডিটেকটর ফিট করেছিল। কেউ অনধিকার প্রবেশ করলেই বিপদ সঙ্কেত দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আজ সকালে মদ কিনতে বেরিয়েছিল। ওই সিগনাল পেয়ে আমাকে একটা ফোন করে একাই ছুটেছিল সে। আমাদের আরও লোক যখন পৌঁছায় তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, হত্যাকারী সরে পড়েছে। অসাবধানতার জন্যেই ঘটে গেল এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা।'

টুলনের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে পিটার বলল: 'মার্সেই থেকে মাইল কয়েক দূরে আমাদের নিজস্ব নার্সিংহোম আছে। আপনার তো গাড়ি নেই সঙ্গে। ঠিক আছে আপনি বেনসনের ফ্ল্যাটেই অপেক্ষা করুন। আমি আধঘণ্টার মধ্যে আসছি। চিন্তা করবেন না, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' টেলিফোন ছেড়ে দিল পিটার।

তুলো আর স্প্রিং বের করা সোফার ওপরেই একটা কম্বল বিছিয়ে নিয়ে

যতটা সম্ভব আরাম করে বসল রানা। আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে তাকে এই ঘরে। সময়টার সদ্ব্যবহার করবার চেষ্টা করল সে চিন্তা করে। বিক্ষিপ্ত ভাবে অনেক তথ্যই সে জেনেছে। কিন্তু কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল খুঁজে পাচ্ছে না। মেরে ফেলা হলো না কেন ওকে? তবে কি চিনতে পারেনি ওকে কবির চৌধুরী? মাহমুদ বেগের সঙ্গে যে কবির চৌধুরীর যোগাযোগ আছে সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা। ওরা দু'জন মিলে অ্যাকোয়া সিটির নামে যে একটা গভীর কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে সেটাও আঁচ করা যাচ্ছে—কিন্তু…

দরজার কাছে মৃদু শব্দে সোজা হয়ে বসল রানা। চাবির গর্তে সেলুলয়েড ঢুকিয়ে খুলবার চেষ্টা করছে কেউ। দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে দরজার পাশে পৌঁছে গেল রানা। হাতলটা ঘুরছে আস্তে আস্তে। খুলে গেল দরজাটা। লোকটা ঘরের মধ্যে পা বাড়াতেই রানার লাথি গিয়ে পড়ল লোকটার পিস্তল ধরা হাতের কব্জিতে। ছিটকে গিয়ে পড়ল পিস্তলটা একটা তুলো বের করা সোফার ওপর। ঘুরে দাঁড়াল লোকটা।

ক্যাপ্টেন সন্ডার্স!

রানাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল ক্যাপ্টেন। চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেছে—তোতলাতে আরম্ভ করল সে। 'আ—আ—আপনি? কি করে সম্ভব? কিছুক্ষণ আগেই আমি…'

'গুলি করে খুন করেছ আমায়—এই তো?' কথা যুগিয়ে দিল রানা। মরা মানুষকে জ্যান্ত হয়ে উঠতে দেখে একেবারে বোকা বনে গিয়েছে ক্যাপ্টেন সন্ডার্স। হঠাৎ সামলে নিয়েই প্যান্টের ডান পকেটে হাত ঢোকাল সে। এরকম একটা কিছুর জন্যে তৈরিই ছিল রানা—এক লাফে গিয়ে পড়ল ক্যাপ্টেনের ওপর। হাত মুচড়ে হ্যামার লক মেরে পেড়ে ফেলল তাকে মেঝের ওপর উপুড় করে। ছুরিটা বের করে নিল ওর পকেট থেকে।

ক্যাপ্টেন সন্ডার্সের সঙ্গে এমন ভাবে আবার দেখা হবে স্বপ্নেও ভাবেনি রানা। টুলনে এডি মরগ্যানের সঙ্গে ক্যাপ্টেন সন্ডার্সকে দেখা করতে দেখে ধারণা করে নিয়েছিল সে হিট অ্যান্ড রান অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করায় এডি মরগ্যানের নির্দেশেই ইনফরমার হিসেবে রিপোর্ট করেছে ও রানার কথা। কিন্তু সন্ডার্সকে বেনসনের ফ্ল্যাটে দেখে এখনও সন্দেহ হচ্ছে হয়তো ওরকম কোন অ্যাক্সিডেন্টই ঘটেনি—হতে পারে পুরো ব্যাপারটাই ওর মনগড়া। ক্যাপ্টেন সন্ডার্সের জবানবন্দী ছাড়া আর কোন প্রমাণই যখন নেই—অসম্ভব কি?

যে করেই হোক এর কাছ থেকে কথা বের করতে হবে। ছুরি দিয়ে শব্দ করে ফেড়ে ফেলল রানা ক্যাপ্টেন সন্ডার্সের কোটটা পিঠের দিকের কলারের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত। শিউরে উঠল ক্যাপ্টেন সন্ডার্সের দেহ। বলির পাঁঠার মত কাঁপছে সে ভয়ে। রানা যে দরকার পড়লে কতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে সেটা বুঝে নিয়েছে সে পরিষ্কার।

'অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা কি তোমার নিজের মনগড়া কাহিনী? সত্যি কথা

চাই আমি—নইলে খুন করে ফেলব।' ছুরি বিঁধাল রানা ক্যাপ্টেনের শোল্ডার ব্লেডের ওপর।

যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল ক্যাপ্টেন, 'কসম খেয়ে বলছি, মিথ্যে বলিনি আমি। নিজের চোখে আমি দেখেছি মেয়েটাকে গাড়ি চাপা দিয়ে চলে যেতে। এডি মরগ্যান আমাকে বলেছিল, কেউ যদি জিজ্ঞাসাবাদ করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ওকে জানালে একশো ফ্র্যাঙ্ক দেবে। টাকার লোভে জানাতে গিয়েই আমার এই অবস্থা। এডি বলছে ওর কথামত না চললে খুন করে ফেলবে আমাকে। ওকে সবাই ভয় করে। ও পারে না এমন কাজ নেই।'

'ইন্সপেক্টার এডি মরগ্যান সম্বন্ধে বলো এবার যা জানো।'

'কিছুই জানি না। খোদার কসম। ছ'মাস আগে বদলি হয়ে এসেছে কোথা থেকে যেন। সাঙ্ঘাতিক কড়া।'

'আর ফ্রান্সেসকো?'

'নিচে অপেক্ষা করছে ফ্রান্সেসকো। ও-ই আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে আপনার ফ্ল্যাট সার্চ করার জন্যে।'

'আমি মনে করে অন্য একটা লোককে খুন করেছ তুমি—তাই না?' ছুরির খোঁচা দিল আবার রানা।

'গেছিরে বাবা—আমি না—বিশ্বাস করুন, ফ্রান্সেসকো মেরেছে ওকে।'

'আবার ফেরত এসেছ কেন?'

'লাশটার হাতে ইঞ্জেকশনের দাগ পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছে আমাকে ফ্রান্সেসকো।'

ঘরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি টের পেল রানা। নিঃশব্দে দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছে ফ্রান্সেসকো। দ্যুপ করে আওয়াজ হলো সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের। ক্যাপ্টেন সভার্সের মাথাটা ফুটো হয়ে গেল গুলির আঘাতে। হাঁটু গেড়ে বসেছিল রানা। গুলির শব্দে বাঁ হাঁটুর ওপর দেহটা ঘুরিয়ে ওই অবস্থাতেই ছুরিটা ছুঁড়ে মারল দরজার সামনে দাঁড়ানো ফ্রান্সেসকোর দিকে। ছুরির বাঁটটা গিয়ে পড়ল ফ্রান্সেসকোর পিস্তল ধরা হাতের ওপর। গুলি করল ফ্রান্সেসকো। রানার ডান কাঁধ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা। এক লাফে চলে এসেছে রানা দরজার কাছে। ফ্রান্সেসকো দ্বিতীয়বার রানাকে লক্ষ্য করে গুলি করবার আগেই প্রচণ্ড এক লাথি গিয়ে পড়ল তার তলপেটে। একই সঙ্গে কারাতের চপ মারল সে পিস্তল ধরা হাতটার ওপর। অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে বেঁকে গেল ওর হাতটা। উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল ফ্রান্সেসকো পিস্তলটার ওপর। দ্যুপ করে শব্দ হলো পিস্তলের। ঠেলা দিয়ে চিৎ করে ফেলল রানা ফ্রান্সেসকোর দেহ। গুলিটা ওর বুক ভেদ করে চলে গেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। বেচারার এই পরিণতি হবে জানলে এত জোরে মারত না সে ওকে।

ফ্রান্সেসকোর দেহটা টেনে ক্যাপ্টেন সভার্সের দেহের পাশে নিয়ে গেল রানা। সার্চ করে দু'জনের কারও কাছেই গোটাকয়েক নোট আর ভাঙতি

পয়সা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না।

এবার নিজের দিকে মন দিল রানা। কাঁধের কাছটাতে চটচট করছে। অবশ হয়ে রয়েছে জায়গাটা। ফ্রান্সেসকোর গুলিটা কাঁধের খানিকটা মাংস খুবলে নিয়ে গেছে।

ইঞ্জেকশন! হ্যাঁ, বাঁ হাতের ছোট্ট লাল ক্ষতটা খুঁজে বের করতে বেশিক্ষণ লাগল না রানার। এবারে নিঃসন্দেহ হলো সে, গত রাতে দেখা ফ্রান্সেসকোর মুখ, তীব্র আলো, এসব স্বপ্ন ছিল না। কিন্তু আবার সেই আগের প্রশ্নটাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল রানার মনে। তাকে মেরে ফেলল না কেন ওরা? আর ইঞ্জেকশনের দাগ পরীক্ষা করবার জন্যেই বা আবার কেন ফিরে এল? তবে কি ট্রুথ সিরামের সাথে পোলোনিয়াম ২১০ জাতীয় কিছু ইনজেক্ট করা হয়েছে তার শরীরে? হ্যাঁ, মিলে যাচ্ছে। এই কারণেই ফ্রান্সেসকোর হাত থেকে ছাড়া পেয়েছে রানা। ভ্রাম্যমাণ ট্র্যান্সমিটারে পরিণত হয়েছে রানার শরীর। রানা যেখানেই থাকুক না কেন গাইগী কাউন্টারে ধরা পড়বে তার সঠিক অবস্থান। রানার কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে বেনসনের ফ্ল্যাট সার্চ করছিল ওরা, এমনি সময় সিগনাল পেয়ে ফিরে এসেই গুলি খেয়েছে বেনসন। বেনসনকে মেরে ফেরার পথে নিশ্চয়ই ওদের গাইগী কাউন্টার অন করা ছিল। রানার বাস ক্রস করার সময় কাউন্টারে ধরা পড়ে। ঘটনাটা নিশ্চয়ই হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল ওদের। সাত-পাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত ঝুঁকি নিয়েই ফিরে এসেছিল ওরা ব্যাপারটা যাচাই করে দেখার জন্যে। উঠে দাঁড়াল রানা। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। রক্তের দাগ ঢাকার জন্যে নিজের জ্যাকেটটা খুলে ফেলে বেনসনের একটা জ্যাকেট পরে নিল। বেনসনের ফ্ল্যাটের সামনে পার্ক করা গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল রানা। সীটের ওপর রাখা গাইগী কাউন্টারটা কর্‌র্‌র্ একটানা শব্দ করে চলেছে। ওটা হাতে নিতেই শব্দটা আরও জোরদার হয়ে উঠল। অফ্ করে দিল ওটাকে রানা। ফিরে এল বেনসনের কামরায়। তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার।

পাঁচ

অস্পষ্ট গুঞ্জন কানে আসছে রানার। কারা যেন কথা বলছে ঘরের মধ্যে। কানে এল কে যেন বলে উঠল, 'হ্যাঁ, যা বলেছিলাম মিস্টার গিল্—এই ধরনের অপারেশন আজকাল হামেশাই হচ্ছে। শরীরের কোন ক্ষতি হয় না, ছোট্ট একটা অপারেশন করে দেহের রক্ত একদিক দিয়ে বের করে নিয়ে একটা বিশেষ ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে পরিশুদ্ধ করে সেই রক্তই আবার অন্য পথে দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ফিল্টারটাই আসলে এক বিস্ময়কর আবিষ্কার।'

ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা। উজ্জ্বল আলো। বার কয়েক চোখ মিটমিট

করতেই আলোটা সহ্য হয়ে এল চোখে। একে একে সব ঘটনাই মনে পড়ল ওর। পিটার গিলের আগমন, ফ্রান্সেসকো আর ক্যাপ্টেন সভার্সের মৃতদেহের ব্যবস্থা করে রানাকে নার্সিং হোমে নিয়ে আসা। পরের ঘটনাগুলো অবশ্য রানার কাছে অস্পষ্ট। আবছা ভাবে মনে আছে অনেকবার করে রক্ত পরীক্ষার কথা, পিটার গিলের দৌড়াদৌড়ি। ব্লাড্ ট্রান্সফিউশন, অপারেশন···

'কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম আমি?' প্রশ্ন করল রানা।

'চারদিন হলো আপনি এসেছেন আমাদের এখানে।' হেসে জবাব দিল সাদা অ্যাপ্রন পরা ডাক্তার।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে যাচ্ছিল রানা, বাধা দিয়ে আবার শুইয়ে দিল ডাক্তার।

'ব্যস্ত হবার কিছু নেই, আরাম করুন। অন্তত আরও একটা দিন আপনাকে থাকতে হবে আমাদের এখানে। আপনার রক্তটা আবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে ফিল্টারে কতখানি কাজ হয়েছে।' তারপর পিটার গিলের দিকে চেয়ে বলল, 'আমি নার্সকে বলে দিচ্ছি, কেউ আপনাদের আগামী পনেরো মিনিটের মধ্যে বিরক্ত করবে না। কিন্তু তাড়াতাড়ি আপনাদের কথা সেরে নিতে হবে, বিশ্রাম দরকার পেশেন্টের।' কেবিনের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল ডাক্তার।

'কেমন বোধ করছেন এখন?' এতক্ষণে মুখ খুলল পিটার গিল।

'চমৎকার। কাঁধের কাছে সামান্য ব্যথাটা না থাকলে টেরই পেতাম না আমার কিছু হয়েছিল।'

'ফ্রান্সের সেরা ডাক্তার আপনার চিকিৎসা করছেন। ভাল না হয়ে উপায় আছে? সত্যি—ডক্টর গর্মে ডুক্লেম ব্যুরোর এই নার্সিং হোমে আছেন বলে আমরা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করি। যত কঠিন আর যত বিদঘুটে কেসই আসুক না কেন একটা না একটা উপায় উনি ঠিকই বের করে ফেলেন। আর জানেন তো এই লাইনে বিদঘুটে কেসের অভাব নেই। এই আপনাদের কেসটাই ধরুন না—ওই বিশেষ ফিল্টারটা ওঁরই আবিষ্কার।'

'ওদিককার কোন খবর পেলেন?' পনেরো মিনিট সময় হাবিজাবি বকেই হয়তো কাটিয়ে দেবে এই ভয়ে রানা সোজাসুজি কাজের কথা পেড়ে বসল।

'খুব একটা এগুতে পারিনি। বস্—মানে মিস্টার কার্টারেট তিন-চার-বার করে আপনার কুশল জানার জন্যে আমায় এখানে পাঠিয়েছেন প্রতিদিন। কড়া অর্ডার, নিজে দেখে গিয়ে টেলিফোনে রিপোর্ট দিতে হবে। তবু নিজে সময় না পেলেও অন্য লোক লাগিয়ে রুটিন চেক কিছু করিয়েছি। বস্ দেখলাম আপনার জন্যে খুব উদ্বিগ্ন। আপনাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা আছে বুঝি?'

'আমরা এক সঙ্গে কিছু কাজ করেছি, সেই থেকেই যা ঘনিষ্ঠতা। হ্যাঁ, রুটিন চেক কিছু করিয়েছেন বলছিলেন?' আবার কাজের দিকে কথার মোড় ঘোরাল রানা।

'ক্যাপ্টেন সভার্সের খবর একেবারে তার জন্মের সময় থেকে নিয়ে মৃত্যু

পর্যন্ত সঠিক জানা গেছে। লোকটা লোভী ছিল, কিন্তু কোন ক্রিমিনাল রিপোর্ট নেই ওর বিরুদ্ধে।'

'আর ফ্রান্সেসকো?'

'ফ্রান্সেসকো আর এডি মরগ্যান দু'জনেরই জন্ম গত এক বৎসরের মধ্যেই হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এক বৎসরের বেশি কারও সম্পর্কেই কিছু জানা সম্ভব হয়নি অনেক চেষ্টা করেও।'

'তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ওরা কেউই এখানকার স্থানীয় লোক নয়। এডি হচ্ছে জাপানী আর ফ্রান্সেসকো সম্ভবত টিবেটান। জায়গামত খুঁজলে ওদের দুজনেরই বিরাট বিরাট ক্রিমিনাল রেকর্ড পাওয়া যাবে।'

'প্যাট্রিসিয়া ব্র্যান্ড বর্তমানে কোন্ প্রজেক্টে কিসের ওপর কাজ করছে বলতে পারেন?'

'মিস ব্র্যান্ড লি-বিউসেতে একটা গভমেন্ট প্রজেক্টে কাজ করছেন। বর্তমানে ছুটিতে আছেন উনি। কিন্তু ওই প্রজেক্টের যে কি কাজ তা কিছুতেই বের করা গেল না। টপ সিক্রেট।'

কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে কি ভাবল রানা, তারপর বলল, 'মিস্টার কার্টারেটকে আমার হয়ে আজই জানাবেন যে যত সিক্রেটই হোক ওই প্রজেক্টের মঙ্গলের জন্যেই আমাদের জানা দরকার ওরা কি কাজ করছে। আমার বদ্ধমূল ধারণা যে মিস ব্র্যান্ডের সঙ্গে যখন কবির চৌধুরীকে দেখা গেছে প্যারিসে, তখন আগে থেকে সাবধান না হলে ওই সিক্রেট প্রজেক্টের কোন না কোন অমঙ্গল সে ঘটাবেই। ভয়ঙ্কর লোক ওই কবির চৌধুরী।'

নার্স এসে ঢুকল ঘরে। অর্থাৎ পনেরো মিনিট শেষ। বেরিয়ে গেল পিটার গিল। এতক্ষণে সরাসরি তাকাল রানা নার্সের দিকে। তাকিয়েই চমকে উঠল। 'সোহানা! তুমি এখানে কি করছ?'

ছুটে এসে রানাকে জড়িয়ে ধরে এলোপাতাড়ি চুমোতে ভরিয়ে দিল সোহানা। রানার জ্ঞান ফিরেছে দেখে বাচ্চা মেয়ের মত খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে সে। খুশির আবেগ একটু কমলে রানা আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলে নার্সের বেশে?'

'হুকুম। তোমাদের বুড়োমিঞার। আমার ওপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে এক মুহূর্তও যেন তোমাকে চোখের আড়াল না করি। যদি তোমার কিছু ঘটে যায় জবাবদিহি করতে হবে আমাকে। ফিলিপ কার্টারেটের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে উনিই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আরও অনেক ব্যাপার আছে। এই অ্যাসাইনমেন্টে তোমার সঙ্গে আমাকেও কাজ করতে বলা হয়েছে হেডকোয়ার্টার থেকে। কিন্তু সেসব কথা পরে শুনো। ডক্টর গর্মে বলেছেন কম্প্লিট রেস্ট দরকার তোমার এখন। বিপদ সম্পূর্ণ কাটেনি এখনও।'

'তিনচারদিন তো ঘুমিয়েই কাটালাম। আর কত রেস্ট? আস্তে করে উঠে

এসো দেখি বিছানায়—ভাল মত রেস্ট নেয়া যাক।'

ক্যান্টিন নার্স খাবারের ট্রলি নিয়ে ঘরে ঢুকল। বয়স্কা। হাসি হাসি মুখ। রানাকে বিছানার ওপর আধবসা অবস্থায় দেখে বলল, 'বাহ্, আমাদের হ্যান্ডসাম নিউ পেশেন্ট এরই মধ্যে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে দেখছি! যাক, এবার সোহানার মুখে হাসি দেখতে পাব আমরা। বেচারী একেবারে মনমরা হয়ে ছিল এ ক'দিন দুশ্চিন্তায়।'

সোহানার চোখের দিকে চাইল রানা। চট্ করে চোখটা নামিয়ে নিল সোহানা। ক্যান্টিন নার্স বেরিয়ে যেতেই ওর হাত ধরে মৃদু টান দিল রানা নিজের দিকে।

'এখন না, লক্ষ্মী। পাগলামি করে না স্বামী-স্ত্রী হিসেবে শীঘ্রিই সাগরতীরে বেড়াতে যাচ্ছি আমরা। আপাতত আমি তোমার বডিগার্ড।'

ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল সমুদ্রের ধারের ছোট্ট হোটেলটার সামনে। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস হেইন্‌স্ নামে বুক করা হয়েছে হোটেলের সবচেয়ে সুন্দর স্যুইটটা রানা আর সোহানার জন্যে। সব ব্যবস্থা সোহানাই করেছে। হোটেল রেজিস্টারে সই করে দিতেই বেলবয় সুটকেস দুটো ওদের জন্যে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা স্যুইটে পৌঁছে দিয়ে গেল। দুজনেরই পছন্দ হয়েছে স্যুইটটা। মাঝারি গোছের একটা হল-রুম। মডার্ন ফারনিচার। সাইড-টেবিলের ওপর টেলিফোন রাখা আছে। ওপাশে একটা নতুন টেলিভিশন সেট। ঘরের মাঝামাঝি বিরাট একটা বে-উইনডো। পুরো সমুদ্রের ভিউটাই পাওয়া যায় ওখান থেকে।

টক্ টক্ টক্। দরজায় নক শোনা গেল। ওরা কাউকে আশা করছে না এই সময়ে। ওরা এখানে আছে সে কথা কারও জানার কথাও নয় একমাত্র ফিলিপ কার্টারেট ছাড়া।

'কে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বেল বয়, স্যার।'

'দরজা খোলাই আছে, ভিতরে এসো।' আদেশ করল রানা।

একটা ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে ভিতরে ঢুকল বেল বয়। ট্রলির ওপরে আইস বাকেটে রাখা রয়েছে একটা শ্যাম্পেনের বোতল। পাশেই রাখা দুটো গ্লাস।

'ট্র্যাডিশন, স্যার। ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে হানিমুন কাপ্‌লের জন্যে শুভেচ্ছা।'

আস্তে করে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল বয়।

শ্যাম্পেন ঢেলে একটা গ্লাস সোহানাকে দিয়ে অন্যটা নিজে নিল রানা।

বীচে রানা আর সোহানা ছাড়া জনপ্রাণী নেই। পড়ন্ত বিকেল। হোটেল থেকে নিয়ে আসা বিরাট বেডশীটটা বিছিয়ে বসেছে ওরা সমুদ্রের ধারে। হোটেল

কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সব রকমের স্পেশাল খাতির পাচ্ছে ওরা হানিমুন কাপ্‌ল্‌ হিসেবে। বার থেকে এই একটু আগে কয়েকটা বোতল পৌঁছে দিয়ে গেল বীচে। বলে গেল, দামের জন্যে চিন্তা করতে হবে না, যা বাঁচবে সব ফেরত নেবে—যতটুকু খাওয়া হবে কেবল সেইটুকুরই দাম নেবে ওরা। একেবারে গায়ে পড়েই আদর করছে ব্যাটারা। ট্র্যাডিশন!

'সারাটা জীবন হানিমুন কাপ্‌ল্‌ হয়ে কাটাতে পারলে মন্দ হত না।' একটা গ্লাসে ড্রিংক ঢালতে ঢালতে মন্তব্য করল রানা।

'সত্যিই। স্বপ্নের মত কেটে গেল ক'টা দিন। তাই না?' টেপ রেকর্ডারের আওয়াজ একটু কমিয়ে দিল সোহানা 'জীবন যে এত সুন্দর হতে পারে আমার ধারণা ছিল না।'

টপ টোয়েন্টি বাজছে রেকর্ডারে। প্যারিস থেকে এসেছে এটা কিছুক্ষণ আগে। দিয়ে গেছে ফিলিপ কার্টারেটের লোক। সাথে দুটো ক্যাসেট। একটায় টপ টোয়েন্টি, অপরটায় গোপন মেসেজ।

'তোমার জন্যে কি ঢালব, সোহানা?'

'এমনিতেই মাতাল হয়ে আছি, রানা ওসব ছাইপাঁশ আর খাব না।' রানার চুলে বিলি কাটতে কাটতে টুক করে একটা চুমো খেল সোহানা ওর কপালে।

ট্রাম্পেটের নস্টালজিক কলজে-ছেঁড়া সুরে কেমন যেন টনটন করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। ঢেউয়ের পর ঢেউ ভাঙছে তীরে এসে—অবিরাম। অলস ভঙ্গিতে উড়ছে সীগাল। বহুদূরে একটা জাহাজের অস্পষ্ট আভাস। সোহানার একটা হাতে মৃদু চাপ দিল রানা।

'সত্যি কথা বলব?'

'বলো।'

'জীবনে এত ভাল আর কাউকে কোনদিন লাগেনি আমার।'

রানার চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসল সোহানা। 'কিন্তু তবু…'

'আর কোন "কিন্তু তবু" নেই, সোহানা কদিন ধরেই ভাবছি কথাটা। আর কত? এবার দেশে ফিরেই…বুঝলে? শুধু শুধুই কষ্ট দিচ্ছি আমরা নিজেদের। আমি যেমন জানি তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না, তেমনি তুমিও জানো, আমাকে ছাড়া তুমি অসম্পূর্ণ। ভেবে দেখলাম, তুমি যদি বলো, অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারব আমি বিসিআই।'

'সেটা আমি কোনদিনই বলব না, রানা। তোমার প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক পা এদিক ওদিক যেতে বলব না আমি কোনদিন।'

'কেন? তোমার খারাপ লাগবে না?'

'কেন লাগবে? তুমি বদলে গেলে আমারই তো ক্ষতি। যে রানাকে ভালবাসি, তাকে কি আর পাব বদলে নিলে? দোষে-গুণে তুমি যা, সেই সম্পূর্ণ মানুষটাকে মন দিয়ে তাকে আবার বদলাতে যাওয়া বোকামি না?'

'তার মানে তুমি বলতে চাও, তোমার মেজাজটা এমনি তিরিক্ষিই রাখবে,

বদলাবে না কিছুতেই?'

'আমি তোমার দাসী হয়ে গেলে আর ভালবাসতে পারবে?'

'না। তা পারব না। রাণী হয়ে থাকবে তুমি আমার ঘরে। ঠিক আছে। রাণীদের একটু মেজাজ থাকেই। অলরাইট, মেনে নিলাম। এক-আধদিন ফায়ারিং বেশি হয়ে গেলে রানা এজেন্সি তো রইলই। রাত কাটিয়ে দেয়া যাবে সোফায় শুয়ে। কিন্তু এখন সমস্যাটা হচ্ছে: বুড়োমিঞাকে ব্যাপারটা জানাবে কে? তুমি না আমি?'

'তুমি।'

'উহুঁ। তুমি।'

'অসম্ভব! এক ধমকে আমার পিলে চমকে দেবে।'

'আমার পিলেটাই কি আস্ত রাখবে? তুমিই যদি সাহস না পাও, আমি কোথাকার কে?'

'তুমি মেজর জেনারেলের কোথাকার কে সেটা আমি কোনদিন বোঝাতে পারব না তোমাকে। ওঁর কাছে তুমি যে কতখানি কি সেটা বুঝি আমরা। সোহেল...'

'ঠিক বলেছ। সোহেল ব্যাটাকেই পাকড়াব ঘটক হিসেবে। ওকেই পাঠাব।'

'ও যেতে রাজি হবে? ওর প্রাণে ভয়ডর...'

'রাজি হবে না মানে? পিটিয়ে লাশ করে ফেলব না শালাকে? এই সামান্য বিপদ ঘাড়ে নেবে না, তাহলে কিসের বন্ধু? ওকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে ঠিক পাঁচমিনিট পর ঢুকব আমি। ব্যস, আর কোন চিন্তা নেই। একমাত্র চিন্তা এখন, বুড়ো আমাকে অ্যাকটিভ ফিল্ড থেকে সরিয়ে ডেস্কে না বসিয়ে দেয়।'

'সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না। ফিল্ডে আমাদের আর যোগ্য লোক কোথায়? তোমাকেই পাঠাবে, ভয়ে প্রাণ উড়ে যাবে আমার, পাঁচ ওয়াক্ত খোদাকে ডাকব, আর ওদিকে তুমি হয়তো কোন সুন্দরীকে নিয়ে...'

'অসম্ভব। এই একটা ব্যাপারে আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে অনুরোধ করব আমি তোমাকে, সোহানা। বিয়ের আগে ওসব এক কথা, কারও সঙ্গে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ নই আমি; কিন্তু বিয়ের পর বিশ্বাস ভঙ্গ করে গোপনে অন্য নারীর সঙ্গে ফূর্তি করাকে আমি ঘৃণ্য কাজ বলে মনে করি।'

'যদি কাজের খাতিরে এর দরকার পড়ে?'

'সে ধরনের কাজে না গেলেই হলো। কোন খাতিরেই এই ব্যাপারটাকে বরদাস্ত করতে আমি রাজি নই।'

'প্রেজুডিস। অবশ্য এটা আমার জন্যে মস্ত সুখবর। যত মহৎই হোক, কোন নারীই সহ্য করতে পারে না তার স্বামীকে অন্য স্ত্রী-লোকের...কিন্তু প্রয়োজন হলে সেটাও সহ্য করে নেব ভেবেছিলাম।' মৃদু হাসল সোহানা। 'বাঁধনের মধ্যে এনে তোমাকে খর্ব করতে চাইনি আমি কোনদিক থেকেই।'

'আমি নিজেই যদি লিমিটেশন আরোপ করি, তাহলে আপত্তি নেই

নিশ্চয়ই?'

'তোমার যা ভাল মনে হবে তাই করবে

'গুড। মজা যা লোটাব লুটে নিতে হবে আমার বিয়ের আগেই। এসো।'

'অ্যাই, না, এখানে কি!' দুই হাতে ঠেলে সরিয়ে দিল সোহানা রানাকে। 'প্লীজ, হোটেল থেকে সব দেখা যায়।'

'এতদূর থেকে কে কি বুঝবে? মনে করবে জাস্ট গল্প করছি।'

'বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে কেউ আমাদের ওপর নজর রাখছে না তা কে বলতে পারে? এখন না, প্লীজ!'

'ঠিক আছে। সন্ধ্যেটা নামুক, তখন আর কারও নজর রাখতে হচ্ছে না! এবার তাহলে আমাদের কাজটা সেরে নেয়া যাক? তুমি আমার দিকে মুখ করে বসো, নজর রাখো পেছন দিকটায়, আমি তোমার দিকে মুখ করে নজর রাখছি তোমার পেছনে। রেডি?'

ক্যাসেট পাল্টে প্লে লেখা বোতামটা টিপে দিতেই পরিষ্কার ভেসে এল ফিলিপ কার্টারেটের ভরাট গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

'এই টেপটা স্পেশাল ম্যাগনেটিক হেড দিয়ে রেকর্ড করা হয়েছে। একবার বাজালেই আপনা আপনি মুছে যাবে আমার কথাগুলো। সুতরাং, মনোযোগ দিয়ে শোনো।

'প্যাট্রিসিয়া ব্র্যান্ডের কাজ সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে সে এমন গুরুত্বপূর্ণ আর গোপনীয় সরকারী প্রজেক্টে কাজ করছে যে সেই প্রজেক্টের কথা স্বয়ং প্রেসিডেন্ট, তিনজন চীফ অভ স্টাফ এবং যে ক'জন বৈজ্ঞানিক কাজ করছেন ওই প্রজেক্টে, এঁরা ছাড়া আর কেউই জানে না।

'বাংলাদেশ থেকে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে কবির চৌধুরীর কীর্তিকলাপের পূর্ণ বিবরণ আমার হাতে পৌঁছেচে। ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে আমি নিজে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব জানিয়েছি। উনি এ ব্যাপারে তোমাকে ডুক্সেম ব্যুরোর পরিপূর্ণ সহযোগিতা দেবার নির্দেশ দিয়েছেন।

'লি-বিউসের নিষিদ্ধ এলাকায় ফ্রান্সের সেরা সব বৈজ্ঞানিক একত্র হয়ে কমপ্যাক্ট অথচ খুবই ক্ষমতাশালী একটা আনবিক মিসাইল তৈরি করছেন। ওটা এতই শক্তিশালী যে যার কাছে ওটা থাকবে সে চাইলে সারা পৃথিবীকে তার কথা মত চলতে বাধ্য করতে পারবে। আমেরিকা ও রাশিয়াতেও এত শক্তিশালী নিউক্লিয়ার ওয়ার-হেড এখনও কল্পনা মাত্র। ড্রইং বোর্ড স্টেজেও আসেনি।

'প্যাট্রিসিয়া ব্র্যান্ডের কথায় আবার পরে আসছি—কিন্তু তার আগে মাহমুদ বেগ, জিমি ক্লিদারো, প্রফেসার ব্র্যান্ড আর অ্যাকোয়াসিটি সম্বন্ধে যা আমরা জানতে পেরেছি সেটা বলে নেই। জিমি ক্লিদারোকে দিয়েই আরম্ভ করা যাক। ওর জন্ম প্রাগে। বয়স চুয়ান্নর কাছাকাছি। জাতে জার্মান। পেশা সার্জেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে দেশত্যাগ করে। বিভিন্ন দেশে

প্র্যাকটিস্ করার পর বছর তিনেক আগে সে ফ্রান্সে নাগরিকত্ব নিয়েছে। সেই থেকে ফ্রান্সেই আছে। শোনা যায় খুবই দক্ষ সার্জেন জিমি ক্লিদারো। এখন সে সেমি-রিটায়ার্ড। বেগ সিটিতেই থাকে। চিকিৎসক হিসেবে কখনও কখনও দুই একজন বিশেষ ব্যক্তিকে দেখে। তবে সেটা নেহাতই ব্যক্তিগত খাতিরে। জিমি ক্লিদারো যাদের দেখে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন প্রফেসার আর্থার ব্র্যান্ড—প্যাট্রিসিয়ার বাবা। মাস ছয়েক আগে প্রফেসরের স্ট্রোক হবার পর থেকেই জিমি ক্লিদারো প্রাইভেট চিকিৎসা করছে তাঁর। তবে বেশির ভাগ সময়ই সে মাছ ধরে কাটায়। মাছ ধরাটা ওর নেশা।'

চট করে রানা আর একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিল এদিক ওদিক। নাহ্, কেউ নেই আধ মাইলের মধ্যে।

'এবার আসা যাক প্রফেসার আর্থার ব্র্যান্ডের কথায়। সবাই জানে এটমিক সাবমেরিন উদ্ভাবনে ওঁর অবদানের কথা। উনি যে হিটলারের উপদেষ্টা ছিলেন পানির নিচের সব ব্যাপারে, সে কথা ইচ্ছে করেই চেপে দেয়া হয়েছিল যুদ্ধের পর ওঁর ব্রেনটা নিজেদের কাজে লাগাবার জন্যে। দুইজন মানুষ চালিত সাবমেরিন "স্নরকেল" ওঁরই আবিষ্কার। আর ইংলিশ চ্যানেলের নিচ দিয়ে টানেল করে ইংল্যান্ড আক্রমণ করার প্ল্যানও বেরিয়েছিল ওঁর মাথা থেকেই। তবে হিটলারের মত লোকও ওই প্ল্যানটাকে একটু বাড়াবাড়ি মনে করায় ওটা আর বেশি দূর এগোয়নি। যুদ্ধের পরে নিউরেমবার্গ ট্রায়েলে নির্দোষ বলে ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওঁকে ফ্রান্সে নিয়ে আসা হয়। বিশেষ যত্নের সঙ্গে ওঁর অতীতকে অনেকটা ধামা চাপা দেওয়া হয়। জনসাধারণের কাছে ওঁকে একজন সৎ নাৎসী-বিরোধী জার্মান বলে তুলে ধরা হয়। ওঁর নিজস্ব মতবাদ যে ঠিক কি তা জানা সম্ভব হয়নি। কারণ প্রফেসার ব্র্যান্ড খুবই চাপা প্রকৃতির লোক। অনেকদিন ওঁর ওপর নজর রেখে এটুকু পরিষ্কার বোঝা গেছে যে উনি একেবারেই রাজনৈতিক মতবাদহীন মানুষ। যত প্রজেক্ট আছে তার মধ্যে পানির তলার প্রজেক্টগুলোর ব্যাপারেই উনি উৎসাহী। আর পরিশ্রমও করেন আপ্রাণ। এই কারণেই উনি বেগ সিটিতে বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রিটায়ার করার পর—অ্যাকোয়াসিটির কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারবেন বলে। মাহমুদ বেগ একটা মোটামুটি ভাল টাকা দেয় প্রফেসার ব্র্যান্ডের খরচা চালানোর জন্যে। সেই সঙ্গে বেগ সিটিতে বিনা ভাড়াতেই থাকার ব্যবস্থাও হয়েছে। বিনিময়ে উনি অ্যাকোয়াসিটির কাজে সাহায্য করছেন।

'মাহমুদ বেগ সম্বন্ধে বলতে গেলেই প্রথম যে কথাটা মনে পড়ে সেটা হচ্ছে 'টাকা'। হ্যাঁ টাকা আছে লোকটার। সারা জীবন সে কেবল টাকা রোজগার করেছে। যা কিছুতে ও হাত দিয়েছে তাতেই সোনা ফলিয়েছে। টেক্সাসের কয়েকটা তেলের খনির মালিক মাহমুদ বেগ। রোডেশিয়ান পার বেল্ট-এ ওর পঁচিশ পারসেন্ট শেয়ার আছে। সাউথ আফ্রিকার ডায়মন্ড মাইনে ওর শেয়ার আছে চল্লিশ পারসেন্ট। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কবির চৌধুরী সাউথ আফ্রিকা থেকে ডায়মন্ড স্মাগলিং এর সঙ্গে জড়িত ছিল।

সম্ভবত ওটা মাহমুদ বেগের অন্যান্য শেয়ার-হোল্ডারদের ঠকিয়ে কিছু বাড়তি টাকা বাঁচিয়ে নেওয়ার একটা ফিকির। যাক সে কথা। আসল কথা থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম আমি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—মাহমুদ বেগ জাতে ইহুদি—ইসরাইলে জন্ম—বিয়ে করেনি এখনও। তবে না করার কারণ নারীতে অনাসক্তি নয়। বরং মাত্রাধিক আসক্তি বলা যেতে পারে। সিসিতে তার বিরাট ভিলায় সিনেমা স্টার, শো গার্ল আর মডেল মিলিয়ে ছোট-খাট একটা হেরেমই ছিল। অ্যাকোয়াসিটি বানাতে চাওয়ার কারণ হিসেবে মাহমুদ বেগ ফ্রেঞ্চ গভমেন্টকে জানিয়েছিল যে সমুদ্রের নিচে তার যে তেলের খনি আছে সেটাই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তার বিশ্বাস যে সেরকম ভাবে করতে পারলে পানির তলায় একটা ছোটখাট শহর গড়ে বসবাস করা সম্ভব। তবে সবজান্তা মহল থেকে শোনা যায় যে সে নাকি তার বর্তমান প্রেয়সীর জন্যেই বানাচ্ছে অ্যাকোয়াসিটি। সারা জেন হবে অ্যাকোয়াসিটির সেরা আকর্ষণ। পানির তলায় ব্যালে নৃত্য পরিবেশন করবে সারা জেন।

'আমাদের অনুসন্ধানে অ্যাকোয়াসিটির ব্যাপারে সন্দেহজনক কিছুই ধরা পড়েনি। বেগ করপোরেশনকে তিরিশ কোটি ফ্র্যাঙ্ক-এর ডেভেলপমেন্ট পারমিট দেওয়া হয়েছে। তিন বৎসরের মধ্যে ওদের কাজ সমাপ্ত করার কথা। প্রোগ্রেস কমিশনের সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ হলে তিরিশ বৎসরের জন্যে অপারেটিং পারমিট দেওয়া হবে। কয়েকটা বড় ফার্ম অ্যালুমিনিয়াম, গ্লাস, স্পেশাল টিউব ইত্যাদি ফ্রী সাপ্লাই দিচ্ছে প্রচারের লোভে।

'ট্রিসা ব্যান্ড তার বাবার সঙ্গেই এদেশে আসে, এবং প্রফেসর ব্যান্ডের সাথে তাকেও স্বভাবতঃই এদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। বাবার মেধাটা সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। এই বয়সেই ট্রিসা তার নিজস্ব বিষয়ের অর্থাৎ ইলেকট্রোনিক সারকিট ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে। হ্যাফনিয়াম আর ট্যানটালাম-এর সংমিশ্রণে ব্যান্ডিনিয়াম আবিষ্কার করেছে সে। চারহাজার সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপ সহ্য করতে পারে ব্যান্ডিনিয়াম। প্যাট্রিসিয়া ব্যান্ডের সম্মানার্থে ওটার নামকরণ করা হয়েছে ব্যান্ডিনিয়াম।'

হালকা ভাবে শিস দিয়ে উঠল রানা।

'কি হলো?' প্রশ্ন করল সোহানা

'ট্রিসার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার। কিন্তু সেই ট্রিসার কোন মিল খুঁজে পাচ্ছি না!'

'বিছানায় সম্পূর্ণ অন্যরকম—এই তো বলতে চাও? সেটা কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই নয়।'

আবার শোনা গেল ফিলিপ কার্টারেটের গলা।

'সোহানার জন্যে একটা চাকরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে লি-বিউসে প্রজেক্টে। ভিতরে থেকে কাজ করবে সোহানা। বহু কষ্টে অনুমতি আদায় করেছি। যাই হোক, ওর পক্ষে সবার ওপর চোখ রাখা আর খবরাখবর নেওয়া মোটেই কঠিন হবে না।

'তোমার জন্যেই প্যারিস থেকে ইন্সপেকশনে আসা সিনিয়র সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে লি-বিউসে প্রজেক্টে ঢুকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুনেছি ওখানকার সিকিউরিটি ব্যবস্থা এতই কড়া যে কোন পোকামাকড়ও কোন ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়া একেবারেই অসম্ভব। তোমাদের কবির চৌধুরী অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করেছে দেখলাম। তাই তুমি একবার সিকিউরিটি ব্যবস্থাটা ভাল করে চেক করে দেখলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

'সব চীফ অভ স্টাফের সই করা অনুমতিপত্র আর আনুষঙ্গিক সব কিছু আমি পাঠিয়ে দেব ডুক্লেম ব্যুরোর নার্সিং হোমে। তুমি আগামীকাল সকালে ওখানে যখন ফাইনাল চেক আপের জন্যে যাবে তখন ওখান থেকে সংগ্রহ করে নেবে।

'লি-বিউসে প্রজেক্ট ইন্সপেক্ট করে বের হওয়ার পর দুজন লোক একটা কালো মার্সিডিস নিয়ে তোমার গাড়িকে ফলো করবে। তুমি সামনে পেট্রোল পাম্পে গিয়ে টয়লেটে তোমার কাপড়চোপড়, মুখোশ সব খুলে ফেলবে। মার্সিডিসের একজনও এসে ঢুকবে টয়লেটে। তোমার জামাকাপড়, মুখোশ ওকে দিয়ে ওরগুলো পরে নেবে তুমি। ও তোমার গাড়ি নিয়ে চলে যাবে। কালো গাড়িটা তোমাকে নিয়ে যাবে হায়ার্সে। সেখানে তোমার জন্যে একটা কেবিন ক্রুজার রি-মডেল করা হচ্ছে। কোটিপতি রবার্ট ক্রফোর্ডের পরিচয়ে তুমি তোমার অনুসন্ধানের কাজ চালাবে। রবার্ট ক্রফোর্ডের হবি হচ্ছে ফিশিং এবং স্কিন ডাইভিং। তোমার নতুন পরিচয়ের সব কাগজপত্রই তুমি রেডি পাবে ওখানে গুডলাক, রানা।'

সেকেন্ড পাঁচেক চুপচাপ। তারপর খুট শব্দ হয়ে থেমে গেল টেপ। আবার টপ টোয়েন্টি চালু করে দিয়ে মুচকি হাসল রানা। এইবার নামতে হবে ওকে কাজে।

মুখটা শুকিয়ে গেছে সোহানার। সমাপ্তি ঘটতে চলেছে স্বপ্নের। এইবার ছাড়াছাড়ি।

'লি-বিউসে না গেলেই নয়? ওই গবেষণার সঙ্গে কবির চৌধুরীর কি সম্পর্ক?'

'কিছু একটা সম্পর্ক থাকতেও পারে। ট্রিসার মাধ্যমে। তোমার কাজ সেটা খুঁজে বের করা।'

'আর তোমার কাজ কবির চৌধুরীর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে নামা?'

'বুড়ো প্ল্যান প্রোগ্রাম কি ঠিক করেছে জানা গেল না টেপ থেকে। দেখা যাক, আগে কাজে তো নামি। তারপর দেখা যাবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।'

'আমার কেন জানি ভয় করছে, রানা। অমঙ্গলের চিন্তা আসতে চাইছে মনের মধ্যে।'

'তাড়িয়ে দাও।'

'যেতে চাইছে না।'

'এসো, আমি দূর করে দিচ্ছি।'
এক হ্যাঁচকা টানে রানার বুকের ওপর চলে এল সোহানা।
সাঁঝ হয়ে গেছে।
কেউ দেখতে পাচ্ছে না ওদের।

ছয়

'তিন নম্বর বোতামটা টিপলে সামনের ডেকটা একটু পেছন দিকে সরে যাবে আর...'

চারটে ·৫০ ক্যালিবারের ব্রাউনিং মেশিন গান দেখা দিল। নিঃশব্দে ডেকের ওপর বেরিয়ে এসেছে নলগুলো।

ফ্র্যাঙ্ক ডওসন গর্বের হাসি হাসল। সত্যিই অবাক হয়েছে রানা। রিমডেলিং বলতে যে ফিলিপ কার্টারেট এতটা বুঝিয়েছিলেন ধারণা করতে পারেনি রানা। চল্লিশ ফুট ডিলাক্স ক্রুজারের কন্ট্রোল ককপিটে দাঁড়িয়ে ফ্র্যাঙ্ক ডওসনের কাছ থেকে সব বুঝে নিচ্ছে সে।

'এগুলো একটা ইউনিট হিসেবে সব একসঙ্গেও চালানো যায়—কিংবা আলাদা আলাদাও চালানো যায়। অটোমেটিক অথবা হাতে চালানোর ব্যবস্থাও আছে। এই বোতামটা টিপলেই ব্রাউনিংগুলো কথা বলে উঠবে।' পাশের বোতামটা ছুঁয়ে দেখাল ফ্র্যাঙ্ক ডওসন। 'এক লাখ গুলি ফিট করা আছে, রেডি অবস্থায়। তবে আপনার কাছে যে চাবিটা থাকবে সেটা দিয়ে এই সুইচটা অন না করলে এত সব গ্যাজেটের কিছুই কাজ করবে না। সুতরাং আপনার অনুপস্থিতিতে কেউ যদি এইসব বোতাম টিপেও দেয় ক্ষতির কিছু নেই। আর তারা কেউ অস্বাভাবিক কিছু সন্দেহ করবে না, কারণ ডিলাক্স ক্রুজারে হাজারো রকম বোতাম থাকেই—আর তার মধ্যে কয়েকটা বোতাম নষ্ট থাকতেই পারে।'

রানাকে ইঞ্জিনের কাছে নিয়ে গেল ফ্র্যাঙ্ক। 'গুপ্ত এক্সট্রাগুলো ছাড়াও কিছু দামী এক্সট্রা রয়েছে যেগুলো লুকোবার দরকার পড়ে না। যেমন ডেকা নেভিগেটার আর ইকো-সাউন্ডার। এগুলো খুব কাজে আসবে অগভীর পানিতে চলার সময়ে।' রেডিও ট্র্যান্সমিটার সেটটার সামনে একটু থেমে একটা ছোট গর্ত দেখিয়ে বলল, 'এইখানে চাবিটা লাগালে অস্কার জনসন সেট চালু হয়ে যাবে। সরাসরি ডুক্রেম ব্যুরোর হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।'

একটা হ্যাচ খুলে দেখাল ফ্র্যাঙ্ক। টুইন ক্রাইসলার ১৭৭ এস ইঞ্জিন দেখা যাচ্ছে। চল্লিশ ফুট ক্রুজারের জন্যে এটাই স্ট্যান্ডার্ড। কিন্তু একটু নজর করে দেখলে দেখা যাবে এরই নিচে রয়েছে একটা ওয়েস্টিংহাউস জে ৪৬ ডাবলিউ

ই-৮বি টারবো জেট। পাঁচহাজার হর্সপাওয়ার চাপ সৃষ্টি করতে পারে ওই ইঞ্জিন—অর্থাৎ প্রায় ১৩৫ মাইল বেগে ছুটবে এই ক্রুজার! আসুন, ওটা চালু করার বোতামটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে কনট্রোল ককপিটে।' আবার ফিরে এল ওরা ককপিটে।

'ওটা চালু করার আগে এই বোতামটা টিপে নিতে হবে মনে করে। নইলে ১৩৫ মাইল বেগে নির্ঘাত ডিগবাজি খেয়ে উল্টে যাবে ক্রুজার। এই বোতাম টিপলে ক্রুজার পানির ওপরে উঠে যাবে। চারটে ফয়েলের ওপর থাকবে ক্রুজার আর সেই সঙ্গে স্টেবিলাইজার ফিন্‌গুলোর কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে।'

'চমৎকার ফ্র্যাঙ্ক,—ওয়েল ডান।' সত্যিই চমৎকৃত হয়েছে রানা। এত কম সময়ে এত কিছু করা চাট্টিখানি কথা নয়।

'আমার কাজে আপনি খুশি হয়েছেন জেনে খুব আনন্দিত বোধ করছি। খুব খাটুনি গেছে আমার—কিন্তু খাটুনিটা সার্থক হয়েছে। আমার ফাইনাল টাচের কথা এখনও আপনাকে জানানো হয়নি কিন্তু। কেউ ধাওয়া করলে তাকে নিরুৎসাহ করার জন্যে দুটো ৪০ মিলিমিটার বোফার ফিট করা হয়েছে ক্রুজারের পিছন দিকে। পানির দেড় হাত ওপর দিয়ে গোলাগুলো যাবে এই বোতাম টিপলে। সেই সঙ্গে এই বোতামটা টিপলে ছোট ছোট অনেকগুলো ম্যাগনেশিয়াম চার্জ ফিশিং চেয়ারের নিচে থেকে ছুটে গিয়ে পড়বে পানিতে। শত্রুপক্ষের বোটের সঙ্গে ধাক্কা খেলেই সেগুলো ফেটে গিয়ে ফাঁৎ করে জ্বলে উঠবে। সেই সঙ্গে বিস্ফোরণ।'

ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে 'মোবাইল গার্ল' টুলনের দিকে। হায়ার্স থেকে টুলনের পথে হাতটাকে বেশ পাকিয়ে নিয়েছে রানা। চাবি ঘুরিয়ে স্টেবিলাইজার বোতাম টিপে ফুল স্পীডে চালিয়েও দেখেছে একবার—১৩৩ মাইল স্পীড ওঠে ফুল থ্রটলে। একেবারে হাওয়ায় উড়ছে মনে হয়।

কেপ সিসি দেখা যাচ্ছে। ওটা ছাড়িয়ে কয়েক মাইল এগোলেই বেগ সিটি। দক্ষিণ-পশ্চিম পাড় ঘেঁষে অ্যাকোয়াসিটি তৈরি করছে মাহমুদ বেগ। সেদিন ক্যাপ্টেন সভার্স কিছুতেই ওকে এদিকে নিয়ে আসতে রাজি হয়নি। একটু ঘুরে দেখে যাওয়াই স্থির করল সে। বাঁ দিকে ঘুরিয়ে দিল স্টিয়ারিং হুইল। তীর থেকে আড়াই মাইল দূর দিয়ে তীরের সাথে সমান্তরাল ভাবে ১৭৫ ডিগ্রী কোর্সে চলল রানা। দূরবীনটা হাতে নিয়ে তীরের দিকে ফোকাস করল। মাহমুদ বেগের বিরাট ভিলাটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এতদূর থেকে ঠাহর করা যাচ্ছে না ভালমত। ভাল করে দেখতে হলে আর একটু কাছে যাওয়া দরকার। কোর্স বদলে রানা ১৬৫ ডিগ্রীতে নিল পাড়ের আর একটু কাছে যাবার জন্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রেডিও কড় কড় শব্দ করে উঠল। একটা ধাতব কণ্ঠে শোনা গেল, 'পি কে—তিন দুই নয় তিন··· পি কে··· তিন দুই নয় তিন···তুমি নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়ছ—শুনতে পাচ্ছ? পি কে—৩২৯৩

'মোবাইল গার্ল,' তুমি নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়ছ—কোর্স বদল করে আরও দক্ষিণে নাও।'

এতদূর থেকে নাম আর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পড়তে পারছে অনায়াসে। খুবই শক্তিশালী দূরবীন ব্যবহার করছে ওরা। খুব সতর্কও বটে—কোর্স বদলানোর সঙ্গে সঙ্গেই ধরে ফেলেছে। কোর্স বদলে আবার ১৭৫ ডিগ্রীতে নিয়ে গেল রানা।

রেডিওতে আবার শোনা গেল, 'পি কে—৩২৯৩, নিষিদ্ধ এলাকায় অসাবধানে ঢুকে পড়ার জন্যে, আর রেডিও মেসেজের জবাব না দেয়ার জন্যে ফ্রেঞ্চ শিপার্স ফেডারেশনে তোমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা হবে। ওভার।'

এবারেও রানা কোন জবাব দিল না। রানার মাথায় চিন্তা চলেছে দ্রুত। ওই জায়গায় ঢুকতে হলে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু ওখানে ঢুকতে ওকে হবেই। যেভাবেই হোক।

বড় একটা চক্কর দিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে টুলনে পৌঁছল রানা। সি-ভিউ হোটেলে আগে থেকেই রুম বুক করা হয়েছে রবার্ট ক্রফোর্ডের জন্যে। নোঙর ফেলে জাহাজ বাঁধার দড়িটা ছুঁড়ে দিল রানা জেটি, অ্যাটেন্ডেন্টের দিকে। সি-ভিউ হোটেলের নিজস্ব জেটি এটা। পাঁচ-ছ'টা ইয়ট ভেড়বার জায়গা রয়েছে এখানে।

'আপনি নিশ্চয়ই মঁশিয়ে ক্রফোর্ড? আগেই খবর পেয়েছি আমরা—হায়ার্স থেকে আসছেন তো? আপনার…'

ছোট্ট একটা 'হুঁ' দিয়ে থামিয়ে দিল রানা ওকে। টেলিফোনে রিসেপশনে খবর দেওয়ার আধ মিনিটের মধ্যে দেখা গেল দু'জন হোটেলের ইউনিফর্ম পরা লোক ছুটতে ছুটতে আসছে মালপত্র নামাতে। পেছনে ম্যানেজার স্বয়ং আসছে হন্তদন্ত হয়ে।

বিরাট ধনী হওয়ার অনেক সুবিধা আছে। ক্রফোর্ড হলে তো কথাই নেই। দক্ষিণ ফ্রান্সের নাম করা জাহাজ নির্মাতা-পরিবার এরা। মূলত ব্রিটিশ হলেও এখন এরা ফ্রেঞ্চ হয়ে গেছে পুরোপুরি।

ম্যানেজার এসে নিজে তদারক করে রুম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল রানাকে। হোটেল রেজিস্টারে সই করারও দরকার মনে করল না ম্যানেজার—পাছে অতিথির কষ্ট হয়।

স্নান সেরে টেলিফোনে রুম সার্ভিসে খাবার অর্ডার দিল রানা। সঙ্গে সাপ্তাহিক আর দৈনিক কাগজগুলোও পাঠাতে বলল। খেতে খেতে কাগজের প্রতিটা লাইন পড়েও এডি মরগ্যান, ফ্রান্সেসকো, ক্যাপ্টেন সভার্স বা তার নিজের নিরুদ্দেশ হবার কোন খবর না দেখে অবাক হলো সে। সন্ধ্যার সময়ে বার-ডি রিগাল-এ গেল রানা। হয়তো ট্রিসার সাথে দেখা হবে, এই আশায়। কিন্তু রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন ট্রিসার দেখা পেল না তখন শেষ পর্যন্ত বোরবোনের অর্ডার দিল। বারম্যান ড্রিঙ্কটা ট্রে থেকে টেবিলে

নামিয়ে রাখতে রানা প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, ক্যাপ্টেন সন্ডার্সকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো? শুনেছি সে নাকি ফিশিং-এর ব্যাপারে এই অঞ্চলের সবচেয়ে ভাল গাইড?'

রানার চোখে চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বারম্যান জবাব দিল, 'আপনার বুঝি ফিশিং-এর খুব শখ? কিন্তু ওই নামের কোন ক্যাপ্টেনের কথা তো শুনিনি কোনদিন, মশিয়ে। আপনাকে কেউ ভুল খবর দিয়েছে।' ডাহা মিথ্যা কথাটা বলে আর একজনের ডাকে চলে গেল বারম্যান।

নিজের হোটেল কামরায় ফিরে এল রানা। গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। কিছুতেই উপায় খুঁজে পাচ্ছে না সে সামনে এগুবার। অনেক চেষ্টায় যেটুকু জানতে পেরেছিল সেটা আর এখন কাজে লাগছে না। ক্যাপ্টেন সন্ডার্স আর ফ্রান্সেসকো মৃত—হয়তো এডি মরগ্যানের অবস্থাও তাই। ট্রিসার দেখা নেই—তবে ট্রিসার সাথে দেখা হলেও ওর কাছ থেকে কতটুকু তথ্য বের করা যাবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে রানার। নতুন কোন লাইনে অনুসন্ধান চালাতে হবে। ঠিক করল পরদিন প্রফেসার ব্যান্ডের সাথে দেখা করতে হবে। মনে মনে একটা খসড়া প্ল্যান তৈরি করে ঘুমিয়ে পড়ল সে রবার্ট ক্রফোর্ডের জন্য পাতা পরিপাটি বিছানায়।

সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেই 'মোবাইল গার্ল'-এ গিয়ে উঠল রানা। পিয়ার অ্যাটেন্ডেন্টকে বলল সারা দিনের জন্যে ফিশিং-এ যাচ্ছে সে। ক্রুজারে টিনের খাবার যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও হোটেল থেকে টাটকা খাবার আনিয়ে ফ্রিজ ভরিয়ে নিল। যদিও অনেক উন্নতি সাধন করেছে ফুড রিসার্চ বৈজ্ঞানিকরা, তবু ঠিক সেই তৃপ্তিটা পায় না রানা টিনের খাবারে।

ক্রুজারটা সমুদ্রের ভিতর মাইল দু'য়েক নিয়ে গিয়ে অসকার জনসন ট্র্যান্সমিটারটা চালু করল সে স্পেশাল চাবি ঘুরিয়ে। পিটার গিলের সাথে কথা বলল পাঁচ মিনিট ধরে। ঠিক হলো রানার কথা মত সব জিনিস জোগাড় করে ঠিক বিকেল চারটের সময়ে 'সি-ভিউ' পিয়ার থেকে দুই মাইল পুবে নির্জন এক বীচে দেখা করবে পিটার গিল ওর সঙ্গে। সারাটা দিন দেখা গেল রবার্ট ক্রফোর্ডকে সমুদ্রের নানান জায়গায় নোঙর ফেলে মাছ ধরছে। কখনও গভীর জলে, কখনও একেবারে তীরের কাছে। ইকো সাউন্ডার ব্যবহার করে নির্ভয়ে যতদূর সম্ভব পাড়ের কাছে চলে আসতে পারছে সে। ঠিক বিকেল চারটের সময়ে সাঁতরে গিয়ে উঠল রানা পাড়ে। ক্রুজার থেকেই লক্ষ্য করছে সে পিটার গিলের আগমন। একটা ওয়াটার-প্রুফ পোঁটলা রানাকে এগিয়ে দিয়ে পিটার বলল, 'এর মধ্যে যা যা চেয়েছিলেন সবই পাবেন। বছর দশেক আগে সমুদ্র বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটে ডক্টর নিমেরী ফ্লেচার আর প্রফেসার ব্যান্ড একসঙ্গে কাজ করেন। ওঁরা দু'জন মিলে মিনি-সাবমেরিনের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। প্রায় তিন বছর একসঙ্গে কাজ করেন দুই বৈজ্ঞানিক। ডক্টর ফ্লেচারের একসেট ব্যবহার করা কাপড় আনানো হয়েছে ভ্যালেন্স থেকে। রবারের মুখোশ, গ্লাভস

ইত্যাদিও আছে ওই পোঁটলার মধ্যে।'

'ধন্যবাদ। এখন সময় নেই। পরে কথা হবে।' রওনা দিল রানা আবার ক্রুজারের দিকে। একটু পরেই বেগ সিটির দিকে চলল কেবিন ক্রুজার। পোঁটলাটা খুলে একবার চেক করে নিল রানা ভিতরের জিনিসগুলো। তারপর বেগ সিটির ম্যাপটা মুখস্থ করে ফেলল সে পাঁচ মিনিটে। তীর থেকে সিকি মাইল দূরে নোঙর ফেলল রানা। দূরবীন দিয়ে আশেপাশে ভাল করে দেখে নিল। এদিকটা জনমানব শূন্য। ডান দিকে একটা পরিত্যক্ত বোট হাউস দেখা যাচ্ছে। আর সময় নষ্ট না করে সমুদ্রের দিক দিয়ে একটা দড়ি ঝুলিয়ে নেমে পড়ল সে পানিতে। তীরের দিক দিয়ে নামতে গেলে কারও চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। পোঁটলা হাতে বোট হাউসে গিয়ে উঠল রানা পাঁচমিনিট পরে বোট হাউস থেকে বেরিয়ে এল ডক্টর নিমেরী ফ্লেচার। দেখেই বোঝা যায় নিজের প্রতি কোন খেয়াল নেই ভদ্রলোকের। চোখে রিমলেস চশমা—পরনে সেকেলে ঢোলা স্যুট। বয়স পঞ্চাশের ওপরে হবে।

এতসব কাণ্ড না করে সোজাসুজি একটা গাড়ি নিয়ে হাজির হতে পারত সে প্রফেসার ব্র্যান্ডের সাথে দেখা করবার জন্যে। কিন্তু রানার ধারণা নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে প্রফেসারকে। হঠাৎ গিয়ে হাজির হতে পারলেই কার্যসিদ্ধ হতে পারে। গাড়িতে গেলে বেগ সিটিতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সাবধান হয়ে যাবে ওরা। দেখা করা আর সম্ভব হবে না কোন মতেই। কাউকে জিজ্ঞেস না করেই যেন প্রফেসারের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে সেজন্যে আগেই সে ভাল করে ম্যাপটা দেখে নিয়েছে। দ্রুত পা চালাল। ভাগ্য ভাল যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ম্যাপটা দেখেছিল রানা, নইলে সারি সারি একই রকম বাড়ি আর একই রকম রাস্তার মধ্যে থেকে ঠিক বাড়িটা চিনে বের করা সোজা কাজ হত না।

হাঁটতে হাঁটতেই লক্ষ করল রানা যে এই এলাকার সব বাসিন্দাই হয় বুড়ো নয়তো বুড়ি। একটা ছোট বাচ্চাও নজরে পড়ল না ওর। বুড়ো-বুড়িরা কেউ বাগানে পানি দিচ্ছে, কেউ বা রকিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে বিকেলের রোদ পোহাচ্ছে।

দরজার বেল বাজাতেই ভোঁতা চেহারার একটা লোক দরজা খুলল। ডক্টর নিমেরী ফ্লেচার লেখা কার্ডটা হাতে নিয়ে একটু পরীক্ষা করে দেখে আবার সে রানার হাতে সেটা ফিরিয়ে দিয়েই দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। বেগতিক দেখে রানা চট করে পা বাধিয়ে দরজা বন্ধ করার চেষ্টা বিফল করে দিল। 'অনেক পুরানো বন্ধু আমরা…' বলতে বলতে পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ভোঁতা চেহারার লোকটা সামলে উঠবার আগেই হল পেরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল রানা। 'এই যে প্রফেসার ব্র্যান্ড—আপনিই বলে দিন ওকে আমরা পুরানো বন্ধু কি না?' হুইল চেয়ারে বসা পাতলা ছোট্ট লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বলল রানা।

ঠোঁট দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল প্রফেসার ব্র্যান্ডের—ক্ষীণ কণ্ঠে শোনা গেল, 'হ্যাঁ, পুরানো বন্ধু। কতদিন পরে দেখা—কেমন আছ তুমি—ইন্সটিটিউটের খবর কি? আমাদের সেই মিনিসাবমেরিন কেমন চলছে…' উত্তেজিত হয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন একসাথে করে বসলেন প্রফেসার ব্র্যান্ড। আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, দরজার দিকে চেয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন।

দরজার দিকে চেয়ে দেখল রানা ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে ডক্টর জিমি ক্লিদারো।

'এভাবে জোর করে ঘরে ঢুকে পড়ার কি মানে?' চোখ গরম করে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল জিমি।

রানা কি যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিয়ে জিমি ক্লিদারো বলল, 'আপনি কি জানেন না প্রফেসার ব্র্যান্ড খুবই অসুস্থ? এই কিছুদিন আগেই সিরিয়াস হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল?'

'আমার স্ট্রোক হয়েছিল। বছর খানেক আগে একবার, তারপর কয়েক মাস আগে আবার।' মুখস্থ বলার মত আউড়ে গেলেন প্রফেসার।

অবাক হয়ে প্রফেসারের দিকে চেয়ে রইল রানা কয়েক সেকেন্ড। বলার ভঙ্গিতে কেমন যেন খটকা লাগল রানার। বলল, 'এসব কথা আমার জানা ছিল না। আমি এসেছিলাম একটা বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্যে। ওঁর মতামত জানা ছাড়া…'

'আলোচনা চিঠির মাধ্যমে সারলেই ভাল হত না? এখানে আসার কি দরকার ছিল? প্রফেসারের জন্যে সব রকম উত্তেজনাই খুব খারাপ। ওঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে বলছি, আপনি এখন আসুন।' কথা শেষ করেই জিমি আবার জিজ্ঞেস করল, 'আপনার গাড়ি কি বাইরে?'

'না, আমি ট্যাক্সিতে এসেছি।' জবাব দিল রানা।

সেই ভোঁতা চেহারার লোকটাও এসে দাঁড়িয়েছে ভিতরে। রানার জবাব শুনেই কনুই দিয়ে ছোট্ট একটা গুঁতো মারল সে জিমিকে।

'কই কোন গাড়ির শব্দ তো পাইনি আমি?' প্রশ্ন করল জিমি।

'এখানকার সব বাড়ি একই রকম। ভুল করে আমি সি ব্লকে নেমে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওখান থেকে এই পর্যন্ত হেঁটেই এসেছি।'

ভোঁতা চেহারার লোকটা এবার রানার পাশ দিয়ে গিয়ে প্রফেসারের হুইল চেয়ার ঠেলে ভিতরে অন্য ঘরে নিয়ে গেল। প্রফেসার কোন প্রতিবাদ করলেন না।

'দাঁড়াও, অন্তত প্রফেসারের কাছ থেকে বিদায় নিতে দাও আমায়?'

ভদ্র অথচ শক্ত হাতে বাহু চেপে ধরে দরজার দিকে নিয়ে গেল জিমি রানাকে, 'কোন লাভ নেই। দেখলেন তো—এরই মধ্যে ভুলে গেছেন উনি আপনাকে। সব সময়ে এখন আর উনি প্রকৃতিস্থ থাকেন না।' বলতে বলতে দরজা খুলে রানাকে প্রায় একরকম ধাক্কা দিয়েই বের করে দরজা বন্ধ করে

দিল জিমি।

চ্যাঁ এঁ্যা এঁ্যা শব্দ তুলে থামল গাড়িটা। বিকিনি পরা ট্রিসা নেমে এল ড্রাইভিং সীট থেকে।

'ডক্টর ফ্লেচার না? অনেক দিন পরে দেখা। কি ব্যাপার?'

'এই তো। এসেছিলাম আপনার বাবার সঙ্গে একটা জরুরী সমস্যা নিয়ে আলাপ করতে। আপনার খবর কি?'

আলাপ জমাবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু সে সবের ধার দিয়েই গেল না ট্রিসা। সামান্য একটু মামুলি আলাপ করেই বলল, 'মাপ করবেন, স্নান সেরে এলাম—এই ভিজে কাপড় না ছাড়লে শেষে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।' বলেই পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। রানা আশা করেছিল ট্রিসা হয়তো তাকে ভিতরে নিয়ে যাবে, কিন্তু সে আশা আশাই রয়ে গেল। ফেরার জন্যে হাঁটতে আরম্ভ করল সে। ভাবতে ভাবতে চলেছে রানা—কোথায় যেন কি একটা গোলমাল চোখে পড়েছে ওর। চোখে পড়েছে, কিন্তু পরিষ্কার ভাবে ধরতে পারেনি সে এখনও ব্যাপারটা। সূক্ষ্ম কিছু। এতই আবছা যে স্পষ্ট করে তোলা যাচ্ছে না সহজে। আসছে, আসছে—আসছে না। ছোটখাট জিনিসও সহজে রানার নজর এড়ায় না বলে অনেকবার অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে সে। কিন্তু আজ এরকম হচ্ছে কেন? ট্রিসার ব্যবহৃত সুগন্ধি, চুলের স্টাইল বা কথা বলার ভঙ্গি, কোন্‌টা একটু অদ্ভুত ঠেকল রানার কাছে?

দুটো ব্লক পার হয়ে এসেছে রানা। ঘাড়ের চুলের কাছে কেমন একটা শিরশিরে অনুভূতি হচ্ছে। বিপদের গন্ধ পাচ্ছে সে। সারা বেগ সিটির আবহাওয়াটাই হঠাৎ পাল্টে গিয়ে কেমন যেন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে মনে হচ্ছে।

চলার গতি সমান রেখে যেদিকে চলছিল সেইদিকেই চলতে থাকল রানা। আপন ভোলা বৈজ্ঞানিকের চলন যেমন হয় ঠিক তেমনি ভাবে। কিন্তু প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সতর্ক হয়ে রইল বিপদের লক্ষণ দেখলেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে।

তৃতীয় ব্লকটা পার হয়েই চলার গতি বাড়াল রানা। জনা কয়েক বুড়ো লোক একত্র হয়ে গল্প করছে। ওদের পেরিয়ে যেতে যেতে রানা শুনল স্টক মার্কেট সম্বন্ধে আলোচনা করছে ওরা। আর একটু এগিয়ে হঠাৎ পেছন ফিরে চাইল সে। দেখল ওদের মধ্যে দু'জন গল্প ছেড়ে রানার পিছু পিছু আসছে রাস্তার ওধারের ফুটপাথ দিয়ে। রানা অবাক হয়ে লক্ষ করল বুড়ো হলেও ওদের চলার ভঙ্গি খুবই দ্রুত—তাতে বয়সের কোন ছাপ নেই। চলার গতি আরও বাড়াল রানা। চোখের কোণে লক্ষ করল চলার গতি বেড়ে গেল ওদেরও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। সামনে আরও কয়েকজন বুড়োকে দেখা যাচ্ছে। দু'জন তিনজনের ছোট ছোট কয়েকটা গ্রুপ। বৈকালিক গল্প গুজব করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এক নজরেই রানা বুঝে নিল, ব্যাটাদের মতলব

ভাল না। একদল থেকে আরেক দলের ব্যবধান পঞ্চাশ গজ মত হবে। দুটো ফুটপাথই কাভার করছে ওরা।

চিন্তা করার আর সময় নেই। ঝেড়ে দৌড় দিল রানা বা দিকের বাড়িটার ড্রাইভ-ওয়ে ধরে। রাস্তায় লোকজনদের চিৎকার আর জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। পিছু ধাওয়া করেছে ওরা। গ্যারেজটার পাশ দিয়ে দেয়াল টপকে ওপাশের বাড়ির বাগানে পড়ল রানা। এক বুড়ি বাগানে গাছের গোড়া খোঁচাচ্ছিল খুপরি দিয়ে। রানাকে হঠাৎ আকাশ থেকে পড়তে দেখে ভয়ে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল। ভয় পেয়েছিস, একবার চিৎকার করে উঠে থেমে যা—তা না, সাইরেনের মত চিৎকার দিয়েই চলল বুড়ি। রানা যে কোথায় আছে জানতে কারও বাকি থাকবে না চিৎকারের ঠেলায়। বুড়ির গলাটা টিপে দেয়ার ইচ্ছে বহুকষ্টে দমন করে দ্রুত দেয়াল টপকাল সে। বাজে সময় নষ্ট করলেই ধরা পড়ে যাবে ও। পর পর চার পাঁচটা দেয়াল টপকাল সে। একটা সরু গলিপথ পাওয়া গেল। গলিপথ ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল রানা। শেষ মাথায় গিয়ে একটা রাস্তা পার হয়ে আরও কয়েকটা দেয়াল টপকাল। কাউকেই চোখে পড়ল না। এভিনিউ থ্রীতে এসে আবার হাঁটা আরম্ভ করল রানা। যারা তাড়া করছিল তাদের অনেক পেছনে ফেলে এসেছে সে। বেগ সিটির প্রায় শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে এখন। আর আধ মাইল যেতে পারলেই বোট-হাউসে পৌঁছানো যাবে।

চলতে চলতে অনেক চিন্তা ভিড় করে আসছে রানার মনে। দিনের আলোয় প্রকাশ্যে এভাবে তাড়া করার সাহস কি করে পেল ওরা? তবে কি বেগ সিটির সবাই ওদেরই লোক? ইশ্, একেবারে বাঘের মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ে আবার বেরিয়ে এসেছে সে। কিন্তু যখন সুযোগ ছিল, প্রফেসার ব্র্যাভের বাড়ির মধ্যেই তো জিমি আর সেই ভোঁতা চেহারার লোকটা আটক করতে পারত তাকে। তবে রাস্তার মধ্যে এভাবে তাড়া করার মানে কি? নিশ্চয়ই প্রফেসার ব্র্যাভের বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নামার পর ওরা তাকে ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ কি? ট্রিসা ডক্টর ফ্লেচারকে চেনে—সেই কি ধরে ফেলল যে রানা ফ্লেচার নয়? প্রফেসার ব্র্যাভের মুখস্থ বলার ভঙ্গিটা ভাল লাগেনি রানার। ব্রেইন-ওয়াশ কেস অনেক দেখেছে রানা। তোতা পাখির মত যা শেখানো হয় তাই মুখস্থ বলে যায় ওরা। প্রফেসার ব্র্যাভকে কি ব্রেইন-ওয়াশ করা হয়েছে?

একটা গাড়ির শব্দে পিছন ফিরে চাইল রানা। ডান হাত চলে এল তার প্রিয় ওয়ালথার পি. পি. কে-র বাঁটে। গাড়িটা থামল এসে রানার সামনে। চার্চের ক্লার্জিম্যানের পোশাক পরা এক ভদ্রলোক আকর্ণ হেসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনিই তো প্রফেসার ব্র্যাভের বন্ধু—তাই না? আমি বেগ সিটি চ্যাপেলের ক্লার্জিম্যান রেভারেন্ড লিগুরী।' কোন জবাব না দিয়ে সতর্ক চোখে তাকাল রানা লোকটার ওপর।

'দেখলাম আপনি প্রফেসার ব্র্যাভের বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন। সাথে গাড়ি

নেই। আমি টুলন যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম। গাড়ি বের করে আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে এলাম। ভাবলাম আপনাকে পেলে লিফট দেব। আপনিও লিফট পাবেন, আমিও বেশ গল্প করতে করতে যেতে পারব। একা ড্রাইভ করতে আমার মোটেও ভাল লাগে না।' রানার সন্দিগ্ধ চোখের দিকে চেয়েই এতটা ব্যাখ্যা দিল রেভারেন্ড লিগুরী।

রেভারেন্ডের একটা কথাও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হলো না রানার। প্রফেসার ব্র্যান্ডের বাড়ি থেকে তাকে যদি বের হতে দেখেও থাকে রেভারেন্ড লিগুরী, ডক্টর ফ্লেচারের বেশধারী রানা যে প্রফেসার ব্র্যান্ডের বন্ধুই, এ বিষয়ে নিশ্চিত হলো কি করে সে? আন্দাজে? আন্দাজে এত সঠিক ধারণা করে ফেলাটা ভাল লাগল না ওর কাছে। এটা একটা ফাঁদও হতে পারে।

'কোন অসুবিধার মধ্যে পড়েননি তো আপনি?'

আবার বলল রেভারেন্ড। চোখে মুখে তার আন্তরিক উৎকণ্ঠার ছাপ। 'আমি দেখলাম প্রফেসারের বাড়ির আশেপাশে কিছু লোক ছুটোছুটি করছে। প্রফেসার ব্র্যান্ড আবার অসুস্থ হয়ে পড়েননি তো? গত স্ট্রোকের পরে আমি দেখতে গিয়েছিলাম—কিন্তু ওই অদ্ভুত স্বভাবের ডাক্তারটা দেখা করতে না দিয়েই আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।'

রেভারেন্ডের মাথার ওপরকার রিয়ার ভিউ-মিররে চোখ পড়তেই পেছন ফিরে চাইল রানা। দূরে রাস্তার মাথায় দেখা যাচ্ছে কালো চশমা আর ফুল-পাতা ডিজাইনের শার্ট পরা দু'জন লোক ছুটে আসছে। চিনতে দেরি হলো না রানার—এরা দু'জনই পিছু নিয়েছিল প্রথমে।

'আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি?' আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করল রেভারেন্ড লিগুরী।

কিন্তু ততক্ষণে দৌড়াতে শুরু করে দিয়েছে রানা। কানের পাশ দিয়ে একটা গুলি বেরিয়ে গিয়ে দেয়ালে লাগল। প্রতিপক্ষ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বেশ বোঝা যাচ্ছে। প্রকাশ্যে দিনের আলোয় রাস্তার ওপর গুলি করে রানাকে হত্যা করবার হুকুম দেয়া হয়েছে ওদের। নিমেষে ওয়ালথার পি. পি. কে বেরিয়ে এল ওর হাতে। এঁকে বেঁকে দৌড়াচ্ছে ও এখন মাথা নিচু করে। আরেকটা গুলির শব্দ হলো। এবারের গুলিটা রানার বাঁ পাশে রাস্তার কিছুটা অংশ ছিন্নভিন্ন করে দিল। ঘুরে দাঁড়িয়েই পরপর দু'বার গুলি করল রানা। যারা ধাওয়া করছিল তাদের একজন চিৎকার করে এক পাক ঘুরে পড়ে গেল। দ্বিতীয় গুলিটা লেগেছে কিনা ঠিক বোঝা গেল না। অন্যজন লাফ দিয়ে একটা দেয়ালের পিছনে আশ্রয় নিল। এই সুযোগে আবার দৌড় দিল রানা।

বেগ সিটি সীমানার বাইরে চলে এসেছে সে। আর দুশো গজ যেতে পারলেই সমুদ্রের ধারে পৌঁছে যাবে। অসংখ্য বড় বড় পাথর ছিটিয়ে রয়েছে ওখানে। এই কারণেই সাঁতার কাটার জন্যে কেউ আসে না এদিকটায়। দুশো গজ পার হতে পারলেই আর চিন্তা নেই। পাথরগুলোই তখন গুলি ঠেকাবে।

পিছন ফিরে একবার দেখে নিল রানা—আরও দু'জন যোগ হয়েছে। মোট তিনজন এখন আসছে ওর পেছনে। হঠাৎ সামনের মোটা লোকটা পাতলা হয়ে গেল। ভুঁড়িটা চলে এসেছে ওর হাতে। চাদরের মোড়কটা ফেলে দিতেই দেখা গেল ওর হাতে একটা কালো সাব-মেশিনগান! ছুটতে ছুটতেই ডাইভ দিল রানা। দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলে সাব-মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। গুলিবর্ষণ আরম্ভ হলো। কনুই দিয়ে ক্রল করে ডাইনে সরে গেল রানা বালির ঢিবিটার আড়ালে। বালির ঢিবির ওপরই গুলি বর্ষণ হলো কিছুক্ষণ। কেঁপে কেঁপে উঠছে এক একটা গুলির আঘাতে, সেই সঙ্গে বালি আর পাথর ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে রানার মাথার ওপর দিয়ে। গুলি থামতেই মাথাটা একটু উঁচু করে দেখল রানা অনেকদূর এগিয়ে এসেছে ওরা তিনজন। মাঝের লোকটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাঁকা ম্যাগাজিনটা বের করে গুলিভর্তি আরেকটা ম্যাগাজিন ঢোকাচ্ছে সেই জায়গায়। গর্জে উঠল রানার ওয়ালথার। মুহূর্তে বিকৃত হয়ে গেল লোকটার মুখ। হাত থেকে সাব-মেশিনগানটা পড়ে গেল মাটিতে। ওটার ওপরই মুখ থুবড়ে পড়ল সে। গুলি করেই একছুটে প্রথম বড় পাথরটার আড়ালে চলে গেল রানা। বাঁ দিকের লোকটার গুলি এসে লাগল পাথরটার গায়ে। রানার ছেড়ে আসা বালির ঢিবিটার আড়ালে আশ্রয় নেবার জন্যে ছুটেছে লোকটা। চলন্ত টার্গেট। একটু সময় নিয়ে লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টিপল রানা। অব্যর্থ লক্ষ্য। বুক ভেদ করে চলে গেছে গুলিটা। সঙ্গী দু'জনের অবস্থা দেখে তৃতীয় জন আর রানার পেছনে ধাওয়া করা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করল না। ভীত খরগোশের মত লাফানোর ভঙ্গিতে দৌড় দিল উল্টো দিকে। লক্ষ্য স্থির করেছিল রানা কিন্তু হাতটা নামিয়ে নিল আবার। পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীকে হত্যা করবার কোন অর্থ হয় না। একটু আগে ও রানাকে মারার জন্যেই এসেছিল বটে, কিন্তু ওর দৌড়ের বহর দেখে বোঝা যাচ্ছে বর্তমানে সে রকম ইচ্ছে আর ওর নেই।

এগিয়ে গিয়ে দেহ দুটো পরীক্ষা করল রানা। দু'জনই মৃত। ওদের মুখে কোন মুখোশ নেই দেখে একটু অবাক হলো রানা। একটু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেই বুঝল প্লাস্টিক সার্জারির কাজ। দাগ রয়েছে কপালের ওপরে চুলের নিচে ঢাকা। রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে কোঁচকানো হয়েছে ওদের চামড়া। সাব-মেশিনগানটা হাতে নিয়ে দেখল, রাশিয়ান অস্ত্র। কিন্তু অরিজিনাল নয়। সম্ভবত ওটা ইসরাইলী ইমিটেশন। মাহমুদ বেগও তো ইহুদী? ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্ট নিশ্চয়ই এই অস্ত্র সিভিলিয়ান কাউকে রাখার অনুমতি মঞ্জুর করেনি। স্মাগলড্ হয়ে এসেছে এটা।

আপাতত আর কিছুই করবার নেই রানার। বোট হাউসে ফিরতে হবে। দিন দুপুরে তিন তিনটা খুনের সঙ্গে রবার্ট ক্রফোর্ড-এর কোন যোগাযোগ আছে সেটা কারও না জানাই ভাল। বালিতে পায়ের ছাপ দেখে যেন কেউ বুঝতে না পারে রানা কোন্ দিকে গেছে। সেজন্যে বার কয়েক পানির ধার পর্যন্ত গেল

আবার ফিরে এল। সাতবারের মাথায় দেখা গেল যে বালিতে তার পায়ের ছাপ একটার ওপর একটা এমন ভাবে পড়েছে যে সে ক'বার পানির ধারে গেছে আর ক'বার ফিরে এসেছে তা কোন ফুটপ্রিন্ট এক্সপার্টেরও বোঝার সাধ্য নেই! এবারে পানিতে নামল রানা। জুতো জোড়া খুলে হাতে নিয়ে হাঁটু পানিতে হাঁটতে হাঁটতে হাজির হলো সে বোট হাউসের কাছে। খালি পায়ে আলতো ভাবে বালির ওপর দিয়ে হেঁটে ঢুকল বোট হাউসে। সন্ধে হয়ে এসেছে। আশপাশটা ভাল করে দেখে নিয়েছে সে বোট হাউসে ঢুকবার আগেই—কেউ কোথাও নেই। ভিতরে ঢুকে তার ফেলে যাওয়া জিনিস-পত্রগুলো পরীক্ষা করে বুঝল যে তার অনুপস্থিতিতেও কেউ ঢোকেনি সেখানে। ডক্টর নিমেরী ফ্লেচারকে ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে ভরে ফেলল রানা। ওয়ালথার পি. পি. কেও রেখে দিল ওই সঙ্গে ব্যাগের মধ্যে। বাঁ হাতের সঙ্গে বাঁধা পেন্সিলের মত দেখতে একটা খাপে পোরা বিশেষ ভাবে তৈরি স্টিলেটোটা আর ব্যাগে ভরল না রানা। সমুদ্রের এদিকটায় হাঙর বাবাজীদের আনা-গোনা আছে কিনা সঠিক জানা নেই। কিছু একটা অস্ত্র সঙ্গে থাকা ভাল। জিনিসটা ফ্র্যাঙ্ক ডওসনের উপহার। খুব পছন্দ হয়েছে রানার। গোড়াটা সিকি ইঞ্চি মোটা। ধরার সুবিধের জন্যে ছোরার মত বাঁট। ফলাটা সাড়ে সাত ইঞ্চি লম্বা। গোড়ার দিকটা একেবারে গোল। আস্তে আস্তে চোখা হতে হতে শেষ মাথা একেবারে সূচের মত তীক্ষ্ণ। শেষের দিকের অর্ধেকটা অংশ আবার ক্ষুরের মত ধারাল। ছুরির কাজও চলে ওটা দিয়ে। খুবই শক্ত স্পেশাল ইস্পাত দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। চমৎকার জিনিস।

বোট হাউস থেকে বেরিয়েই মানুষের উপস্থিতি টের পেল রানা। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। বিশাল চেহারার লোকটা উঁচু পাথরটা থেকে লাফিয়ে পড়েছে রানার ওপর। নিমেষে দেখে নিল রানা লোকটার পেছনে আরও একজন রয়েছে। দু'জনকেই চিনতে পারল সে। এরা পিছু নিয়েছিল প্রফেসর ব্র্যান্ডের বাড়ি থেকে বেরোবার খানিক পরেই। মাঝে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওরা চিনল কি করে? এখন তো সে রবার্ট ক্রফোর্ড। তবু কি করে চিনল? পড়ে গেল দু'জনেই বালির ওপর। ইস্পাতের টুকরোটা চলে এসেছে রানার হাতে। চিনে যখন ফেলেছে এদের দু'জনকে আর বেঁচে থাকতে দেয়া চলে না। ভয়ঙ্কর লোকের বিরুদ্ধে নেমেছে সে। জয়ী হতে হলে তাকেও নির্দয় হতে হবে বৈকি। জুডোর কায়দায় রোল করে উঠে দাঁড়াল রানা। আক্রমণকারীও অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েই মারল রানার পাঁজরে একটা বিরাশি সিক্কা। এটাই আশা করছিল রানা। ঘুসিটা বেমালুম হজম করল সে, কিন্তু তার হাতের ইস্পাতের পাতটা বিদ্যুৎ বেগে ঢুকে গেল লোকটার ঘাড়ের পাশ দিয়ে পুরো সাড়ে সাত ইঞ্চি। ষাঁড়ের মত গর্জন করে এল দ্বিতীয় লোকটা। একটু ডান দিকে সরে গিয়ে কারাতের ডেথ ব্লো মারল রানা ওর ঘাড় বরাবর। কড়াৎ করে একটা শব্দ হলো। তৎক্ষণাৎ না

মরলেও ওর দেহটা মাটিতে পড়ায় আগেই যে ও প্রাণ হারাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইস্পাতের পাতটা একটানে বের করে নিয়ে আর দেরি করল না রানা। এক দিনের জন্যে অনেক অ্যাকশন হয়ে গেছে। ওয়াটার প্রুফ ব্যাগটা নিয়ে পানিতে নামল। সিকি মাইল দূরেই দুলছে কেবিন ক্রুজার মোবাইল গার্ল।

ইনফ্রা রেড লেন্সের বিনকিউলারটা চোখ থেকে নামিয়ে গাড়ির কাছে ফিরে এল রেভারেন্ড লিগুরী। উঁচু জায়গাটা থেকে পুরো ব্যাপারটাই সে দেখেছে। গাড়ির বুট থেকে একটা কাঠের বাক্স বের করে এনে পেছনের সীটের ওপর রাখল। ডালা খুলতেই দেখা গেল একটা টু-ওয়ে রেডিও সেট। এক্সপার্ট হাতে ওটা টিউন করল রেভারেন্ড লিগুরী। ওদিক থেকে সাড়া পাওয়া গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

'তুমি ঠিকই বলেছিলে, জিমি, এখনও ওর শরীরে তোমার ইনজেক্ট করা এক্স এল ফাইভ এর যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাতে দু'মাইলের মধ্যে থাকলে ওকে ট্রেস করা সম্ভব।'

'ধরা পড়েছে তাহলে শেষ পর্যন্ত?'

'নাহ্। ধরা গেল না। যন্ত্র দিয়ে পাঠালাম দু'জনকে—খুঁজে ঠিকই বের করল ওরা ওকে। এই তো, এক মিনিটও হয়নি। বিনকিউলার দিয়ে দেখলাম, চোখের পলকে শেষ হয়ে গেল দু'জন। মোবাইল গার্লে গিয়ে উঠল রবার্ট ক্রফোর্ডের ছদ্মবেশে। আশ্চর্য, জিমি, ডুক্রেম ব্যুরোর এমন দুর্দান্ত লোক আছে জানা ছিল না আমার।'

'ডুক্রেম ব্যুরোর লোক নয় ও। ওর আসল নাম মাসুদ রানা। বাংলাদেশের স্পাই। বসের কড়া নির্দেশ, লোকটা ভয়ঙ্কর, ওকে যেমন করেই হোক শেষ করতে হবে। ওকে সরাতে না পারলে ভণ্ডুল হয়ে যাবে আমাদের সমস্ত প্ল্যান প্রোগ্রাম।'

'ঠিক আছে। আমি নিজে সে ভার নিচ্ছি। এবার পালিয়ে গেছে বটে, কিন্তু সামনের বার যেন পালাবার কোন রাস্তা না থাকে সেই ব্যবস্থাই নেব। ওভার অ্যান্ড আউট।'

সাত

সেলুলয়েডের পাত দিয়ে ল্যাচ লক খোলার মৃদু শব্দ হলো। খুব আস্তে। সামান্য ফাঁক হলো দরজাটা। তারপর আস্তে আস্তে পুরোটা খুলে গেল। বারান্দার আলো এসে ঢুকছে অন্ধকার ঘরটায়। মেয়েটা ক্ষণিক ইতস্তত করল

দরজায় দাঁড়িয়ে। সুঠাম দেহের অধিকারী মেয়েটি। ছিপছিপে, একহারা, লম্বা। বারান্দার আলোয় মেয়েটির ফিগার সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। দরজা বন্ধ করে দিল মেয়েটি ঘরে ঢুকে। আবার ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল ঘর দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই।

অন্ধকারের মধ্যেও স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। ঘরের মাঝখানে রয়েছে বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল। ফাইলিং ক্যাবিনেটটা রাখা হয়েছে দেয়াল ঘেঁষে। গোটা কয়েক চেয়ার রয়েছে টেবিরের পাশে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায়। সবগুলোই ঠিক ঠিক পাশ কাটিয়ে পুরু কার্পেটের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে স্টীলের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে পায়ের জুতো খুলে ফেলল মেয়েটা।

এইবার একটু সময় নিল তালা দুটো খুলতে। কমবিনেশন লক—খুব অ্যাড্ভান্সড্ ডিজাইনের। কিন্তু ওর পক্ষে খোলা অসম্ভব এমন তালা পৃথিবীতে কমই আছে। খোদ গিলটি মিঞার কাছে স্পেশাল ট্রেনিং নিয়েছে সে তিনমাস। তিন মাসেই তালার ব্যাপারে এক্সপার্ট বানিয়ে দিয়েছে ওকে গিলটি মিঞা। সতেরো মিনিটের মাথায় দুটো তালাই খুলে ফেলল সোহানা। আগের ঘরটার চেয়ে একটু ছোটই হবে এই ঘর। টাইল করা মেঝে। নিঃশব্দে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সোহানা। ডান দিকের ড্রয়ার টেনে পেন্সিল টর্চ দিয়ে কার্ডেক্স ফাইলের একটা কার্ড থেকে একটা নম্বর জেনে নিল। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো শেলফের কাছে এসে আবার পেন্সিল টর্চ জ্বালল। থরে থরে ম্যাগনেটিক টেপের স্পুল সাজানো রয়েছে। কার্ডে দেখে আসা নম্বরের স্পুলটা তুলে নিয়ে টেপরেকর্ডারে ভরল সে। অন্ করে দিল টেপরেকর্ডার।

তিনদিন হলো এখানে কাজে যোগ দিয়েছে সোহানা। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত রেকর্ড রাখার ভার পড়েছে ওর ওপর। ফাইল ঘেঁটে প্রথম দিনই টের পেয়েছে সে প্যাট্রিসিয়া ব্যান্ডের ফাইল আপ-টু-ডেট নেই। তার গত ছ'মাসের কাজে কিছু ব্যতিক্রম আর অস্থিরতা লক্ষ করে সিকিউরিটি হেড তার কেসটা রেফার করে প্রজেক্ট সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর হ্যারী ট্যালবটের কাছে। ডক্টর ট্যালবট জবাবে একটা মেমো পাঠিয়েছিলেন এই মর্মে যে তাঁর মতে ট্রিসা ব্র্যান্ড্ সিকিউরিটি রিস্ক নয়। বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ বলেই বাবার স্ট্রোকের পর থেকে ট্রিসা স্বভাবতই একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তাকে বাবার সঙ্গে কিছু দিন কাটিয়ে আসার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

খুবই ভাল কথা—কিন্তু ওই মেমোর সঙ্গে ডক্টর ট্যালবটের সাথে ট্রিসার ইন্টারভিউ-এর একটা টাইপ করা কপিও থাকা উচিত ছিল—সেটা নেই। এটা যে কেবল সোহানার চোখেই পড়েছে তা নয়। সিকিউরিটি হেডও এটা লক্ষ করে ডক্টর ট্যালবটকে খুঁটিনাটি রিপোর্ট পাঠানোর জন্যে তাগিদ দিয়েছিল। জবাবে ডক্টর ট্যালবট জানায় যে কাজের চাপে তার অফিস রিপোর্ট তৈরি করে উঠতে পারেনি। তারপরে ওখানেই ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে যায়।

ডক্টর ট্যালবটের অফিসের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করেই টের পেয়েছিল

সোহানা, মিথ্যা অজুহাত ওটা। খুবই কাজের মানুষ ডক্টর ট্যালবট। তার অফিস-সব কাজে আপটুডেট তো আছেই—কোন কোন কাজ আবার আগে থেকেই করা আছে। পেছনে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। ট্রিসার ব্যাপারে পেছনে পড়াটা উদ্দেশ্যমূলক।

শেষ হয়ে গেল টেপ। এমন কিছু তথ্য পাওয়া গেল না এটাতে। বাজানো টেপটা যথাস্থানে রেখে দ্বিতীয় টেপ নিয়ে এল সোহানা। তার বদ্ধমূল ধারণা এই টেপের মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা ডক্টর ট্যালবট যে কারণেই হোক চেপে যেতে চাইছে বলেই রিপোর্ট দেওয়ার ব্যাপারে গড়িমসি করছে।

দ্বিতীয় টেপটা চালু করল সোহানা। ডক্টর ট্যালবটের গলা শোনা যাচ্ছে। নরম গলায় প্রায় ফিসফিসিয়ে কথা বলছে সে। কষ্ট হচ্ছে শুনতে, তবু শব্দ বাড়াতে সাহস পেল না সোহানা। টেপ রেকর্ডারের ওপর ঝুঁকে পড়ল। শুনতে পেল: '…তোমার দুঃস্বপ্নের কথা বলেছিলে তুমি—বোমা, রক্ত, মৃত্যু এসব যা দেখছ এটা সম্ভবত হ্যামবুর্গে বোমার আঘাতে তোমার মায়ের মৃত্যুরই প্রতিক্রিয়া।'

'কিন্তু মায়ের মৃত্যুর কথা তো আমার মনে নেই—আমার বয়স দুই বছর ছিল যখন আমার মা মারা যায়। স্বপ্নে যা দেখি তাতে আমার বয়স প্রায় তিন বছর। আর স্বপ্নে যাকে হারাই সে মা নয়—বোন।'

'আবার তুমি ওই কথাই বলছ, ট্রিসা। কিন্তু আমরা দু'জনেই জানি যে তোমার কোন বোন নেই, কোনদিন ছিলও না। ছোট, বড় বা যমজ কোন রকম বোনই না। তোমার বাবা তোমাকে বলেছেন সে কথা—রিপোর্টেও তাই আছে।'

'সারাটা জীবন আমি কেমন যেন একটা দুঃখ, একটা ব্যথা মত অনুভব করেছি। মনে হয় যেন আমি সম্পূর্ণ নই। আমাকে অর্ধেক করা হয়েছে কেটে। আমার অর্ধেক অংশ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। একটা বইয়ে পড়েছি যমজ সন্তানরা একে অন্যের জন্যে নাকি ঠিক এই রকম ব্যথা অনুভব করে।'

'তোমার কোন যমজ বোন নেই, ট্রিসা, তুমি সাধারণ কেউ হলে তবু একটা সম্ভাবনা ছিল তোমার একটা বোন থাকার বা কোন রকম ভুল হবার। কিন্তু তোমার বাবার ও তোমার অতীত ফ্রান্সের অন্তত বারোটা বিভিন্ন এজেন্সী চেক করেছে বারো ভাবে। তারা সবাই একই রিপোর্ট দিয়েছে। আর তোমার বাবা? তোমার কোন বোন থাকলে তোমার বাবার তো সেটা অজানা থাকবার কথা নয়?'

কিছুক্ষণ টেপ ঘোরার পর আবার ডক্টর ট্যালবটের গলা শোনা গেল, 'তুমি বুঝতে পারছ না তোমারই অবচেতন মনের ছাপ পড়ছে তোমার চেতন মনের ওপর। আলাদা কোন সত্তার নয়।'

'কিন্তু কিছুদিন হলো খুব বেশি রকম দেখছি আমি অনেকবার দেখা সেই

একই স্বপ্ন। প্রায় প্রত্যেক রাতেই আমি তার গলার স্বর শুনতে পাই। চিৎকার করে ডাকে সে আমাকে ঠিক ছাদটা ধসে পড়ার আগে। তারপরেই দেখি আমি রক্ত আর আগুনের নদীর ওপর দিয়ে দৌড়াচ্ছি।'...কেঁদে ফেলল ট্রিসা।

সহানুভূতি মাখা স্বরে ডক্টর ট্যালবট প্রবোধ দিল ট্রিসাকে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে, ট্রিসা। আমি বলছি, সব ঠিক হয়ে যাবে। কেঁদে মনটা একটু হালকা করে নাও। অনেক ভাল বোধ করবে তাহলে।'

আবার ডক্টর ট্যালবটের গলা শোনা গেল: 'ট্রিসার মধ্যে প্রকট স্কাইযোফ্রেনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।' কিছুক্ষণ নীরবে টেপ ঘোরার পর স্বগতোক্তির মত শোনা গেল আবার। খুব নিচু স্বরে: 'কোন পুরুষের গভীর প্রেম, উষ্ণ হৃদয়ের ছোঁয়া এই স্কাইযোফ্রেনিয়া ভেঙে দিতে পারে। আমি কি দিতে পারি না ওকে এই প্রেম?...খুবই আকর্ষণীয় মেয়ে ট্রিসা।...টেপ হয়ে গেল...পরে মুছে ফেলতে হবে এই জায়গাটা...হ্যাঁ, ট্রিসার মধ্যে আরও দেখা যাচ্ছে...'

মৃদু হাসি ফুটে উঠল সোহানার ঠোঁটের কোণে। তাহলে এই কারণেই রিপোর্ট দেরি হচ্ছে। মজেছে ডাক্তার। তৃতীয় টেপটা শুনতে হয়। টেপটা বদলে তৃতীয় টেপটা লাগাল সে টেপরেকর্ডারে।

'ডক্টর ট্যালবট, কিছু কথা আমি আর নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারছি না। কাউকে আমার বলতেই হবে। প্রথম দুই ইন্টারভিউয়ে আমি যেসব কথা বলেছিলাম আমি স্বপ্নে দেখেছি, তার সব স্বপ্ন ছিল না। বাবার কথা বলছি আমি। বেগ সিটিতে আসার পর থেকে যেসব লোকের আনাগোনা হয় বাবার কাছে—এটা আমার কাছে কল্পনা নয়, ডাক্তার—উনি সত্যিই খুব বিপদের মধ্যে আছেন—আমরা সবাই বিপদে আছি। বিশ্বাস করুন, ডক্টর, আমরা সবাই বিপদে আছি। আর বাবার স্ট্রোক...'

'অমন ভাবে কথা বোলো না, ট্রিসা।' জোর করেই থামিয়ে দিল তাকে ডক্টর ট্যালবট। 'তোমার তো অজানা নেই যে তোমার বলা প্রত্যেকটা কথা তোমার ফাইলে যাবে শেষ পর্যন্ত। যাকগে আমি এই কথাগুলো পরে মুছে ফেলব। স্বপ্নের বিবরণ দেওয়া এক জিনিস আর সেটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করা অন্য জিনিস। জানো, এই কথাগুলো তোমার ফাইলে গেলে তোমার ক্যারিয়ার চিরদিনের জন্যে শেষ হয়ে যাবে? তোমাকে সিকিউরিটি রিস্ক হিসেবে গণ্য করা হবে।...তোমাকে সত্যি কথাই বলছি আমি, ট্রিসা, তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন। কয়েক মাস তুমি বিশ্রাম নিয়ে ফিরে এসো—তারপর দেখি আমি কি করা যায়। আমি সেই ভাবেই রিকমেন্ড করে পাঠাব।'

এতই নিবিষ্ট মনে টেপের কথাগুলো শুনছিল সোহানা যে সে টেরই পায়নি ধীরে ধীরে বাইরের অফিসের অন্ধকারটা ফিকে হয়ে আসছে। লোকটার হাতের চাপে দরজাটা একটু একটু করে খুলে গেল। গুটি গুটি পায়ে নিঃশব্দে লোকটা স্টীলের আধ খোলা দরজাটার কাছে পৌঁছে গেল। হাতে

উদ্যত একটা রিভলভার। টেপ রেকর্ডারের আওয়াজ কানে গেল লোকটার···ট্রিসা বলছে, 'বুঝলাম। আপনার সত্যিই ধারণা মানসিক বিকার ঘটেছে আমার।'

'না, বিকারগ্রস্ত নয়, আমি বলব অত্যধিক কাজের চাপে পরিশ্রান্ত।'

'আমি মোটেও বিশ্বাস করি না। আপনার নিশ্চয়ই ধারণা আমি সাংঘাতিক রকম অসুস্থ। একটু আগেই আপনি বললেন যে এই ইন্টারভিউ-এর সব কথা আমার ফাইলে গেলে আমাকে এই প্রজেক্ট থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। আমাকে অসুস্থ না ভাবলে আপনি কেন আমাকে বাঁচাবার জন্যে আপনার পেশাগত সুনাম নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছেন? আপনি জানেন না কি ঘটবে যদি এই টেপের কথাগুলো মুছে ফেলার ব্যাপারটা জানাজানি হয়?'

'আমি চোখের সামনে একজন বৈজ্ঞানিকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাওয়া দেখতে পারি না।' একটু নীরবতার পর আবার শোনা গেল ডক্টর ট্যালবটের গলা: 'না, সেটাও আসলে সত্যি নয়। তুমি কি এখনও বুঝতে পারোনি, ট্রিসা, কেন আমি এটা করছি? আমি তোমাকে ভালবাসি, ট্রিসা। তোমাকে প্রথম যেদিন দেখেছি সেদিন থেকেই তোমাকে আমি ভালবেসেছি।'···আবার শোনা গেল ডক্টর ট্যালবটের গলা···কিন্তু এবার টেপে নয়···স্টীলের দরজার পাশ থেকে, 'আমার গোপন কথা তাহলে জেনে ফেলেছ দেখছি।', ঘরের বাতিটা জ্বলে উঠল কথার সঙ্গে। ঝট করে ঘুরে তাকাল সোহানা। ডাক্তার! স্থির হাতে রিভলভার ধরে আছে সোহানার কপাল বরাবর।

সন্ধ্যায় বার-ডি-রিগাল-এ ঢুকেই লক্ষ করল রানা ট্রিসা বসে আছে কোণের একটা টেবিলে। একা। তার সামনে একটা ভদকা মার্টিনির গ্লাস। হালকা নীল রং-এর একটা ইভনিং ড্রেস পরেছে ট্রিসা। খুব সরু চেনের মাথায় একটা বিরাট হীরা ঝুলছে তার গলায়। খুব সুন্দর, অথচ কেমন যেন বিষণ্ন দেখাচ্ছে ট্রিসাকে। সোজা ট্রিসার টেবিলের দিকেই পা বাড়াল রানা। পাশে রাখা বেঢপ রকম বড় হ্যান্ড-ব্যাগটার মধ্যে কি যেন খুঁজছে ট্রিসা···হ্যাঁ পেয়ে গেছে···একটা 'স্টুভেসান্তে' সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগাল সে। রানার ইলেকট্রোনিক লাইটারটা জ্বলে উঠল ট্রিসার মুখের সামনে। সিগারেটটা ধরিয়ে চোখ তুলে চাইল সে।

'গুড ইভনিং!' মধুর হাসি হেসে বলল রানা, 'আমার নাম রবার্ট ক্রফোর্ড। বসতে পারি? আপনাকে একা একা বসে থাকতে দেখে এলাম। আমিও একা। একটা ড্রিঙ্ক আনাই আপনার জন্যে?'

তাকিয়ে রয়েছে ট্রিসা। রানাকে ভাল করে যাচাই করে নিচ্ছে তার চোখ।

'বসুন।' আস্তে করে বলল ট্রিসা, 'কিন্তু ড্রিঙ্ক নয়—যদি জিজ্ঞেস করেন

নাচব কিনা—বলব, আমার আপত্তি নেই।'

সুযোগ হারাল না রানা। হাত বাড়াল সে। রানার হাত ধরে উঠে এল ট্রিসা। বাস ব্যান্ড 'ইয়াম্ ব্যাম্বি' বাজাচ্ছে খুব জোরেশোরে। বংগোটা খুব ভাল বাজাচ্ছে।

মনে হচ্ছে কোন কিছুতেই যেন ট্রিসার মন নেই। ট্রিসা নাচছে ভালই, তবু সেদিনকার মত ফ্লো আসছে না। প্রথমে রানা ভেবেছিল হয়তো বা এই তালের জন্যেই জমছে না নাচটা—কিন্তু কয়েকটা নাচ পর পর নাচল ওরা। তাল বদলাল—রাম্বা, জাইভিং ওয়ালজ, ফক্সট্রট কিন্তু কোনটাই ঠিক সেদিনের মত জমল না। সব সময়েই কোথায় যেন একটা ব্যবধান রয়ে গেল। নাচতে নাচতেই ভিড় থেকে একটু সরে এল ওরা। নাচ থামিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রানা ট্রিসার দিকে। বুঝতে পারছে না রানা, আজকে যেন ট্রিসাকে একটু অন্য রকম লাগছে।

আধ বোজা চোখে রানার গায়ে গা এলিয়ে দিয়েছে ট্রিসা। মৃদু কণ্ঠে ট্রিসা বলল, 'কেমন যেন মাথাটা ঝিম ঝিম করছে এখানে ভিড়ের মধ্যে—একটু হাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াই ব্যালকনিতে।'

ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল ওরা। দূরে হোটেল সি-ভিউ-এর আলোকিত সুইমিং পুলটা দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকে। আরও দূরে কালো সমুদ্র। দেখা যাচ্ছে না—কেবল গর্জন শোনা যাচ্ছে।

রানার গা ঘেঁষে এল ট্রিসা। ভাব বুঝে হালকা একটা চুমো খেল রানা ট্রিসার ঠোঁটে।

ঠিক এই সময়ে পাড়ল ট্রিসা কথাটা। সেদিন বেনসন বেশধারী রানার কাছে যেমন করে বলেছিল ঠিক তেমন করে বলল, 'একটা নির্জন বীচ আছে মাইল দেড়েক দূরে। কেউ ওদিকটায় যায় না।'

বুড়োগুলোকে মেরে কোন লাভই হয়নি, ভাবল রানা। সেই বোট হাউসের সামনে পড়ে থাকা মৃত বুড়ো দু'জন ছাড়াও আরও কেউ জানে যে ডক্টর নিমেরী ফ্লেচার আর রবার্ট ক্রফোর্ড একই ব্যক্তি। ট্রিসাকে পাঠানো হয়েছে তাকে আবার বীচের ধারে নিয়ে যাবার জন্যে। মোটেও সময় নষ্ট করেনি ওরা। রানা কেবলমাত্র ফিরে এসে স্নান সেরে গোটা কয়েক স্যান্ড উইচ খেয়েই বার-ডি-রিগালে এসেছে। এরই মধ্যে ওরা ওদের কর্মপন্থা ঠিক করে আঘাত হানার জন্যে তৈরি! মনে মনে ওদের ক্ষিপ্রতার প্রশংসা না করে পারল না সে। কিন্তু ন্যাড়া বেল তলায় যায় ক'বার? রানাকে আবার সেই একই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাটা কি একটু বেশি ছেলেমানুষী হয়ে গেল না? খটকা বাধল রানার মনে। ব্যাপার কি? আর যাই হোক এদের ছেলেমানুষ মনে করবার কোন কারণ নেই। কিন্তু তবু কেন এই প্রস্তাব?

দ্রুত চিন্তা করে নিচ্ছিল রানা। ওদের প্ল্যান অনুযায়ী এগুতে দেওয়া ঠিক

হবে না। দুই হাত কাঁধে রেখে একটু দূরে সরাল সে ট্রিসাকে। তারপর ওর গলায় পরা হীরেটায় ছোট্ট একটা টোকা দিয়ে বলল, 'এটা পরে তুমি যেতে চাও নির্জন বীচে? ফ্রান্সের সব ডাকাত ধাওয়া করবে আমাদের পিছু পিছু—নির্জন বীচ আর নির্জন থাকবে না!…তাছাড়া আমি একটা জরুরী টেলিফোন কল আশা করছি আমার রুমে আজ রাতে। নির্জনতার দিক দিয়ে আমার রুমটাই বা কম যায় কিসে?'

এমনভাবে সোজাসুজি বলে ফেলায় ঈষৎ লাল হয়ে ওঠা মুখটা ঘুরিয়ে নিল ট্রিসা। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'ঠিক আছে।'

নিজের কামরায় ফিরেই বাইরের ঘরে ট্রিসাকে বসিয়ে ওর জন্যে ড্রিঙ্ক আনতে যাবার ছুতোয় পুরো সুইটটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল রানা। কোন ঝুঁকি নিতেই আর রাজি নয় সে। নিশ্চিন্ত হলো রানা—তার অনুপস্থিতিতে কেউ ঢোকেনি ভিতরে। বেডরুমের মিনিয়েচার বার থেকে এক বোতল ভারমুথ বের করে নিয়ে এল সে। সেই সঙ্গে দুটো গ্লাস।

'ভারমুথ চলবে তো তোমার?' বোতলটা উঁচিয়ে দেখাল রানা। মাথা হেলিয়ে সায় দিল ট্রিসা।

ভারমুথের গ্লাসটা এগিয়ে দিতেই এক চুমুকে শেষ করল ট্রিসা পুরোটা। ওর খালি গ্লাসটা নিয়ে আবার কিছুটা ভারমুথ ঢেলে দিল রানা। মনে মনে খুশি হয়েছে সে। আর দশটা মিনিট বড় জোর—তার পরই মুখ খুলবে ট্রিসার। ওর গ্লাসে একটা বড়ি মিশিয়ে দিয়েছে রানা। স্কোপোলামিনের বড়ি। ট্রুথ সিরাম। এই উদ্দেশ্যেই ভারমুথ বের করে এনেছে সে—এর কড়া মিষ্টি স্বাদে স্কোপোলামিনের স্বাদ টের পাবে না ট্রিসা।

ভিতর ভিতর উত্তেজিত বোধ করছে রানা। কিছু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে ট্রিসা আজ। ওদের অজানা নেই যে রবার্ট ক্রফোর্ড আর কেউ নয়—মাসুদ রানা। নিশ্চয়ই কোন বিশেষ মতলব হাসিল করবার জন্যে পাঠানো হয়েছে ওকে। সেটা কি, জানা যাবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। ট্রিসার কথামত নির্জন বীচে যায়নি রানা, এটা একটা পরিবর্তন, কিন্তু এক কথায় ওর ঘরে আসতে যখন রাজি হয়ে গেল ট্রিসা, কেমন যেন খটকা লাগছে এখন—কেন যেন মনে হচ্ছে রানার, ওদের উদ্দেশ্য বিফল করে দিতে পারেনি সে। কিছু একটা ঘনিয়ে আসছে ওর চারপাশে। কি সেটা? দশ মিনিটের আগেই ঘটে যাবে না তো সেটা?

হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ে যাওয়ায় উঠে দাঁড়াল ট্রিসা। 'কিছু যদি মনে না করো…আমি আসছি পাঁচ মিনিটের…'

মাথা নাড়ল রানা। এখন কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারে না সে ট্রিসাকে। এগিয়ে এসে একটানে বুকের ওপর নিয়ে এল ওকে।।

'প্লীজ! এক্ষুণি আসছি আমি…' অসম্পূর্ণ রয়ে গেল ওর বক্তব্য। রানার নিষ্ঠুর একজোড়া ঠোঁট নেমে এসেছে।

ট্রিসার চোখের মণি অস্বাভাবিক রকম বড় দেখাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে আছে ওরা দু'জন, পাশাপাশি। শুয়ে শুয়ে ভাবছে রানা। সেদিনকার ট্রিসার সঙ্গে আজকের ট্রিসার ব্যবহারে কোন মিল নেই। একই মেয়ের পক্ষে এমন ভিন্ন স্বভাবের অভিনয় করা কি সম্ভব? সেদিনের সেই উচ্ছল প্রাণ চাঞ্চল্য আজ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কেন? জানার সময় ঘনিয়ে এসেছে—কিছুক্ষণের মধ্যেই সব জানতে পারবে সে। আর সময় নষ্ট করা চলে না। যা জানার এখনই ঝটপট জেনে নিতে হবে ওষুধের প্রভাব কেটে যাবার আগেই।

'কলিন মারা যাওয়ার সময়ে তুমি কি সেখানে উপস্থিত ছিলে?' সরাসরিই জিজ্ঞেস করল রানা কোন ভণিতা না করে।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ট্রিসা। রবার্ট ওকথা কেমন করে জানল, কেনই বা তাকে প্রশ্ন করছে, এসব চিন্তা করার মত ইচ্ছা শক্তি আর ট্রিসার মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

'আশ্চর্য! অথচ একটা ব্লন্ড মেয়েকে সাদা কনভার্টিবল গাড়ি চালিয়ে ওখান থেকে চলে যেতে দেখা গেছে।'

'তুমি কি বলতে চাইছ?' চোখ খুলে রানার মুখের ভাব বুঝবার চেষ্টা করল ট্রিসা। 'না, না, আমি কলিনকে ভালবাসতাম। আমি সত্যিই ভালবাসতাম ওকে।'

সব গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে রানার। ট্রিসা যদি গাড়ি চাপা দিয়ে কলিনকে না মেরে থাকে তবে কে গাড়িটা চালাচ্ছিল?

'প্রথম থেকে সব খুলে বলো। সব। কিছুই বাদ দেবে না।'

মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে আরম্ভ করল ট্রিসা, 'কলিন এই হোটেলেই উঠেছিল···এখানেই ওর সঙ্গে আমার হঠাৎ করে পরিচয় হয়। মানে আমি তাই ভেবেছিলাম···আস্তে আস্তে আমাদের একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরে আমি কথায় কথায় জানতে পারি যে আমাদের দৈবাৎ পরিচয় হয়নি—কলিন প্ল্যান করেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিল। ভীষণ রাগ হয়েছিল আমার···তুমুল ঝগড়া হয় আমাদের সেদিন।'

'কি নিয়ে ঝগড়া?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'সব জেনে আমার ধারণা হলো কলিন আমাকে আসলে সত্যি সত্যি ভালবাসে না। আমার সঙ্গে মিথ্যে অভিনয় করেছে প্রেমের—আলাপ জমিয়েছে আমার আর বাবার ওপর স্পাইং করার জন্যে। ওরও ধারণা ছিল বাবা সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে আছেন। অনেক লোকের সামনেই সেদিন আমি রাগের মাথায় ওর সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি চলে যাই।···বাড়িতে মাথা ঠাণ্ডা হলে ভাবলাম কলিন হয়তো আমাদের সাহায্য করতে পারে—হয়তো সে কোন গভমেন্ট এজেন্সীর লোক। ফোন করলাম আমি তাকে···'

'বাসা থেকে?'

'হ্যাঁ, তাকে ফোনে বললাম সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে ওই নির্জন

বীচে।...সেখানে কেউ আমাদের কথা শুনতে পাবে না...গোপনে আলাপ করতে পারব ভেবেছিলাম...কিন্তু...' হাত দিয়ে কপাল ঘসল ট্রিসা, কিছু মনে করতে চেষ্টা করছে সে, 'জানি না কি হলো...বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি...যখন জ্ঞান ফিরল জিমির কাছে জানলাম কলিন গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মারা গেছে।...শুনেই আবার জ্ঞান হারাই আমি।...'

'তুমি কলিনের সঙ্গে কি নিয়ে আলাপ করতে চেয়েছিলে? তোমার বাবা, জিমি আর লি-বিউসে প্রজেক্ট সম্বন্ধে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল ট্রিসা...থামিয়ে দিল তাকে রানা।

'আজ সন্ধ্যায় কি জিমি পাঠিয়েছে তোমাকে আমার এখানে?'

আবার মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ট্রিসা। 'কলিনের মৃত্যুতে আঘাত পেয়েছিলাম আমি। সবসময় মনমরা হয়ে থাকতাম...জিমি বলল বার-ডি-রিগালে গেলে তোমার সঙ্গে আলাপ হবে আমার...সন্ধ্যাটা সুন্দর কাটবে। জিমি কি করে আগে থেকেই জানল জানি না...জানতে চাইও না...জিমির কথা শুনে আমার ভালই হয়েছে—অপূর্ব কেটেছে আমার সন্ধ্যাটা।...তবে ওই বেঢপ রকমের হ্যান্ড ব্যাগটা আমি কিছুতেই আনতে চাইনি—কিন্তু জিমি জোর করল...'

হ্যান্ড ব্যাগ! দ্রুত চিন্তা চালু হয় গেল রানার মাথায়। ইশ্—কি করে তার নজর এড়িয়ে গেল ওটা? লক্ষ করেছিল সে ঠিকই কিন্তু আমল দেয়নি শেষ পর্যন্ত।

ট্রিসার দিকে বিছানার পাশে একটা চেয়ারে রাখা রয়েছে হ্যান্ড ব্যাগটা।

শেষ মুহূর্তে অন্য সিদ্ধান্ত নিল রানা। লাফিয়ে উঠে হ্যান্ডব্যাগটা জানালা দিয়ে ফেলে দেয়ার প্রবল ইচ্ছাটা দমন করল সে। কেন যেন মনে হলো ওর, সময় নেই। ট্রিসাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে এক গড়ান দিয়ে মেঝেতে পড়ল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে গেল ওর।

আট

বেঁটে মত রিভলভারটার দিকে চেয়ে রয়েছে সোহানা অবাক দৃষ্টিতে। কখন যে চুপিসারে ডক্টর ট্যালবট ঘরে ঢুকেছে টেরই পায়নি সে।

'টেপগুলো সবই শুনে ফেলেছেন দেখছি। ওই টেপের তথ্য বাইরে প্রকাশ পেয়ে গেলে আমার ক্যারিয়ার একেবারে শেষ। আপনাকে মেরে ফেলা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই, বুঝতেই পারছেন?'

কিন্তু ডক্টর ট্যালবট যে কিছুতেই সাহস করে ট্রিগারটা টিপতে পারবে না

এটা বুঝে নিতে সময় লাগল না সোহানার। পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে বসে মিষ্টি হাসল সে। জবাব দিল না।

'ট্রিসার ব্যাপারে আপনার এই অহেতুক আগ্রহ কেন? আপনি কি সরকারের পক্ষ থেকে ট্রিসার অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করছেন?'

'আমি সরকারী পক্ষের লোক কে বলল আপনাকে?' প্রশ্ন করল সোহানা।

'ওই স্টীলের দরজার কমবিনেশন জানা না থাকলে কারও পক্ষে খোলা সম্ভব নয়। সিকিউরিটি অফিসার আর আমি ছাড়া আর কারও ওই কমবিনেশন জানা নেই। সরকারী পক্ষের লোক না হলে সিকিউরিটি অফিসার আপনাকে কিছুতেই তালার কমবিনেশন জানাত না। এটা বোঝার মত ঘিলু আমার আছে।'

আশার আলো দেখতে পেল সোহানা। আজ রাতে ওর এই অফিসে আসার কথা সিকিউরিটি অফিসার জানে বলেই ধরে নিয়েছে ডাক্তার। ভুল ভাঙাল না সে ডক্টর ট্যালবটের। লি-বিউসে প্রজেক্টে কাজ নিয়ে আসার প্রথম উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে সোহানার যদি তার এই অনধিকার প্রবেশের কথা জানাজানি হয়ে যায়। কথার মোড় এবার অন্যদিকে ফেরাল সে। সহানুভূতির সঙ্গে বলল, 'ট্রিসার প্রতি আপনার বিশেষ দুর্বলতার ফলেই যে আপনি পুরো ব্যাপারটা চেপে গেছেন তা বেশ বুঝতে পারছি। আপনার পরিপূর্ণ সহযোগিতা পেলে এ ব্যাপারে আপনার কোন হাত আছে সে কথা আমার রিপোর্টে উল্লেখ নাও করতে পারি।'

'কি ধরনের সহযোগিতা চান আপনি?'

'ট্রিসার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে আপনি যে সমস্ত নোট করেছেন,সেগুলো দেখতে চাই।'

'ওগুলো এখানে নেই। কোয়ার্টারে আমার ঘরে লুকোনো আছে।'

'চলুন।' উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল সোহানা রিভলভারটার উদ্দেশে। বাধ্য ছেলের মত ডক্টর ট্যালবট হস্তান্তর করল রিভলভারটা। তারপর ধপ্ করে পাশের চেয়ারটাতে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল। স্বগতোক্তির মত বলতে লাগল, 'ট্রিসার অবস্থাটা একান্তই সাময়িক। বিশ্বাস করুন। না, ওর প্রতি আমার আসক্তি আছে বলে বলছি না। সত্যিই আমি বিশ্বাস করি যে ওর গুরুতর কোন মানসিক অসুখ হয়নি। যারা প্রতিভাবান তাদের মধ্যে সচরাচর একটু আধটু অসঙ্গতি বা সাধারণের থেকে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু সাধারণের সঙ্গে পার্থক্য আছে বলেই না তারা প্রতিভাবান, নইলে তো তারা সাধারণ মানুষই হত।'

'আপনি কি বলতে চান ট্রিসা সিকিউরিটি রিস্ক নয়? তাকে লিবিউসের এই টপ সিক্রেট প্রজেক্টের কাজে বহাল রাখলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই?'

'হ্যাঁ, আমার তাই বিশ্বাস। চলুন, আপনাকে আমার নোটগুলো

দেখাচ্ছি। আগামীকাল কাজে যোগ দিচ্ছে বলে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে ট্রিসা। আমার সাথে ওর পরবর্তী ইন্টারভিউয়ে আপনার উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা করব আমি। এর পরেও যদি আপনার কোন সন্দেহ থাকে ট্রিসার সম্বন্ধে তবে আমি নিজে আমার কুকীর্তির কথা রিপোর্ট করে রিজাইন দেব।'

উঠে পড়ল ডক্টর ট্যালবট। সোহানাও উঠল।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে প্যাট্রিসিয়া ব্যাড।

'প্যাপ্পি! প্যাপ্পি! ফ্রলিন!' ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর দুই চোখ। রক্ত ঝরছে ঠোঁটের কোণ বেয়ে। 'বোমা, বোমা···বাংকারে··· বাঁচাও, বাঁচাও!···বাবা আর বোন···বাঁচাও!'

উঠে বসে মাথা ঝাড়া দিল রানা। এক সেকেন্ডের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ঘরটা। দাউ দাউ করে জ্বলছে তোশকবালিশ। আগুন ধরে গেছে কয়েকটা ফার্নিচারেও। ঘন কালো ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে ঘর। আর দেরি করলে দিক হারিয়ে ফেলবে, পৌছতে পারবে না দরজা পর্যন্ত।

দ্রুত হাতে জখমগুলো পরীক্ষা করল রানা। কোনটাই মারাত্মক কিছু না। বিস্ফোরণের ধাক্কায় কানের পর্দায় চোট লেগেছে বলে রক্ত বেরিয়ে এসেছে ওদের মুখ থেকে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। ভাঙাচোরা বিশাল ডাব্‌ল্ বেড খাটটার দিকে এক নজর চেয়েই বুঝতে পারল রানা, প্রায় মেঝে পর্যন্ত নিচু বলেই রক্ষা পেয়েছে ওরা এযাত্রা। তা নইলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত ওদের দেহ।

হ্যান্ড ব্যাগের লাইনিঙের মধ্যে টাইমিং ডিভাইস ফিট করা সাইক্লোনাইট অথবা আর ডি এক্স ছিল। এমন ব্যবস্থা ছিল যেন বিস্ফোরণটা ওপর দিকে না গিয়ে চারপাশে ছড়ায়। হীরের নেকলেসটা নির্জন বীচে গলায় রাখা নিরাপদ নয় বলে ব্যাগে পুরে রাখতে বলবে রানা, এটাই স্বাভাবিক। ওটা ব্যাগে পুরে খুব কাছাকাছিই রাখবে ট্রিসা, এটাও স্বাভাবিক।

তার মানে শুধু রানা নয়, ট্রিসাকেও হত্যা করতে চেয়েছিল ওরা! কেন?

বাইরে চিৎকার, হৈ-হট্টগোল আর দৌড়াদৌড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বিপদ যে এখনও কাটেনি বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। জিমির লোক যে কাছে পিঠেই কোথাও থাকবে এবং বিস্ফোরণের ফলাফল জানাবে হেড-কোয়ার্টারে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ওরা বেঁচে গেছে জানলে আবার আক্রমণের আদেশ দেয়া হবে। এই হোটেল থেকে বেরোবার আগেই যদি কোন অদৃশ্য পিস্তল থেকে গুলি ছুটে আসে, মরবার আগে অবাক হওয়ারও সময় পাওয়া যাবে না। এখন একমাত্র নিরাপদ জায়গা হচ্ছে মোবাইল গার্ল। যত দ্রুত সম্ভব পৌছতে হবে কেবিন ক্রুজারে। হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল রানা ট্রিসাকে। খাটের ওপাশে খুলে ফেলা ট্রিসার জামাকাপড় পুড়ে শেষ। নিজের একটা শার্ট পরাল রানা ওর গায়। হাঁটু পর্যন্ত

ঢাকা পড়ল। এবার ঝটপট একটা হাফপ্যান্ট পরে নিয়ে ঠেলে নিয়ে এল সে ট্রিসাকে দরজার কাছে। করিডরে বেরিয়ে দেখা গেল লিফটের সামনে চল্লিশ-পঞ্চাশজনের একটা ভিড়, সবাই সবাইকে ঠেলে আগে ঢুকতে চেষ্টা করছে লিফটের ভিতর, সেই সঙ্গে চলেছে ভয়ার্ত চিৎকার। ভিড় ঠেলে ট্রিসাকে যতটা সম্ভব কনুইয়ের গুঁতো থেকে বাঁচিয়ে সিঁড়ির মুখে পৌঁছল রানা। এবার ট্রিসাকে কাঁধে তুলে তরতর করে নামতে শুরু করল।

ফোঁপাচ্ছে ট্রিসা। নামতে নামতে একটা উজ্জ্বল বাতির নিচে থামল রানা। ট্রিসার মুখটা উঁচু করে তুলে ধরে দেখল, এখনও বিস্ফারিত হয়ে রয়েছে চোখের মণি, ভাবলেশহীন দৃষ্টি। স্কোপোলামিন, সেইসঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ঝাঁকুনি খেয়ে ওর মনটা ছিটকে চলে গেছে শৈশবের কোন একটা ঘটনায়। কোন্ ঘটনা? এয়ার রেইডে ওর মায়ের মৃত্যুর ঘটনাটা? উঁহুঁ। বোনের কথা বলছে বার বার। কখনও ইংরেজিতে, কখনও ভাঙা ভাঙা জার্মানে। শোয়েস্টারলেইন—ছোট্ট বোন। কাঁধ ধরে বারকয়েক জোর ঝাঁকুনি দিল রানা, তারপর ঠাস করে চড় কষাল ওর গালে। লাভ হলো না কিছুই। বাস্তবে ফিরে আসতে পারছে না কিছুতেই। অবাক হয়ে চেয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে, তারপর বিড় বিড় করে আগুন, বোমা আর বাংকার সম্পর্কে কি যেন বলল। ডুকরে কেঁদে উঠল, 'প্যাপ্পি। ফ্রলিন!'

রানা হতভম্ব ট্রিসার শরীরটা বয়ে দ্রুতপায়ে নেমে এল নিচে। পার্কিং লট পেরিয়ে জনশূন্য লন ধরে ছুটল জেটির দিকে। কেউ নেই জেটিতে। বোমার আওয়াজ আর লোকজনের হৈ চৈ শুনে অ্যাটেন্ডেন্ট গেছে হোটেলের দিকে ব্যাপার কি জানতে। ভালই হয়েছে। ক্রুজারে উঠেই নোঙর তুলে পেছনে সরতে শুরু করল রানা।

মাইলখানেক বামে সরে একটা ফার্স্ট এইড বক্স থেকে গোটাকয়েক ঘুমের বড়ি বের করে খাওয়াল ট্রিসাকে। মনে মনে কর্মপন্থা স্থির করে ফেলেছে সে। আবার যেতে হবে ওর প্রফেসার ব্র্যাড়ের কাছে। অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে সেখানে। আর যতক্ষণ অনুপস্থিত থাকবে সে, ততক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে ট্রিসাকে।

হাতে ধরে টেনে নিয়ে এল ওকে নিচের বাংকের কাছে। পাঁজাকোলা করে তুলে শুইয়ে দিল। ছটফট করে উঠে বসতে যাচ্ছিল ট্রিসা, কাঁধ ধরে ঠেলে শুইয়ে দিল রানা আবার। বলল, 'চুপচাপ ঘুমোও, সব ঠিক হয়ে যাবে।' বারকয়েক সম্মোহনের কৌশলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দুই হাতের দশ আঙুল বুলাতেই বুজে এল ট্রিসার চোখ। খানিক বাদেই গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস বইতে দেখে বুঝতে পারল, ঘুমিয়ে পড়েছে ট্রিসা। একটা হালকা কম্বল দিয়ে ওর পা থেকে বুক পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে ফিরে এল রানা ডেকে। ডান দিকে চেয়েই চমকে উঠল সে।

বৃষ্টির মত টুপ টুপ কি যেন পড়ছে নিস্তরঙ্গ সাগরের জলে। ডাঙার দিকে

চাইতেই এই বৃষ্টির উৎস টের পেল সে। বহুদূরে আবছা মত দেখা যাচ্ছে দুটো স্পীডবোট। এত দূরে যে গুলির আওয়াজ পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না। চাঁদের স্বচ্ছ আলোয় বোটগুলোর দু'পাশে ফেনা দেখতে পাচ্ছে রানা। গতি কিছুটা কমিয়ে খোলা সমুদ্রের দিকে চলতে শুরু করল সে, যতক্ষণে ওরা কাছে এসে পৌঁছবে ততক্ষণে ডাঙা থেকে এতই দূরে সরে যাবে ওরা যে কারও বুঝবার উপায় থাকবে না কি ঘটেছে স্পীডবোট দুটোর কপালে।

বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছে স্পীডবোট। ক্রুজারের গায়ে লাগছে গুলি এক-আধটা, বেশির ভাগই হয় সামনে নয়তো পেছনে পড়ছে। স্পেশাল চাবিটা ঢোকাল রানা কন্ট্রোল প্যানেলে, একটা প্যাঁচ দিয়ে টিপে দিল চার নম্বর বোতামটা। এর ফলে চল্লিশ মিলিমিটার বোফার নাক বের করে পজিশন নেয়ার কথা। পেছন থেকে দেখতে লাগবে অনেকটা একজোড়া একজস্ট পাইপের মত। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা আবার। প্রায় ঘাড়ে উঠে এসেছে স্পীডবোট দুটো। শক্তিশালী আওয়েন্স্ এক্স এল নাইনটিন। তীরবেগে আসছে ছুটে। প্রত্যেকটায় তিনজন করে লোক গুলি চালাচ্ছে। দু'পাশ থেকে দু'জন সাব-মেশিনগান চালাচ্ছে, আর মাঝের জন চালাচ্ছে ছাতের ওপর ফিট করা টমসন মেশিনগান। হুইলটা সামান্য ঘোরাল রানা, লাইনে এসে যেতেই টিপ দিল পাশাপাশি সাজানো লাল দুটো বোতামের একটায়, দুই সেকেন্ড পর দ্বিতীয়টায়।

পরপর দু'বার কেঁপে উঠল মোবাইল গার্ল কামানের প্রচণ্ড রিকয়েলের ফলে। মুহূর্তে মিসমার হয়ে গেল স্পীডবোট দুটো। এই ছিল, এই নেই—একেবারে নিশ্চিহ্ন। দপ্ করে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে জ্বলে উঠেই মিলিয়ে গেল সাগরগর্ভে। মাহমুদ বেগ সিঁটির দিকে রওনা হতে গিয়ে আবার চমকে গেল রানা।

এতক্ষণ স্পীডবোট দুটো নিয়ে ব্যস্ত থাকায় লক্ষ্যই করেনি সে, ডানদিক থেকে একেবারে গায়ের কাছে চলে এসেছে একটা হাইড্রোফয়েল। গতিবেগ কম করে হলেও আশি নট। রানাকে ঘুরতে দেখেই শুরু হলো গোলাবর্ষণ।

মোবাইল গার্লের স্পীড এখন দশ নট। যত শক্তিশালী ইঞ্জিনই হোক না কেন, স্পীড তুলতে সময় লাগবে। হাইড্রোফয়েলের হাত ফসকে বেরিয়ে যাওয়ার কোন উপায় আছে বলে মনে হলো না রানার কাছে। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। গোক্ষুরের মত ছোবল দিল রানার হাত। ডিজেল ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে একটা চাবি ঘুরিয়েই টিপে দিল সে জে ৪৬ স্টার্ট লেখা একটা বোতাম।

গম্ভীর একটা গর্জন কানে এল রানার। একটা সবুজ বাতি জ্বলে উঠল প্যানেলে—অর্থাৎ, ঠিকমতই চালু হয়ে গেছে টার্বো জেট। স্ট্যাবিলাইজার ফিনের বোতাম দুটো টিপে দিয়েই আরেকটা বোতাম টিপল রানা। এর ফলে ডেকের ওপর বেরিয়ে আসবে ·৫০ ক্যালিবার ব্রাউনিং মেশিনগানের নল। লাল একটা বোতাম টিপে দিতেই শুরু হয়ে গেল গুলিবর্ষণ। সঙ্গে সঙ্গেই

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক গিয়ারটা স্লো অ্যাহেড-এ দিল রানা বাঁ হাতে। চলতে শুরু করল ক্রুজার।

মোবাইল গার্ল যে ঠিক কত দ্রুত স্পীড তুলবে জানা না থাকায় টার্বোজেট চালু হতে দেখেই ঘাবড়ে গিয়ে সাতান্ন মিলিমিটার রিকয়েললেস রাইফেল চালু করল ওরা। ওদের লক্ষ্যস্থল টার্বোজেট। প্রথম গুলিটা মিস হয়ে গেল। ছিটকে উঠে এল সাগরের জল ডেকের ওপর।

ফুল অ্যাহেড-এ দিল রানা গিয়ার শিফট। কেঁপে উঠল মোবাইল গার্ল। ছুটতে শুরু করেছে সামনে। ক্রমেই বাড়ছে গতি। কিন্তু যে হারে বাড়ছে তাতে কোন লাভ নেই। দ্রুতহাতে শেষ বোতামটা টিপল রানা। ফিশিং সীটের নিচ দিয়ে সড় সড় করে পানিতে গিয়ে পড়তে শুরু করল ছোট ছোট ক্যানেস্তারার মত ম্যাগনেশিয়াম চার্জ। পানিতে পড়েই টুপ করে ভেসে উঠছে ওগুলো ছিপের ফাৎনার মত।

রিকয়েললেস রাইফেলের দ্বিতীয় গুলি মড়মড় করে মোবাইল গার্লের ছাতের খানিকটা অংশ ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে গেল। হুহু করে বাড়ছে স্পীড। ডায়ালের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে বসে রয়েছে রানা। সবুজ কাঁটা যখন পাঁচ হাজার হর্স পাওয়ারের ঘর স্পর্শ করল, স্পষ্ট অনুভব করল সে সামনের দিকটা শূন্যে উঠে গেছে মোবাইল গার্লের। মনে হচ্ছে, এক্ষুণি পানি ছেড়ে উড়াল দেবে রাজহাঁসের মত। দ্রুত ডানদিকে সরে যাচ্ছে স্পীডমিটারের কাঁটা।

দপ্ করে জ্বলে উঠল তীব্র আলো। ঝট করে পেছন ফিরল রানা। জ্বলে উঠেছে নীলচে-সাদা ম্যাগনেশিয়াম আলো। পরমুহূর্তে পর পর দুটো কমলা রঙের বিস্ফোরণ দেখতে পেল সে, সেই সঙ্গে বজ্রপাতের মত বিকট শব্দে তালা লেগে গেল কানে। চোখের সামনে হাইড্রোফয়েলের অ্যালুমিনিয়াম বডি প্রচণ্ড উত্তাপে তেলাপোকার শুঁড়ের মত কুঁকড়ে যেতে দেখল রানা। উন্মাদের মত লাফালাফি করছে ওর ভিতর কয়েকজন। আবার একটা বিস্ফোরণে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল সব। সাগরের নিচে অদৃশ্য হয়ে যেতেই দপ করে নিভে গেল সব আলো। শুধু মাতালের মত দুলছে চাঁদের প্রতিবিম্ব সাগর জলে।

মস্ত এক অর্ধবৃত্ত সৃষ্টি করে ফিরে চলল রানা মাহমুদ বেগ সিটির দিকে। অফ্ করে দিল টার্বোজেট। বিকেলে যেখানে নোঙর ফেলেছিল, ঠিক সেইখানেই আবার নোঙর ফেলল সে। এবার আর বোট হাউসের ভিতর ঢুকল না। বালুকা বেলাতে দাঁড়িয়েই প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে শুকনো জামাকাপড় আর ওয়ালথার পি. পি. কে. বের করল। তৈরি হয়ে নিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে রওনা হলো সিটির দিকে। চোখ-কান সজাগ সতর্ক, কিন্তু অতি গোপনীয়তা অবলম্বন করে সময় নষ্ট না করাই সমীচীন বলে মনে হলো ওর।

কেননা, পরিষ্কার বুঝতে পারছে, হাতে সময় খুবই কম। উপলব্ধি করতে পারছে, শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় পিছিয়ে রয়েছে সে অনেক।

নয়

রাস্তায় একটা লোকও দেখতে পেল না রানা।

একেবারে নিঝুম, নিস্তব্ধ। রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলোও মনে হচ্ছে জনশূন্য। কারও গলার আওয়াজ তো দূরে থাকুক একটা রেডিও বা টেলিভিশন সেটের শব্দও পেল না সে। ব্যাপার কি? ভাগল নাকি সব? গেল কোথায়?

বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটাকে একটু বেশি মাত্রায় লাফালাফি করতে দেখে বুঝতে পারল রানা, ভয় পেয়েছে সে। এক দৌড়ে কেবিন ক্রুজারে ফিরে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছেটা দমন করল সে। ট্রিসাকে মাইলখানেক দূরের একটা নির্জন বীচে ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রেখে এসেছে, কাজেই সে ব্যাপারে কোন দুশ্চিন্তা নেই। রানার অনুপস্থিতির সুযোগে যে কেউ মোবাইল গার্লে উঠে ওর জন্যে ওৎ পেতে অপেক্ষা করবে সে পথও বন্ধ করে দিয়ে এসেছে সে নামার সময়। একটা গোপন ইলেকট্রিক সার্কিট না কেটে কেউ যদি কেবিন ক্রুজারে উঠবার চেষ্টা করে, বিস্ফোরণ ঘটবে একটা পঁচিশ পাউন্ড আর ডি এক্স চার্জে। কাজেই সেদিক দিয়েও চিন্তা নেই। কিন্তু যার সঙ্গে দেখা করতে চলেছে তার দেখা কি পাবে সে? প্রফেসার ব্র্যান্ডকেও সরিয়ে ফেলা হয়নি তো?

ট্র্যাপ। নিশ্চয়ই কোন ফাঁদ পাতা হয়েছে ওর জন্যে। প্রফেসার ব্র্যান্ডের বাড়ির সামনের লন থেকে সাঁৎ করে একটা ছায়ামূর্তিকে সরে যেতে দেখল রানা। নিষ্ঠুর একটুকরো হাসি খেলে গেল ওর ঠোঁটের কোণে। প্রাচীর ডিঙিয়ে ভিতরের আঙিনায় নামল সে। একটা জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে পর্দাটা সামান্য একটু সরিয়েই স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল। না। সরিয়ে নেয়া হয়নি প্রফেসার ব্র্যান্ডকে। ঘরটা অন্ধকার। একটা টিভির পর্দার আলোতে দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধের মুখটা, তার পাশে একটা শেল্‌ফ্‌ ঠাসা মোটা বাঁধানো বইয়ের সারি। হুইল চেয়ারে বসে সামনে ঝুঁকে চেয়ে রয়েছে প্রফেসার টিভির দিকে। কি দেখা যাচ্ছে ওখানে? রানার দেয়াল ডিঙিয়ে বাড়িতে ঢোকার দৃশ্য? আরেকটা জানালার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাবে টিভি প্রোগ্রাম। পর্দা তুলে দেখা গেল ঘোষকের মুখ। রেগুলার প্রোগ্রামই তাহলে। কিন্তু প্রফেসারের চরিত্রের সঙ্গে এত গভীর মনোযোগ দিয়ে টেলিভিশন প্রোগ্রাম দেখাটা তেমন খাপ খাচ্ছে বলে মনে হলো না ওর। প্রফেসার ব্র্যান্ড···হঠাৎ শিরশির করে উঠল রানার শিরদাঁড়ার ভিতর ঠাণ্ডা একটা উত্তেজনার স্রোত।

কবির চৌধুরী!

টেলিভিশন সেটের পর্দায় আচমকা এই চেহারা দেখবে কল্পনাও করতে পারেনি রানা। বেশিক্ষণ না, বিশ সেকেন্ড পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল মুখটা অস্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে কয়েকটা কথা বলেই। পর্দা ব্ল্যাংক। বাড়ির পেছন দিকে চলে এল রানা। ওর মাথার মধ্যে ঘুরছে ব্রেন ওয়াশের কথা। নিশ্চয়ই টেলিভিশনের মাধ্যমে ব্রেন ওয়াশ করছে কবির চৌধুরী প্রফেসারের। বাইরে থেকে একপাক ঘুরল রানা বাড়িটার চারপাশ। প্রত্যেকটা দরজা জানালা বন্ধ। ফিরে এল পেছন দিকের একটা ড্রেন পাইপের কাছে। একটু টেনে ওটার শক্তি পরীক্ষা করে নিয়ে উঠতে শুরু করল ওপর দিকে। ডানদিকে ঝুঁকে ইস্পাতের ফলাটার সাহায্যে দু'মিনিটের চেষ্টায় খুলে ফেলল সে একটা বন্ধ জানালা। নিঃশব্দে ঢুকল রানা ঘরের ভিতর। কেউ নেই। দোতলার প্রত্যেকটা কামরা ঘুরে ফিরে দেখল সে। কেউ নেই। পুরু কার্পেট বিছানো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। সামনেই হলঘর। প্রফেসারের পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। তেমনি ঝুঁকে বসে আছেন টেলিভিশনের দিকে চেয়ে। কয়েক পা এগিয়েই ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল রানার। আরে! বাইরের রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে এখন টেলিভিশন পর্দায়। স্বল্পালোকিত জনশূন্য রাস্তা। যা ভেবেছিল তাই—প্রহরার ব্যবস্থা নেই, কারণ যান্ত্রিকভাবে টের পাচ্ছে ওরা ওর গতিবিধি।

আর দু'পা এগিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পাঁই করে পিছন দিকে ঘুরল রানা। সেই ভোঁতা চেহারার লোকটা। দেয়ালে টাঙানো একটা একহাত লম্বা কুঠার খসিয়ে আনছে সে বামহাতে। বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। কুঠারটা হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াবার আগেই একলাফে পৌঁছে গেল রানা। নিঃশব্দে ঢুকে গেল স্টিলেটো লোকটার বামহাতের নিচ দিয়ে সোজা হৃৎপিণ্ড বরাবর। কেঁপে উঠল লোকটার শরীরটা। জোরে এক ঝাঁকুনি খেয়ে, ঝট করে ঘাড় ফেরাল পেছন দিকে—এতই জোরে যে কড়াৎ করে হাড় ফুটল ঘাড়ের কাছে। বিস্মিত দৃষ্টিতে রানার দিকে চেয়ে রইল লোকটা তিন সেকেন্ড। হাত থেকে কুঠারটা পড়ল আগে, তারপর কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল সে হাঁটু মুড়ে উপাসনার ভঙ্গিতে। ততক্ষণে ফলাটা বের করে মুছে নিয়েছে রানা কোটের পিছনে।

'প্রফেসার ব্র্যান্ড!' ঝট করে ফিরল রানা। 'আপনার কোন···' মুখের কথা মুখেই আটকে গেল রানার। মুহূর্তে বুঝতে পারল নিজের ভুল। প্রফেসার যে স্বেচ্ছায় কবির চৌধুরীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে, এই কথাটা একবারো মনে আসেনি ওর। ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন সেট দেখছে—এর পরেও ব্র্যান্ডকে শত্রুপক্ষের লোক বলে ভাবতে পারেনি সে, কবির চৌধুরীর ছবিটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মে দিয়েছে ওর মনে যে প্রফেসারকে ব্রেন ওয়াশ করা হচ্ছে। আসলে ব্রেন ওয়াশ করা হচ্ছিল না ওর, পরবর্তী কমপন্থা কি হবে সেই আদেশ দেয়া হচ্ছিল। ঢাকার হেড কোয়ার্টারে ওর কার্ড ফাইলটা এবার লাল ক্রস চিহ্ন দিয়ে সম্মানের সঙ্গে তুলে দেয়া হবে অতীতের তাকে—সে ব্যাপারে

সন্দেহ নেই রানার মনে।

প্রফেসারের হাতে ধরা ছড়িটার দিকে চেয়ে রইল রানা, ছড়িটাও চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। ছড়ির মাথায় পরানো সাইলেন্সার পাইপটা চিনতে ভুল হলো না ওর। ওটা একটা রাইফেল।

'রেমিংটন সেভেন টোয়েন্টি ওয়ানের ব্যারেল,' মৃদু হেসে বলল ব্র্যান্ড। 'দুটো ·৩০০ ম্যাগনাম কার্ট্রিজ পোরা রয়েছে এতে।'

'হাতি শিকারের জন্যে চমৎকার।' নরম গলায় বলল রানা। আরও কিছু কথা শুনতে চায় সে ব্র্যান্ডের মুখ থেকে।

'কোণে গিয়ে দাঁড়াও!' ধমকে উঠল ব্র্যান্ড। 'দেয়ালের দিকে মুখ করে।'

খটকা লাগল রানার মনের মধ্যে। বিকেলে ঠিক এই গলায় তো কথা বলেনি প্রফেসার। স্বরে শুধু নয়, সুরেও সামান্য তফাৎ আবিষ্কার করল সে। কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বাড়াবার চেষ্টা করল।

'আমাকে যদি মেরে ফেলেন কিংবা দেরিও যদি করিয়ে দেন, মারা পড়বে আপনার মেয়ে। এবং সেজন্যে দায়ী থাকবেন আপনি নিজেই।'

আড়চোখে চেয়ে দেখল রানা, কোন প্রতিক্রিয়া নেই প্রফেসারের চেহারায়। ছড়িটা তেমনি ধরে রেখে একহাতে হুইল ঘুরিয়ে এগিয়ে আসছে। পা থেকে কোমর পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা। হুইল ছেড়ে দিয়ে কম্বলের নিচ থেকে একজোড়া হ্যান্ডকাফ বের করে আনছে সে। 'হাত-দুটো পিছন দিকে নিয়ে এসো।'

হাত পিছনে নিল রানা ঠিকই, কিন্তু যেই প্রফেসার হ্যান্ডকাফটা ওর হাতে পরাবার উপক্রম করল, অমনি হুইলচেয়ারের ফুটরেস্টের নিচে পা বাধিয়ে হ্যাঁচকা টান মারল ওপর দিকে। দুপ করে একটা ভারী আওয়াজ বেরোলো ছড়ির মুখ থেকে। ঝুরঝুর করে দু'জনের মাথার ওপর খসে পড়ল চুন-সুরকি ছাত থেকে। মেঝের ওপর ধড়াস করে উল্টে পড়ল হুইল চেয়ার। পাই করে ঘুরেই ডাইভ দিল রানা। চেয়ারটা উল্টে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটাকে ডিগবাজি খেয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে বোঝা গেল পঙ্গু তো নয়ই, রীতিমত বলিষ্ঠ লোকটা।

ছড়িটা রানার দিকে লক্ষ্য করে ধরার আগেই পৌঁছে গেল রানা, এক হাতে ব্যারেল ধরে শুয়ে শুয়েই প্রচণ্ড এক লাথি চালাল লোকটার পায়ের কব্জি লক্ষ্য করে। গোড়া থেকে কেটে দেয়া কলাগাছের মত দড়াম করে পড়ল লোকটা মেঝের ওপর ছড়িটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রানা, ছড়ির বাঁট দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে মারল লোকটার মাথার পেছনে। হেয়ার ট্রিগার—নিশ্চয়ই অ্যাডজাস্টমেন্টে কোন গোলমাল ছিল, ঝাঁকি খেয়ে দুপ করে ছুটে গেল দ্বিতীয় গুলিটা, তাপ অনুভব করল রানা হাতে, ঠুস করে একটা জানালার কাঁচ ভেদ করে বেরিয়ে গেল গুলি। দ্বিতীয়বার ছড়িটা ব্যবহার করতে গিয়েও থেমে গেল সে। মনে হচ্ছে একটাতেই কাজ হয়ে গেছে। পাঁজরের ওপর জোরে একটা লাথি মেরে দেখল, নড়ে না। পাশে বসে

চিবুকের কাছে নখ বসিয়ে দিয়ে চড়চড় করে টেনে তুলে ফেলল সে মুখোশটা। বুড়ো মানুষের ভাঁজ ভাঁজ মুখ, যে কেউ একবাক্যে বলবে লোকটার বয়স সত্তরের কম না—কিন্তু শরীরটা সতেজ এক যুবকের। প্লাস্টিক সার্জারি।

ব্যাপারটা কি? এমন কি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নেমেছে এবার কবির চৌধুরী, যার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার এবং অর্থব্যয়কে আতিশয্য বলে মনে হচ্ছে না ওর কাছে? এত প্যাঁচ আর এত কর্মকাণ্ডের পিছনে আসল উদ্দেশ্যটা কি? এরা সব গেলই বা কোথায়? চেহারাটা একবার দেখিয়েই ডুব দিয়েছে কবির চৌধুরী। কেন?

দরজা জানালা বন্ধ করে সার্চ শুরু করল রানা। সারা বাড়িতে প্রফেসার ব্র্যান্ড, বা ডক্টর ক্লিদারো বা আর কারও কোন পাত্তা নেই। রানার জন্যে ফাঁদ পেতে রেখে সরে গেছে ওরা। টিভির চ্যানেল এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখল সে, শুধু একটা চ্যানেলই ক্লোজড সার্কিট, বাকিগুলো সাধারণ আর দশটা টেলিভিশনের মতই।

দোতলার একটা ঘরে গোপন ক্যামেরা দুটো পেল রানা, ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ডের ফাঁক দিয়ে ছবি তুলছে রাস্তার। সিঁড়ির নিচে একটা তালা মারা ছোট্ট কুঠুরিতে পাওয়া গেল একটা ফটোগ্রাফিক ডার্করুম। নিখুঁতভাবে সাজানো রয়েছে সব যন্ত্রপাতি। সিংক, ওয়াশ-বেসিন তো রয়েছেই, ফিল্ম ডেভেলপার, ফটোগ্রাফিক পেপার, এনলার্জার, মাইক্রোডট ইকুইপমেন্ট, শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ; এবং কয়েক ধরনের ক্যামেরা রয়েছে ওয়ার্কিং টেবিলের ওপর। একটা দেয়াল-আলমারি খুলেই ছোট্ট শিস দিল রানা। রেডিও ট্র্যান্সমিটার। আলমারির ডালাটা খুলতেই একটা যন্ত্রের কাঁটা দুলে ওঠায় সেটার দিকে চোখ গিয়েছিল রানার, চারপাশে ঘুরে ফিরে এল দৃষ্টিটা সেই ডায়ালের ওপর। একশোর ঘরে স্থির হয়ে রয়েছে কাঁটা।

চিনতে পারল রানা যন্ত্রটা। এটা একটা আর ডি এফ। ট্র্যানজিস্টা-রাইজড্। সোজা ভাষায় বিশেষ কিছুর অবস্থান জানার জন্যে দিক-নির্ণয় যন্ত্র। বিশেষ কোন রেডিও সিগন্যাল পেলে সেটা কোন্ দিক থেকে এবং কতদূর থেকে আসছে বের করে ফেলা যাবে ডায়ালের দিকে চাইলে।

সুইচ অন করতে গিয়ে দেখল রানা অন্ করাই আছে ওটা। বীকনটা কোথায় আছে বোঝার চেষ্টা করল সে চার্ট দেখে। প্রথমটায় কিছুই বুঝতে পারল না রানা। ব্যাপারটা কি? কাঁটার অবস্থান দেখে বোঝা যাচ্ছে এই বাড়ি থেকেই আসছে সিগন্যাল। এক পা পিছিয়ে গিয়েই বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর চোখজোড়া। একটা ডায়ালের কাঁটা নেমে এল একশোর ঘর থেকে নব্বইয়ের ঘরে। আবার সামনে এগোতেই উঠে গেল একশোর ঘরে। কোন সন্দেহ নেই আর! রানা নিজেই বীকন!

বিদ্যুৎ চমকের মত এক ঝলকে সবটা ব্যাপার বুঝে ফেলল রানা। নিমেষে পেয়ে গেল অনেক প্রশ্নের উত্তর। বুঝতে পারল কিভাবে ওকে অনুসরণ করে

বিকেলে বোটহাউসে পৌঁছেছিল বেগ সিটির তাগড়া-জোয়ান বৃদ্ধরা। ডক্টর নিমেরী ফ্লেচারের ছদ্মবেশ ভেদ করে রানার আসল পরিচয় জেনে ফেলতে কেন ওদের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি, কেন কোটিপতি ক্রফোর্ড যখন বোটহাউস থেকে বেরোল, এক সেকেন্ড দ্বিধা না করে তাকেই আক্রমণ করে বসল ওরা। এখন পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে এক্স এল ফ্লুইড রয়ে গেছে ওর শরীরে রক্তের সঙ্গে। রানার অবস্থান ও কার্যকলাপ ওদের নখদর্পণে। ওয়াকিং টার্গেট!

আপাতত এ ব্যাপারে ওর করবার কিছুই নেই। আরেক দেয়ালে বসানো একটা ক্যাবিনেটে পাওয়া গেল মেকাপের সাজ সরঞ্জাম। অনেকগুলো মুখোশ রয়েছে এক পাশে। একেবারে জীবন্ত মানুষের মুখ মনে হয় দেখলে। একটা মুখোশ দেখে চমকে উঠল সে। একেবারে ওর নিজের চেহারা! কি করতে চায় ওরা রানার ছদ্মবেশ নিয়ে?

সব কিছুর একটা করে নমুনা সংগ্রহ করার প্রয়োজন বোধ করল রানা। পকেট থেকে একটা ওয়াটার-প্রুফ প্লাস্টিক ব্যাগ বের করে টপাটপ তুলে নিল যেটা যেটা পছন্দ। ফিরে এল ব্র্যান্ডের বেডরূমে। একটা ব্যুরো ড্রয়ারে গোটা কয়েক চিঠি পাওয়া গেল—কোনটা বৈজ্ঞানিক বন্ধুর, কোনটা ট্রিসার লেখা। এগুলো ব্যাগে পুরে ড্রয়ারটা বের করে মেঝের ওপর রাখল রানা। ফাঁকা জায়গায় যতদূর যায় হাত ঢুকিয়ে খোঁজাখুঁজি করতেই একটা কাগজ বাধল হাতে—টেবিলের গায়ে সেলোটেপ দিয়ে আটকানো। ছোট একটুকরো কাগজ, তার উপর আঁকাবাঁকা হাতে লেখা রয়েছে কোন সেফের কমবিনেশন।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে চাইল রানা। নিশ্চয়ই কোন ছবির পিছনে পাওয়া যাবে সেফটা। চার দেয়ালের চারটে ছবি সরিয়ে পাওয়া গেল না কিছুই। ঘরের আসবাব সরিয়ে, জায়গায় জায়গায় কার্পেট তুলে দেখল—নাহ্, নেই। এবার খাটটা টেনে সরিয়ে আনল রানা দেয়াল থেকে কয়েক ফুট দূরে, তারপর ব্যুরোটা সরাতেই চোখে পড়ল ওর সেফটা। এক হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল সে আয়রন সেফের সামনে।

প্রথমেই এল এক বান্ডিল কাগজপত্র, তারপর অসংখ্য ছবি ঠাসা একটা বড়সড় ম্যানিলা এনভেলপ। সব পুরানো, হলদেটে রঙ। চিঠিপত্রের তারিখ দেখে বোঝা গেল সবগুলোই উনচল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ সালের মধ্যে লেখা, ছবিগুলো নানান ধরনের—কোনটা কনফারেন্সের, কোনটা হিটলারের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণের, কোনটা ফ্যামিলি গ্রুপ—স্বস্তিকা আর জ্যাকবুটের ছড়াছড়ি। ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল রানা ওগুলো। তারপর টেলিভিশন সেটটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে পেছন দরজা দিয়ে।

মোবাইল গার্লকে অক্ষত অবস্থায় ভাসতে দেখে একটু অবাকই হলো সে। সাবধানে ডিনামাইটটা ডিসকানেক্ট করে উঠে পড়ল ডেকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল সে ঝোপঝাড় ছাওয়া সেই নির্জন বীচে। যেমন রেখে গিয়েছিল ঠিক সেই একই ভঙ্গিতে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে ট্রিসা কম্বল ঢাকা

অবস্থায়। শিশুর মত নিশ্চিন্ত নিদ্রা দেখে কেমন যেন মায়া লাগল রানার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সাবধান করল সে নিজেকে—তুমি জানো না ও সত্যি সত্যিই মাইকেল কলিনকে খুন করেছে কিনা, তবে তোমাকে যে লোভ দেখিয়ে নির্জন বীচে নিয়ে গিয়ে মরগ্যানের হাতে তুলে দিয়েছিল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কাজেই সাবধান!

ট্রিসার ঘুমন্ত দেহটা পাঁজাকোলা করে তুলে নেয়ার আগে ওর চিবুকের কাছটা ভালমত আঙুল বুলিয়ে দেখে নিল রানা। মুখোশের ছড়াছড়ি দেখে কে ঠিক কে বেঠিক সে ব্যাপারে বেদিশা হয়ে পড়েছে সে একেবারে। নকল নয়, এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে ওকে তুলে নিয়ে ফিরে এল সে মোবাইল গার্লে।

রাতটা খোলা সমুদ্রে কাটানোই নিরাপদ মনে করল রানা। ট্রিসাকে ডেকে একটা ইজিচেয়ারে শুইয়ে দিয়ে কাছেই ককপিটের একটা চেয়ারে বসে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখল সারাটা রাত। একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করল, আর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার চেষ্টা করল গোটা ব্যাপারটাকে।

ঠিক ভোর ছ'টায় সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করল রানা ফিলিপ কার্টারেটের সঙ্গে। প্রতিটি ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করল বিশদভাবে। এটাই নিয়ম—হঠাৎ কোন কারণে অ্যাকটিভ এজেন্টের মৃত্যু ঘটলে যেন কাজ বন্ধ না হয়ে যায়, যেন আরেকজনকে বদলি হিসেবে পাঠাতে কোন অসুবিধে না হয়।

রিপোর্টের মাঝপথেই হঠাৎ বাধা দিয়ে কথা বলে উঠলেন ফিলিপ কার্টারেট।

'তোমার রিপোর্ট পরে শুনছি, রানা। এইমাত্র একটা মেসেজ এসেছে সোহানা চৌধুরীর কাছ থেকে। পড়ছি, শোনো।' তিন সেকেন্ডের বিরতি, তারপর পিলে চমকে দেয়া খবর ভেসে এল বৃদ্ধের কণ্ঠে: 'ট্র্যান্সমিশন ৫০৯৭-এস। সকাল পাঁচটা পঞ্চান্ন মিনিট। সোহানা চৌধুরী রিপোর্ট করছেন, এই কিছুক্ষণ হলো ফিরে এসেছে প্যাট্রিসিয়া ব্র্যান্ড লি-বিউসে প্রজেক্টে কাজে যোগ দেবে বলে।'

সাধারণত কোন ব্যাপারে হকচকিয়ে যাওয়া রানার স্বভাব বিরুদ্ধ। যদি যায়ও, ওর মুখ দেখে সেটা বুঝবার সাধ্য খুব কম লোকেরই আছে—এমনই কন্ট্রোল ওর নিজের ওপর। কিন্তু এই মুহূর্তে উড়ে গেল সব কন্ট্রোল। দেখতে দেখতে হাঁ হয়ে গেল রানার মুখটা। বারকয়েক বিস্ফারিত চোখে চাইল সে একবার শর্টওয়েভ রেডিও সেটের, আর একবার ঘুমন্ত ট্রিসার দিকে।

প্যাট্রিসিয়া ব্র্যান্ড যদি লি-বিউসেতে থাকে তাহলে এই মেয়েটা কে!

দশ

নড়ে উঠল ইজিচেয়ারে শোয়া মেয়েটা। সামনে ঝুঁকে এল রানা। চোখ খুলেই রানাকে দেখে চমকে উঠল সে। জার্মান ভাষায় জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

'তার আগে তুমি কে বলো দেখি, সুন্দরী? কে তুমি?'

জল এসে গেল মেয়েটার চোখে। বাচ্চা মেয়ের মত ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'মেইন নেইম ইস্ট ট্রিসা। আইখ হ্যাব মিখ ভারলফেন...' গড় গড় করে বলে যেতে থাকল সে। 'আমার নাম ট্রিসা। হারিয়ে গেছি আমি। আর সবাই মরে গেছে। এদিকে আমেরিকান স্নেলজার দেখেছ? মেরে ফেলবে ওরা আমাকে, বাঁচাও।'

এর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই, বুঝতে পারল রানা। বিস্ফোরণের জোর ধাক্কা খেয়ে অতীতে চলে গেছে মেয়েটা।-একেবারে বাল্য জীবনে। তখনকার কোন বিশেষ স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওকে। অভিনয় যে করছে না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে একটা ইঞ্জেকশন দিল সে মেয়েটার বাম বাহুতে। ঘুমিয়ে পড়তেই পাঁজাকোলা করে তুলে শুইয়ে দিয়ে এল নিচের বাংকে।

গভীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে রানা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর আসবে প্যারিস থেকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে চারপাশে চাইল সে। সাগর ছেড়ে মাত্র দশ-বারো হাত উঠেছে সূর্যটা, আয়নার মত স্বচ্ছ জলে চোখ-ধাঁধানো প্রতিফলন। আবার সোহানা চৌধুরীকে কন্ট্যাক্ট করে বিশেষ কয়েকটা তথ্য সংগ্রহ করবার অনুরোধ জানিয়েছে সে ফিলিপ কার্টারেটের কাছে। ততক্ষণে কি কাজ কিছুটা এগিয়ে রাখবে সে? সিসির কাছাকাছি কোথাও ফেলবে নোঙর? চল্লিশ মাইল দূরে আছে সে এখন, কিন্তু মনটা কেন জানি টানছে সিসির দিকেই। মন বলছে, মস্ত কোন ঘাপলা রয়েছে ওই অ্যাকোয়াসিটিতে, ওইখানেই আড্ডা গেড়েছে এবার কবির চৌধুরী। এত কড়া পাহারার ব্যবস্থা যখন, নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু পাকিয়ে উঠেছে সিসির আশপাশেই।

ছোট্ট একটা কাশি দিয়েই চালু হয়ে গেল মোবাইল গার্লের টুইন ডিজেল ইঞ্জিন। ধীর গতিতে এগোল সিসির মাইল চারেক দূরের ছোট ছোট প্রবাল দ্বীপগুলো লক্ষ্য করে।

প্রফেসার ব্র্যান্ডের ব্যাপারটা রহস্যজনক। লোকটাকে সত্যিই ব্রেন ওয়াশ করা হচ্ছে, নাকি সে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করছে কবির চৌধুরীর সঙ্গে বুঝে নেয়া দরকার মনে করে আয়রন সেফ থেকে সংগ্রহ করা ছবি আর কাগজপত্রগুলো ঘেঁটেছে সে এতক্ষণ। কিন্তু পরিষ্কার হচ্ছে না কিছুই। গোটা কয়েক নক্সা পাওয়া গেছে পানির নিচ দিয়ে কিভাবে আক্রমণ করে ইংল্যান্ডকে পরাস্ত করা যায় তার। এত বছর পরও এটা আয়রন সেফে লুকিয়ে রাখবার কি অর্থ? এটা কি সেই পুরানোটা, নাকি নতুন করে আঁকা হয়েছে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে? যেসব আন্ডারওয়াটার যন্ত্রপাতির উল্লেখ দেখা যাচ্ছে—স্লেড, ট্র্যাকটর, টু-ম্যান সাবমেরিন—এসবের যন্ত্রাংশ এবং এর সবগুলোর প্রিন্সিপ্‌ল্‌ যে ছেচল্লিশ সালের আগে আবিষ্কার হয়নি সে ব্যাপারে রানা নিশ্চিত।

ছবিগুলোতেও যে রকম সাফল্যের আত্মতৃপ্ত হাসি দেখা যাচ্ছে, তাতে লোকটার সম্পর্কে কোন পরিষ্কার সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না।

প্রবাল দ্বীপের আড়ালে আড়ালে অতি সাবধানে শম্বুক গতিতে যতটা সম্ভব কাছে চলে এল রানা সিসির। আর সামনে এগোলেই রাডারে ধরা পড়ে যাবে সে। শেষ দ্বীপটার আড়ালে থেকে দাঁড়িয়ে নোঙর ফেলল। পানির নিচ দিয়ে চার মাইল সাঁতার কাটবার কথা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। কিন্তু উপায় নেই। অলক্ষ্যে ওই এলাকার কাছাকাছি যাওয়ার আর কোন রাস্তা নেই।

সিগন্যাল পেয়ে শর্ট ওয়েভ রেডিওর সামনে এসে বসল রানা। ফিলিপ কার্টারেট।

'সোহানার কাছ থেকে আবার মেসেজ এসেছে, রানা। লি-বিউসে ইনস্টলেশনে ঠিক পাঁচটা পঞ্চাশে উপস্থিত হয়েছে প্যাট্রিসিয়া ব্র্যান্ড। তোমার কথা মত ছ'টা দশে আমরা সোহানাকে নির্দেশ দিই ভালভাবে চেক করে দেখতে। সিকিউরিটি চীফ মেজর ফ্র্যান্সিস সালিভ্যান এবং ডক্টর ট্যালবটকে জানানো হয়েছে তোমার সন্দেহের কথা। ফলে থরো মেডিক্যাল চেকাপের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সামান্য ছুতো ধরে। রি-ওরিয়েন্টেশন সেশনে অলক্ষ্যে উপস্থিত ছিল সোহানাও। কোথাও কোন খুঁত নেই। সিকিউরিটি অফিসার, সাইকিয়াট্রিস্ট এবং সোহানা—তিনজনেই একটা ব্যাপারে একমত হয়েছে: এই মেয়েটা আসলেই প্যাট্রিসিয়া ব্র্যান্ড।'

কয়েক সেকেন্ড ভ্রূ কুঁচকে রেখে অনেকটা আপন মনেই বলল রানা, 'মনে হচ্ছে দু'জনেই আসল।'

'অর্থাৎ?' ক্যাঁক করে চেপে ধরলেন ফিলিপ কার্টারেট। 'পরিষ্কার বোঝা গেল না মন্তব্যটা। তুমি কি ব্যঙ্গ…'

কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তুমুল বেগে চালু হয়ে গেছে রানার মস্তিষ্ক। কি যেন আর একটু স্পষ্টতর হওয়ার জন্যে খোঁচাচ্ছে রানার মনের ভিতর। কোন একটা চিঠির একটা লাইন, কোন একটা ছবির একটা অংশ, কোন একটা ঘটনা, অস্পষ্ট কোন ইঙ্গিত— ধীরে ধীরে এর সঙ্গে ওর মিল খুঁজে পেয়ে আলাদা একটা ছবি ফুটে উঠেছে রানার মানস-পটে।

'ব্যঙ্গও নয়, সর্পও নয়, পাঁচটা মিনিট সময় দিন আমাকে চিন্তা করবার। আমিই কন্ট্যাক্ট করব আপনাকে! ওভার অ্যান্ড আউট।'

দ্রুতহাতে খুঁজে বের করল রানা ছবিটা। ওটার দিকে একনজর চেয়েই বুঝতে পারল সে কবির চৌধুরী বা ক্লিদারোর কাছ থেকে আড়াল করবার জন্যে রাখা হয়নি এগুলো গোপন সেফে। আসলে ট্রিসার কাছ থেকে আড়াল করতে চেয়েছে প্রফেসার ব্র্যান্ড এসব।

ছবিটা হিটলারের প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদের একটা গেট-টুগেদার পার্টিতে তোলা। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ। একটা রৌদ্রোজ্জ্বল ব্যালকনিতে কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। পেছনে দেখা যাচ্ছে তুষার ঢাকা আল্পসের

গিরিশৃঙ্গ। ছবিতে প্রফেসার ব্যান্ডকে খুঁজে বের করল রানা। সবার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উদাসীন, বিমর্ষ চেহারা। কালো একটা আর্মব্যান্ড দেখে অনায়াসে বোঝা যায় তার মন খারাপের কারণটা। এয়ার রেইডে মারা গেছে তার স্ত্রী কদিন আগে। কাছেই আড়াই বছরের ট্রিসা দাঁড়িয়ে। খুশিতে উদ্ভাসিত ওর মুখটা, চকচক করছে চোখ জোড়া, দুঃখের লেশমাত্র নেই চেহারার কোথাও। প্রথম দর্শনে আবছাভাবে খটকা লেগেছিল, এবার ভাল করে দেখল রানা ছবিটা। সত্যিই কি মেয়েটা ব্যান্ডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে? না তো। পাশের পরিবারটারই বেশি কাছে রয়েছে মেয়েটা। কম করে হলেও একফুট এদিক ঘেঁষে রয়েছে।

মোটাসোটা অথচ সুন্দরী এক মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশ ফিরে। আশ্চর্য মিল খুঁজে পেল রানা ট্রিসার সঙ্গে সেই মহিলার চেহারায়। দুজনেই স্বর্ণকেশী। মহিলার পাশে দাঁড়ানো চশমা পরা লম্বা লোকটাকে চিনতে একটুও কষ্ট হলো না রানার। প্রফেসার লটেনবাক। তার প্যান্টের পায়ের ফাঁক দিয়ে ছোট্ট একটা মুখের আধখানা দেখা যাচ্ছে। উঁকি দিচ্ছে মেয়েটা হাঁসিমুখে ট্রিসার দিকে। অবিকল ট্রিসার চেহারা!

মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে সবটা ব্যাপার। যমজ! প্রফেসার লটেনবাকের যমজ মেয়ে এ দুজন!

সেই অশুভ বৈজ্ঞানিক প্রতিভা। হিটলারের দক্ষিণ হস্ত—প্রফেসার লটেনবাক। সবার ধারণা ছিল ফুয়েরারের সঙ্গে বার্লিন বাংকারে মারা গিয়েছিল লটেনবাকও। কিন্তু একে দেখেছিল রানা রাঙামাটির সেই ধ্বংস-পাহাড়ে গবেষণারত কবির চৌধুরীর ডান-হাত হিসেবে। পাহাড়টা ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ার পর সবাই ধরে নিয়েছিল মারা পড়েছে ভিতরের প্রত্যেকে, নিশ্চয় করে বলার উপায় ছিল না কিছুই। কে জানে, বলা যায় না, হয়তো আজও বেঁচে আছে সেই পিশাচটা।

রানার মাথার মধ্যে খাঁজে খাঁজে মিলে যেতে থাকল তথ্যের পর তথ্য। ট্রিসার টুকরো কথা, প্রফেসার ব্যান্ডের চিঠিতে দুই এক লাইনে অতি অস্পষ্ট আভাস, অন্যান্য ডকুমেন্ট থেকে পাওয়া আবছা ইঙ্গিত—সবকিছুরই অর্থ পরিষ্কার হয়ে আসছে এখন। বোঝা যাচ্ছে: সরাসরি বাংকারের ওপর পড়েছিল একটা বোমা, ছিটকে দূরে গিয়ে পড়েছিল ট্রিসা, আগুন ধরে গিয়েছিল বাংকারে, ওর বাবা আর বোন ফ্রলিন আটকে গিয়েছিল ভিতরেই। নিশ্চয়ই অন্য বাংকারের সঙ্গে যোগ ছিল এই বাংকারের, গোপন পথ দিয়ে সরে গিয়েছিল লটেনবাক হয় ফুয়েরার নয়তো মর্টিন বোরম্যানের বাংকারে।

এদিকে অতটুকু বাচ্চা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ছোটাছুটি করেছে বার্লিনের রাস্তায়, সাহায্য চেয়েছে এখানে ওখানে। প্রফেসার ব্যান্ড ওকে আশ্রয় দেন, এবং পালিতা কন্যা হিসেবে সঙ্গে রাখেন। কিছুদিনের মধ্যে পালিতা শব্দটা উড়িয়ে দিয়ে কেবল কন্যা শব্দটা ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। আসল ব্যাপার মেয়েকে জানতে দেননি তিনি কোনদিন। প্যারিস কর্তৃপক্ষেরও

জানা সম্ভব ছিল না, কারণ শেষ যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞে জার্মানীর প্রায় সমস্ত রেকর্ডই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর ওদিকে ওর যমজ বোন বাপের সঙ্গে এদেশ থেকে ওদেশে পালিয়ে পালিয়ে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পেয়েছিল পাগল বৈজ্ঞানিক কবির চৌধুরীর কাছে। রাঙামাটির এক পাহাড়ের অভ্যন্তরে চলেছিল ওদের গোপন গবেষণা, তৈরি হচ্ছিল ক্ষমতা অর্জনের এক ভয়ঙ্কর মহাপরিকল্পনা। রানা ধ্বংস করে দিয়েছিল ওদের সবকিছু, কিন্তু মেয়েটি যে বহাল তবিয়তে বেঁচে বর্তে আছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

'সম্ভব,' রানার বক্তব্য শেষ হতেই ভেসে এল ফিলিপ কার্টারেটের কণ্ঠস্বর। 'আমার মনে হচ্ছে ঠিকই ধরেছ তুমি। সোহানার রিপোর্টের সঙ্গে অনেক কিছু মিলে যাচ্ছে।' সাইকিয়াট্রিস্টের টেপ থেকে সোহানা যা জানতে পেরেছে সংক্ষেপে রানাকে জানালেন বৃদ্ধ। কয়েক সেকেন্ড নীরব থেকে বললেন, 'বোঝা যাচ্ছে তোমার প্যাট্রিসিয়াই আসল, সোহানারটা ওর যমজ বোন। কিন্তু এতসব কর্মকাণ্ডের পেছনে আসল উদ্দেশ্যটা জানতে পেরেছি আমরা কতখানি? বুঝলাম, লি-বিউসের গবেষণার ব্যাপারে কবির চৌধুরী ইন্টারেস্টেড, আসল প্যাট্রিসিয়াকে সরিয়ে নিজের লোক ঢুকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আসলে কি চায় ও? একটা কিছু ঘনিয়ে আসছে ঠিকই, কিন্তু কি সেটা? না জানলে কি করে ঠেকাব ওকে?'

'সোহানাকে চব্বিশ ঘণ্টা লেগে থাকতে বলুন নকল প্যাট্রিসিয়ার পেছনে। মেজর সালিভ্যানকে বলুন যেন সব রকম সহযোগিতা দেয় ওকে। বাকিটুকু আমি দেখছি।'

'কি প্ল্যান করছ? কিভাবে খবর সংগ্রহ করবে ভাবছ?'

'সিসিতে গিয়ে।'

'কিভাবে যাবে ওখানে?'

'গোপনে। পানির নিচ দিয়ে। আমি বুঝতে পারছি, সবকিছুর মূল রয়েছে ওই অ্যাকোয়া সিটিতে। টুলন বা মাহমুদ বেগ সিটিতে যা ঘটেছে সেগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এসব থেকে কিছুই আঁচ করা সম্ভব হয়নি আমাদের পক্ষে। অনেকভাবে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছি আমরা ওদের, ছোটখাট হামলাও চালিয়েছে ওরা, ভেবেছি এবার বুঝি আসল ব্যাপারটার কাছাকাছি যেতে পারব, কিন্তু সম্ভব হয়নি। আমাদের অ্যাপ্রোচের মধ্যেই আসলে ভুল ছিল। ওরা সেই সুযোগটাই নিয়েছে। কবির চৌধুরী ডুব দিয়ে রয়েছে অ্যাকোয়া সিটিতে, দলবলকে বলেছে আমাদের অন্য কোথাও ব্যস্ত রাখতে, যাতে নীরবে নিশ্চিন্তে নিজের কাজ করে যেতে পারে সে। এইবার আসল জায়গায় হানা দিতে হবে আমাকে। দেরি হয়ে গেলে হায় হায় করা ছাড়া আর কোন রাস্তা থাকবে না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, মস্ত বিপদ ঘনিয়ে আসছে…আর দেরি করা যায় না।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ফিলিপ কার্টারেট, তারপর গলার স্বর নামিয়ে বললেন, 'ঠিকই বলেছ, রানা। যদি কিছু ঘটে, আগামী চব্বিশ ঘণ্টার

মধ্যেই ঘটবে সেটা।'

'কি করে জানলেন?'

'টপ সিক্রেট ইনফরমেশন এসেছে আমার কাছে। আগামীকাল সকাল দশটায় টেস্ট ফায়ারিং করা হচ্ছে। ওয়ারহেডটা বাদ দিয়ে পি, এইচ ও মিসাইল ছোঁড়া হবে অ্যাকিউরেসি টেস্টের উদ্দেশ্যে। ঠিক তার আগের দিন নকল প্যাট্রিসিয়া ব্যান্ডের কাজে যোগ দেয়া দেখে তাই মনে হয় না তোমার?'

যমজ বোনকে ট্রিসার বদলে রিসার্চ প্রজেক্টে ঢুকিয়ে দেয়া এক কথা, আর দলবল নিয়ে লি-বিউসের সীমানায় ঢুকে যা খুশি তাই করা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ—সবদিক থেকে অত্যন্ত কড়া পাহারা দেয়া হচ্ছে এলাকাটাকে। নিজে গিয়ে দেখে এসেছে রানা। পানির নিচে টহল দিচ্ছে দুটো সাবমেরিন, এলাকার চারপাশে ট্যাংক, কামান আর মেশিনগান নিয়ে বসে আছে সদা-প্রস্তুত সেনাবাহিনী। আকাশপথে যে আক্রমণ আসবে তারও উপায় নেই, রাডার-সংকেত পাওয়া মাত্র পঞ্চাশ সেকেন্ডের মধ্যে আকাশে উঠে পড়বে পঞ্চাশটা মিরেজ বিমান। কাজেই কবির চৌধুরী কিভাবে কি ক্ষতি করতে পারে এই রিসার্চ প্রজেক্টের, কিছুতেই মাথায় এল না রানার। তবু ফিলিপ কার্টারেট নকল ট্রিসার কাজে যোগদান এবং টেস্ট ফায়ারিং-এর মধ্যে যে সম্পর্কের যোগসূত্র দেখতে পাচ্ছেন, সেটা উড়িয়ে দেয়ার মত ব্যাপার নয়। উত্তরে সে শুধু বলল, 'হুম্।'

'নকল প্যাট্রিসিয়া ব্র্যান্ডকে অ্যারেস্ট করলে কেমন হয়?' জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ।

'আমি সেটা ভাল মনে করি না,' বলল রানা। 'যদি নিশ্চিত ভাবে জানা যেত যে ওকে গ্রেফতার করলেই ওদের সমস্ত দুরভিসন্ধি বানচাল হয়ে যাবে, তাহলে এটা করা যেত। ওরা আসলে কি চায় সেটা না জেনে কোন স্টেপ নিতে গেলে সেটা ফল্স্ স্টেপ হয়ে যেতে পারে।'

'বুঝলাম। কিন্তু তুমি যে ঝুঁকি নিতে যাচ্ছ, সেটাও আমার তেমন পছন্দ হচ্ছে না, রানা। তুমি নিজেই বলছ এখনও এক্স এল ফ্লুইড রয়ে গেছে তোমার রক্তের মধ্যে। ডক্টর গরমের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে সেটা খুবই সম্ভব, এই ফ্লুইড সম্পর্কে এখনও সবকিছু জানা যায়নি, সামান্য যেটুকু তোমার শরীরে রয়ে গেছে সেটা কতদিন পর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে তা বলা যায় না। এই অবস্থায়...'

'আর কোন বিকল্প আছে?' সরাসরি প্রশ্ন করল রানা। বৃদ্ধকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, 'অনর্থক বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া আমার স্বভাব নয়, মিস্টার কার্টারেট। কিন্তু এখন তো আর কোন উপায় আছে বলেও মনে হচ্ছে না। সময় নেই। এই পর্যায়ে রিপ্লেসমেন্ট সম্ভব নয়। কাজেই যাচ্ছি আমি।'

'তোমার কি মনে হয় এ ব্যাপারটা প্রাণের ঝুঁকি নেয়ার মত বিরাট কিছু?'

'ছোটখাট ব্যাপারে জড়ায় না নিজেকে কবির চৌধুরী।' গলার স্বর পরিবর্তন করল রানা। 'আমি বুঝতে পারছি আপনার অস্বস্তির কারণ। আমার

ব্যাপারে আপনি নিজেকে অনর্থক দায়ী ভাবছেন। ভেবে দেখুন, আপনি ডাকেননি, আমি নিজেই ছুটে গিয়েছি আপনার কাছে সাহায্যের জন্যে। আপনি আমাকে নিয়োগ করেননি, আমি এই অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করছি সরাসরি ঢাকা হেডকোয়ার্টারের হুকুমে। তারা ডেকে পাঠালে আজই হাত গুটিয়ে ফিরে যেতে হবে আমার দেশে—আপনি হাজার অনুরোধ করলেও আপনার হয়ে কোন কাজ করতে পারব না। কাজেই আমার যদি ভালমন্দ কিছু ঘটেও যায়, আপনার অনুশোচনার কিছুই নেই।'

'এত লম্বা বক্তৃতার পরেও মনটা সায় দিচ্ছে না আমার, রানা। যেহেতু জানি, তোমাকে ব্যবহার না করে আমার উপায় নেই, তুমি হাজার বললেও অনুশোচনার হাত থেকে রেহাই নেই আমার। যাই হোক, যেটা করতেই হবে করো, তবে দয়া করে এই বুড়োর মুখ চেয়ে বেশি বিপদের মধ্যে যেয়ো না। তুমি যদি সামান্য কোন ক্লু সংগ্রহ করতে পারো, ফিরে এসে আমাকে জানাও—দরকার হলে আমি প্যারাট্রুপার নামাব সিসিতে। বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝেছি। ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করব জড়িয়ে না পড়তে। থ্যাংকিউ। ওভার অ্যান্ড আউট।'

সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিল রানা শেষবারের মত। ওয়ালথারটার জন্যে মনটা কেমন করছে, কিন্তু ওটা রেখেই যেতে হচ্ছে ওকে—পানির নিচে কাজ হবে না পিস্তল দিয়ে, অনর্থক বোঝা বওয়া। খাপে পোরা স্টিলেটোটা বেঁধে নিয়েছে সে বাম বাহুতে, হাঙর তাড়াবার জন্যে পায়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে একটা হাতখানেক লম্বা ছোরা, আর একটা পিং পং বলের সমান গ্যাসবম্ব নিয়েছে পকেটে—এই ওর সম্বল।

রাবার স্যুট পরে নিয়ে ফ্লিপার বেঁধে নিল সে পায়ে, তারপর অ্যাকুয়ালাঙ সিলিন্ডার জোড়া পিঠে তুলে বেঁধে ফেলল স্ট্র্যাপ। মাউথপিসটা দাঁতে কামড়ে ধরে ঠিক প্রয়োজন মত অক্সিজেন যেন পাওয়া যায় সেজন্যে অ্যাডজাস্ট করল ভাল্ভ্ রিলিজ। তারপর নিঃশব্দে নেমে গেল পানিতে।

প্রায় খাড়া ভাবে নেমে গেছে প্রবাল দ্বীপের ঢাল। যত নিচে নামছে রানা ততই আঁধার হয়ে আসছে চারপাশ। পঁচিশ ফুট নিচে তল পাওয়া গেল। সিসির দিকে মুখ করে সহজ ভঙ্গিতে হাত-পা চালু করে দিল সে। অনেকদূর যেতে হবে, কাজেই তাড়াহুড়ো করবার কোন মানে হয় না। ফ্লিপার বাঁধা পা দুটো সহজ একটা ছন্দ পেয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই, তার সাথে তাল মিলিয়ে দু'হাতে পানি কেটে এগোল সে সমুদ্রের তল ঘেঁষে। বালির ওপর আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে উপরিভাগের ছোট ছোট ঢেউয়ের চলমান ছায়া। ঘাড় বাঁকিয়ে ওপর দিকে চাইল রানা। রুপোলী মুক্তোর মত ঝাঁকে ঝাঁকে বুদ্বুদ উঠে যাচ্ছে। আশা করল, ঢেউগুলোর আড়ালে ঢাকা পড়বে বুদ্বুদগুলো, চোখে পড়বে না কারও।

ঘটনাবিহীন একটা ঘণ্টা পার হয়ে গেল, একটানা সাঁতার কেটে চলেছে রানা। গোটাকয়েক অ্যাঞ্জেল ফিশের ঝাঁক দেখল সে, রঙচঙে বাটারফ্লাই

দেখল, ছোট ছোট অক্টোপাসের বাচ্চাকে সুড়ুৎ করে লুকোতে দেখল পাথরের আড়ালে; দেখল, শুঁড় নাড়ছে অ্যানিমোন—এসবকে কোন ঘটনা বলে মনে হলো না ওর। একবার একটা পর্তুগীজ ম্যান-অভ-ওয়ারের হাত থেকে বেঁচে গেল সে চট করে নিচু হয়ে বসে পড়ায়। হৃৎপিণ্ড বরাবর ধরে ফেললে মারা পড়ত, জানে রানা, তবু এটাকে ঘটনা বলে মনে হলো না ওর কাছে। ওর আসল মনোযোগ রয়েছে দূরের আবছা নড়াচড়ার দিকে। বিশাল, আবছা মূর্তিগুলোকেই যত ভয়।

সিসির কাছাকাছি এসে হঠাৎ থমকে ঘুরে দাঁড়াতে হলো ওকে। অতর্কিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন বামদিকে। তারপরই স্থির। ছ'হাত লম্বা একটা ব্যারাকুডা। রানাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে সে-ও। এতই কাছে, যে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা ওটার রাগত বাঘের চোখ, ঝকঝকে তীক্ষ্ণ দাঁত। পায়ের সঙ্গে বাঁধা ছোরাটা চলে এসেছে রানার হাতে। সে-ও রুখে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে কটমট করে চাইল মাছটার দিকে। আক্রমণ করবে, এমন ভাব দেখাল। কয়েক হাত তফাতে সরে গিয়ে রানাকে ভালমত পরীক্ষা করে দেখল বিশাল মাছটা, তারপর লোক সুবিধের নয় টের পেয়ে চলে গেল গভীর সমুদ্রের দিকে। আবার রওনা হলো রানা।

কিন্তু কয়েক মিনিট চলার পরেই আবার থমকে দাঁড়াতে হলো রানাকে। তবে কি দিক ভুল করে অন্য কোথাও চলে এল সে? ঢালু হয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে মাটি। ওর হিসেব অনুযায়ী পৌঁছে গেছে সে সিসিতে। তাহলে অ্যাকোয়া সিটিটা গেল কোথায়? সিসির দক্ষিণ আর পুব তীর জুড়ে তৈরি হচ্ছে অ্যাকোয়া সিটি, ব্রোশিয়ারে দেখেছে রানা। আশা করেছিল, অন্তত দুশো গজ দূর থেকেই টের পাবে সে, দেখতে পাবে তুমুল উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে চলেছে আন্ডার-ওয়াটার যন্ত্রপাতি নিয়ে একশো-দেড়শো ডাইভার। কিন্তু কোথায় কি? শুধু বালি আর পানি। অ্যাকোয়া সিটির কোন চিহ্নই নেই কোথাও। আরও গজ পঁচিশেক এগোতেই পাথুরে মাটি দেখতে পেল রানা, প্রায় খাড়া হয়ে উঠে গেছে ওপর দিকে।

লম্বা করে দম নিয়ে সিলিন্ডারের এয়ার সাপ্লাই বন্ধ করে দিল রানা, তারপর উঠতেই শুরু করল ওপর দিকে। কানের পর্দায় তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করতেই চট করে থেমে ডিকম্প্রেশনের জন্যে সময় দিল কয়েক সেকেন্ড। ব্যথা কিছুটা কমে আসতেই ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল আবার। থেমে গেল নাকটা পানির ওপর ভেসে উঠতেই।

গজ বিশেক তফাতে ডাঙা। চারপাশে চোখ বুলিয়ে কাছে-পিঠে চালু কোন বোট দেখতে পেল না সে। ডাঙার ওপর বিশাল প্রাসাদ দেখে বুঝতে পারল, দিক ভুল হয়নি ওর—এটাই মাহমুদ বেগের সিসি। বাড়িটার চারপাশে ঘন সবুজ ঘাস, এখানে ওখানে ফুলের কেয়ারি, মাঝেমধ্যে বিশাল ওক, উইলো, কোথাও বা পাম গাছ। বাম পাশে কয়েকটা জেটি দেখতে পেল রানা সাগরতীরে। একটা জেটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে ছোটখাট এক বার্জ, তার

ওপাশে দেখা যাচ্ছে মস্ত বড় একটা ঢেউটিনের ছাত দেয়া সেমি-পাকা গুদামঘর। দুটো হাইড্রোফয়েল বাঁধা রয়েছে একটা ঘাটে। জনা চারেক অ্যাকোয়ালাঙ-পরা লোক ফ্লিপার-বাঁধা পা ঝুলিয়ে বসে আছে কিনারায়। ডান পাশে প্রায় শ'দুয়েক গজ দূরে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ফ্ল্যাট-বোট। পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, ডেকের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পাকানো দড়ি, রাবার স্যুট, অ্যাকোয়ালাঙ, আন্ডার-ওয়াটার টর্চ, ফ্লিপার, ছোরা আর সিওটু স্পিয়ার গান। নীল ইউনিফর্ম পরা এক লোক রেলিঙে হেলান দিয়ে চেয়ে রয়েছে খোলা সমুদ্রের দিকে, বাম কাঁধে ঝুলছে একটা সাবমেশিনগান।

এত কাছে চলে আসা ঠিক হয়নি বুঝতে পেরে আবার ডুব দিল রানা। অ্যাকোয়াসিটি গেল কোথায়? কিছু না কিছু নমুনা তো অন্তত থাকবে। কোথায়? ডানদিকে সাঁতার কাটতে শুরু করল সে। পুবদিকটা দেখতে হবে। প্রায় মাইলখানেক গিয়ে ভেসে উঠল আবার। ডাঙা থেকে প্রায় পাঁচশো গজ দূরে। ডাঙার ওপর বিনকিউলার গলায় ঝুলানো সশস্ত্র প্রহরী। একটা জেটির ওপর গোটা কয়েক লাল রঙের আন্ডার-ওয়াটার স্লেড দেখতে পেল সে—স্পিয়ার-গান ফিট করা, চলে ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে। কাছেই একটা কমলা রঙের গোলাকার টু-ম্যান সাবমেরিন দেখতে পেল রানা। চিনতে কষ্ট হলো না, কারণ এর ব্লুপ্রিন্ট দেখেছে সে প্রফেসার ব্যান্ডের গোপন কাগজপত্রের মধ্যে। আরও অনেক যন্ত্রপাতি চোখে পড়ল ওর। ওয়েস্টিং হাউস, ডাইভিং সসার, রেনল্ড অ্যালুমিনট, একজোড়া পেরি সাবমেরিন। ডাঙার ওপর তীর থেকে সামান্য দূরে একটা স্টোরেজ হ্যাঙ্গারে বিরাট সব কাঠের বাক্স সাজানো রয়েছে থরে থরে—খোলা হয়নি এখনও।

নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যে আবার ডুব দিয়ে পশ্চিম দিকে চলল রানা। নিশ্চয়ই কাজ চলছে পশ্চিম দিকে, হয়তো ভুল ছাপা হয়েছিল ব্রোশিয়ারে। পশ্চিম দিকেও যখন বালি আর পানি ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না, এর মানেটা কি বোঝার জন্যে ভেসে উঠল সে।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার ডুব দিতে হলো ওকে। একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে একটা হাইড্রোফয়েল প্রায়। অটোমেটিক রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রহরী সামনে আর পেছনের ডেকে। মাথার ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল হাইড্রোফয়েলটা। পানির নিচে সুতো ঝোলানো পুতুলের মত দুলে উঠল রানার শরীরটা। ওটা থামল না দেখে আটকে রাখা দমটা ছাড়ল সে আধমিনিট পর। দেখেনি ওরা ওকে।

অসংখ্য অ্যালুমিনিয়াম আর গ্লাস টিউবিং দিয়ে বোঝাই হয়ে রয়েছে এদিকের ডকটা। এখানেও না-খোলা প্যাকিং বাক্সের ছড়াছড়ি। মোটমাট কম করে হলেও বিশ কোটি টাকার আন্ডার-ওয়াটার ইকুইপমেন্ট রয়েছে এখানে, আন্দাজ করল রানা। অথচ গত দেড়টা বছরে এক পাও এগোয়নি অ্যাকোয়া সিটির কাজ। এর মানে কি? কি চলছে তাহলে এখানে? কি পাহারা দিচ্ছে

এতগুলো সশস্ত্র প্রহরী? ডাঙায় উঠে দেখবে সে আর একটু ভাল করে?

সূর্যের দিকে চেয়ে ফিরে যাওয়াই সিদ্ধান্ত নিল সে। যতটুকু জানা গেছে, প্যারাট্রুপার নামানোর জন্যে ততটুকুই যথেষ্ট। খামোকা ঝুঁকি না নিয়ে ফিরে গিয়ে খবর দেবে সে ফিলিপ কার্টারেটকে। বেলা পড়ে আসছে, কেবিন ক্রুজারে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। খিদে লেগেছে ভয়ানক। ভয় হলো, একা একা জ্ঞান ফিরে পেয়ে কি করছে ট্রিসা কে জানে! এখন ফিরে যাওয়াই ভাল।

এয়ার সাপ্লাইটা চেক করে নিয়ে দিক ঠিক করল রানা চারদিকে নজর বুলিয়ে। তারপর ডুব দিয়ে সাঁতার শুরু করল অস্ট্রেলিয়ান ক্রলের ভঙ্গিতে! ডাইনে-বাঁয়ে আবছা, ধোঁয়াটে দেয়ালে একবার দু'বার গোপন আন্দোলন অনুভব করল রানা, কিন্তু রুখে দাঁড়াবার মত কাছে এল না কেউ। দুই ঘণ্টা বিশ মিনিট লাগল ওর ফিরতে। প্রবাল দ্বীপটা পেয়েই ওপরে উঠতে শুরু করল রানা পনেরো ফুট উঠে ডিকম্প্রেশনের জন্যে আধ মিনিট স্থির থেকে উঠে এল সে ওপরে।

নেই কেবিন ক্রুজার। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ট্রিসা সহ।

ভারী কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেল রানার কাঁধ। হাত বাড়িয়ে ধরল সে জিনিসটা। বড়সড় একটা কাঠের টুকরো। ধরেই বুঝতে পারল রানা, আর কিছু নয়, এটা মোবাইল গার্লেরই একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ।

চুরমার করে দেয়া হয়েছে মোবাইল গার্লকে।

এগারো

সিসিতে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই বুঝতে পারল রানা।

সিদ্ধান্ত নিতে বেশি সময় লাগল না ওর। কাল সকাল দশটায় টেস্টফায়ারিং। সময় নেই হাতে। কাউকে কিছু জানাবার উপায় নেই এখন। যা করবার রানাকেই করতে হবে। প্রথমে সিসিতে গিয়ে সবকিছু দেখেশুনে বুঝতে হবে কবির চৌধুরীর সত্যিকার উদ্দেশ্য, তারপর চেষ্টা করতে হবে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয়ার। অন্ধকার হাতড়ে কোন লাভ নেই—গিয়ে নিজের চোখে দেখতে হবে সব।

মিটার চেক করে দেখল রানা। সিলিন্ডারে যেটুকু অক্সিজেন আছে, বড়জোর মাইলখানেক পথ চলা যাবে। অর্থাৎ, তিনটে মাইল ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝে এগোতে হবে ওকে, তার পরের এক মাইল চলবে পানির নিচ দিয়ে।

দোয়াতের কালির মত কুচকুচে কালো পানি। ঘোলাটে একটা চাঁদ উঠেছে ঠিকই, কিন্তু এতই নিচে রয়েছে যে দিক নির্ণয় ছাড়া আর কোন সাহায্য ওটার কাছ থেকে আশা করা বৃথা। দেরি না করে রওনা হয়ে গেল

রানা। ফ্রী-স্টাইলে সাঁতার কাটছে সে এবার। মুখটা একবার চলে যাচ্ছে পানির নিচে, আবার ডানহাতটা ফেলার সময় ওপরে উঠে 'হাপ' করে দম নিচ্ছে।

মেয়েটাকে কি মেরে ফেলল ওরা? নাকি ধরে নিয়ে গেল সিসিতে। যাবার সময় বোমা ফিট করেনি রানা মোবাইল গার্লে। যতদূর মনে হচ্ছে কোন রকম সুযোগ দেয়নি ওরা এবার, দেখামাত্র হাইড্রোফয়েল থেকে রিকয়েললেস রাইফেল দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে মোবাইল গার্ল। সেক্ষেত্রে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা ট্রিসার খুবই কম। অবশ্য যদি ট্রিসাই ওদের রেডিও সিগন্যাল দিয়ে মোবাইল গার্লের অবস্থান জানিয়ে থাকে তাহলে আলাদা কথা।

দ্বিগুণেরও বেশি সময় লাগবে এবার সিসি পৌঁছতে, বুঝতে পারল রানা। বাতাস উঠেছে সাগরে। এক মানুষ সমান ঢেউ হাজার শিং তুলে নাচছে সাগরময়। এই ঢেউয়ের মন-মেজাজ লক্ষ করে এগোতে হচ্ছে ওকে, নইলে পানি খেয়ে ঢোল হয়ে যাবে পেট। পথ আর ফুরোবে বলে মনে হচ্ছে না। দু'ঘণ্টা একটানা সাঁতার কেটেও সিসির কোন নাম নিশানা দেখতে পাচ্ছে না সে। বাকি আছে বহুদূর। হঠাৎ হঠাৎ আতঙ্ক এসে ভর করতে চাইছে ওর মনে। মনে হচ্ছে হারিয়ে গেছে সে, কোনদিন তীরে পৌঁছতে পারবে না আর, এমনি সাঁতার কাটতে কাটতে অবসন্ন হয়ে ডুবে যেতে হবে ওকে সাগরের অন্ধকারে। ছলাৎ—শব্দ করে ফ্লাইংফিশকে পানির ওপর লাফিয়ে উঠতে দেখে মনে হচ্ছে হাঙর বুঝি।

ভয় কিভাবে দূর করতে হয় সে ব্যাপারে ট্রেনিং পেয়েছে সে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে—কিন্তু অবসাদ? সারা দিনের না খাওয়া শরীর আর চলতে চাইছে না কিছুতেই। ক্লান্তিতে ঘুম এসে যেতে চাইছে। তবু অবসন্ন হাত টেনে চলল সে পানির মধ্যে দিয়ে—একবার বাম, একবার ডান, একবার বাম, একবার ডান। এখন হাল ছেড়ে দিলেই মৃত্যু।

চকচকে তারাগুলোকে খানিকটা নিষ্প্রভ করে দিয়ে বেশ অনেকটা ওপরে উঠে পড়েছে চাঁদ। এক ফুট দুই ফুট করে ঝাড়া সাড়ে তিন ঘণ্টা সামনে এগিয়ে সিসির বাতি দেখতে পেল রানা। ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে বাতিগুলো। বিশাল জাহাজের মত আবছা দেখা যাচ্ছে মাহমুদ বেগের প্রাসাদ। মাঝে মাঝে দপ্ করে জ্বলে উঠছে সার্চলাইট। যতদূর দেখা যায় দেখে নিয়ে নিভে যাচ্ছে।

মাইলখানেক থাকতে মাউথপিস্টা দাঁতে কামড়ে ধরে এয়ার সাপ্লাইয়ের চাবি খুলে দিয়ে ডুব দিল রানা। ঢেউয়ের অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। আশ্চর্য আরাম লাগল ওর কাছে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে তলিয়ে যেতে। কয়েক ফুট নামতেই ঘনিয়ে এল গাঢ় অন্ধকার। কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না, এমন কি নিজের হাতও না। পায়ে মাটি ঠেকতেই ধীর ছন্দে সাঁতার কাটতে শুরু করল রানা। আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেল সে সিসির পাথুরে ঢালের কাছে। এবার আর সোজা ওপর দিকে না উঠে ঢাল বেয়ে উঠে

আসতে শুরু করল সে। পা দুটো চলছে সমান তালেই, কিন্তু হাত দুটো এখন আর সাঁতার কাটছে না—পাথরের গা ছুঁয়ে উঠে আসছে সে ওপর থেকে।

এয়ার সাপ্লাই প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে এসেছে বুঝতে পারছে রানা। কষ্ট হচ্ছে শ্বাস নিতে। ভাগ্যিস মাঝ পথে শেষ হয়নি। তাহলে মহা বিপদ হত। শরীরের ওপর পানির চাপ অনেক কমে এসেছে দেখে বুঝতে পারছে সে, আর বড় জোর দশ ফুট ওপরেই রয়েছে মুক্ত বাতাস। শেষবারের মত বুক ভরে দম নিয়ে শ্বাস আটকে রাখল রানা। ডাঙার এত কাছে এসে ভুড়ভুড়ি ছাড়া ঠিক হচ্ছে না। রিলিজ ক্যাচ খুলে দিতেই পিঠের ওপর থেকে সিলিন্ডারটা আলগা হয়ে নেমে গেল সাগর-গভীরে।

শেষটুকু প্রায় খাড়াভাবে উঠে গেছে ওপর দিকে। এবড়োখেবড়ো পাথরগুলো কোনটা মসৃণ, আবার কোনটা চোখা। হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে ধরে উঠে আসছে রানা নিশ্চিন্তে—হঠাৎ মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল: সাবধান! কিন্তু সাবধান হওয়ার আগেই ডানহাতটা গিয়ে পড়ল ওর একটা তারের ওপর। টান লাগার সঙ্গে সঙ্গেই ছিঁড়ে গেল সরু তারটা, প্রচণ্ড একটা শক খেল সে, নাক দিয়ে বেরিয়ে গেল খানিকটা বাতাস, তারের মাথায় দেখতে পেল ছোট্ট ফুলকির মত ইলেকট্রিক স্পার্ক।

রানা কিছুটা সামলে নেয়ার আগেই মাথার ওপর কোথাও দপ করে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল ফ্লাডলাইট। পরমুহূর্তে ঝুপ করে কি যেন পড়ল পানিতে—কয়েক গজ ডাইনে। ওপরে চেয়েই চমকে উঠল রানা। কালো রাবার স্যুট পরা একজন লোক ডাইভ দিয়ে পড়েছে পানিতে। হাতে একটা বর্শা লাগানো সিওটু গান, আরও কয়েকটা বর্শা বাঁধা রয়েছে লোকটার পায়ের সঙ্গে। পায়ে ফ্লিপার তো রয়েছেই, আরও দ্রুত চলার জন্যে লোকটার পিঠের ওপর রয়েছে একটা কম্প্রেস্‌ড্ এয়ার স্পীড প্যাক। তীরবেগে ছুটে আসছে লোকটা ওর দিকে।

লোকটা প্রস্তুত হওয়ার আগেই ওর কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করল রানা, লাফ দিল ওপর দিকে, প্রাণপণে নাড়ল পায়ে বাঁধা ফ্লিপার দুটো। কিন্তু না, থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে লোকটা, সিওটু গান তাক করছে ওর দিকে। অন্তত সাত ফুট দূরে রয়েছে লোকটা। রানা বুঝল পৌঁছবার আগেই টিপে দেবে সে ট্রিগার। কাজেই চট করে ডিগবাজি খেয়ে গোল হয়ে গেল সে। টার্গেট যত ছোট করে আনা যায় ততই মঙ্গল। এরপরেও যদি বর্শা এসে হৃৎপিণ্ড বরাবর বেঁধে, বিঁধবে—করবার কিছুই নেই ওর। গ্যাস এক্সপ্লোশনের ধাক্কা অনুভব করল সে কোমরের কাছে, পরমুহূর্তে ঠিক যেন একটা ছড়ির আঘাত পড়ল ওর পিঠে। মিস্ হয়েছে! চকচকে বর্শাটা দেখতে পেল রানা। ঝিক করে উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল নিচের দিকে। ব্যারেলের মধ্যে আর একটা বর্শা ভরছে লোকটা ব্যস্ত হাতে।

প্রাণপণে চার হাত-পা চালিয়ে ওপরে উঠে এল রানা। দম আটকে রাখায় শর্ষেফুল দেখতে শুরু করেছে সে চোখে। লোকটা সরে যাওয়ার চেষ্টা করল,

কিন্তু উঠে এসেছে রানা ততক্ষণে। স্টিলেটোটা বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। হাত চালাল রানা। পানির নিচে নড়তে চাইছে না হাত। স্লোমোশন ছায়াছবির মত ধীরগতিতে ছুরিটা এসে ঠেকল লোকটার পেটের কাছে রাবার স্যুটের গায়ে, সামান্য একটু বাঁকা করে ওপর দিকে চাপ দিতেই বিনা বাধায় আলগোছে ভিতরে ঢুকে গেল পুরোটা ফলা। যন্ত্রণায় বাঁকা হয়ে গেল লোকটা, মাছের মত এঁকেবেঁকে মোচড়াচ্ছে। ছুরি যেখানটায় বিঁধেছে সেখান থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করেছে। নিচের দিকে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে চড়চড় করে ইঞ্চি চারেক রাবার ফেড়ে দিয়ে একটানে বের করে আনল রানা স্টিলেটোটা। এবার কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যাচ্ছে চারপাশ। খানিকটা সরে এল রানা, দেখল ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরিয়ে আসছে লোকটার পেট থেকে রক্ত, ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে শরীরটা নিচের দিকে।

আরও কেউ আছে? চারপাশে নজর বুলাল রানা। না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। টলতে টলতে পাথুরে পাড় বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল সে। শরীর আর চলতে চাইছে না। বাতাস, বাতাস চাই! বুকটা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। নিজের অজান্তেই ঢক্ করে একঢোক নোনা পানি খেয়ে ফেলল সে। খেয়েই সচকিত হয়ে একত্রিত করল সমস্ত মনোবল—তীরে এসে তরী ডোবালে চলবে না। আর মাত্র কয়েক ফুট, উঠতেই হবে ওকে ওপরে। শেষমুহূর্তে আর সহ্য করতে না পেরে পাথরের গায়ে পা বাধিয়ে সোজা ওপর দিকে লাফ দিল সে।

জোর ধাক্কা খেল রানা কাঁধে, রাবার থাকায় ততটা লাগল না। চট করে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল সে কাঠের থামটা। একটা জেটির নিচে ভেসে উঠেছে সে। থামটা আঁকড়ে ধরে বুক ভরে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিল সে দু'মিনিট, তারপর ঘাটের কাছে সরে এল। শুধু নাকটা ভাসিয়ে রেখে ঢালু পাড়ের গায়ে শুয়ে আরও তিন মিনিট বিশ্রাম করে নিয়ে পায়ের ফ্লিপার আর অ্যাকুয়ালাঙ খুলে ফেলল। চারপাশে চেয়ে আর কোন লোক দেখতে পেল না রানা, কিন্তু আবছাভাবে একটা ঝিঁঝির মত ডাক কানে এল ওর। নিশ্চয়ই অ্যালার্ম বেল। ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে গেল সে জেটির একপাশে ছোট্ট একটা ঘরের দিকে।

একাই ছিল প্রহরীটা, নিশ্চিন্তে সিগারেট টানছিল, অ্যালার্ম বাযার বেজে উঠতেই আধ-খাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে রেখে গিয়েছিল অনুসন্ধান করতে। এখনও ধোঁয়া উঠছে ওটা থেকে। দেয়ালের গায়ে অ্যালার্মবোর্ড। কোন্টা বাজছে বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার, কিন্তু কিভাবে ওটার আওয়াজ থামাবে বুঝে উঠতে পারল না। ঠিক কোন্খানে তার ছিঁড়েছে বোঝার সুবিধের জন্যে প্রতি দশগজ পর পর আলাদা বেল বাজবার ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে ঠিক জায়গামত পৌঁছতে সময় না লাগে। এখানে এখন মাথা ঘামাবার সময় নেই, কাজেই প্লাগটা টেনে বের করে নিল রানা সকেট থেকে। সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল বাজনা। আর একটা সুইচ টিপতেই অফ হয়ে গেল

ফ্লাড লাইট।

নিঃশব্দ পায়ে বিরাট বাড়িটার দিকে এগোল রানা এগাছের আড়াল থেকে ওগাছের আড়ালে লুকিয়ে। বেশ কয়েকজন সশস্ত্র গার্ড দেখতে পেল সে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত, কেউ টহল দিচ্ছে দৃঢ় পদক্ষেপে। সবার চোখ বাঁচিয়ে সামনে এগোনো সহজ কথা নয়। কখনও হেঁটে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, আবার কখনও সটান ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে এগোতে হচ্ছে ওকে। থামতে হচ্ছে বার বার। এইভাবে আধঘণ্টা লেগে গেল ওর প্রাসাদের পেছন দিকে পৌঁছতে। জানালা দরজা সব বন্ধ। একের পর এক পাঁচটা জানালার পেছনে পনেরো মিনিট ব্যয় করবার পর ষষ্ঠ জানালার ফাঁকে স্টীলের ব্লেডটা ঢোকাতেই খুট করে খুলে গেল ক্যাচ। কান পাতল রানা। কোথাও কোন অ্যালার্ম বেল বাজছে না সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে আস্তে করে খুলে ফেলল সে একটা কপাট। গিলটি মিঞার মত নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ডাইনিং হল। খাওয়া দাওয়া শেষ, ফাঁকা টেবিল চেয়ার পড়ে আছে কেবল। পেটের ভিতর মোচড় দিয়ে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দিল পাকস্থলীটা। চট করে রান্নাঘরের দিকে চোখ গেল রানার। সুযোগ পেলে খুঁজেপেতে চারটে খেয়ে নিতে হবে, স্থির করল সে। কিন্তু তার আগে পুরোটা বাড়ি ঘুরে অবস্থা বুঝে নিতে হবে।

আশ্চর্য! কোথাও কেউ নেই। একেবারে শূন্য এত বড় বাড়িটার গোটা একতলা।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল রানা। দোতলাও খালি। সব ঘর দেখে তেতলায় ওঠার সিঁড়িতে পা দিয়ে হঠাৎ একটা বন্ধ দরজার দিকে চোখ পড়তেই থেমে দাঁড়াল সে। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলেই চমকে উঠল। একটা চেয়ারে দরজার দিকে মুখ করে বসে আছে এক বৃদ্ধ। হাত-পা বাঁধা রয়েছে চেয়ারের সঙ্গে। মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের কাছে। একনজরেই চিনতে পারল রানা, মাহমুদ বেগ। মরে গেল নাকি! তিন পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল মাহমুদ বেগকে চমকে সোজা হয়ে চাইতে দেখে।

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মাহমুদ বেগের লালচে মুখটা। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাইল রানার হাতে ধরা স্টিলেটোর দিকে, তারপর হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

'তোমার পায়ে পড়ি! এইভাবে না! প্লীজ!...গুলি করে মেরে ফেলো!' রানাকে এগিয়ে আসতে দেখে চোখ বুজে শিউরে উঠল লোকটা। ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে হাত-পায়ের বাঁধন কাটা হচ্ছে টের পেয়ে আবার চোখ মেলল মাহমুদ বেগ। 'কে...কে তুমি!'

'আর সবাই কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা নিচু গলায়। 'কাউকে দেখছি না কেন?'

'ওরা...ওরা সব কাজে নেমে গেছে...তুমি কে?'

'মরতে বসেও মিথ্যে কথা!' ধমকে উঠল রানা। 'নিজের চোখে দেখে

এসেছি আমি। অ্যাকোয়াসিটির এক ধাপ কাজও হয়নি কোথাও। কোথায় গেছে সব? আপনাকেই বা বন্দী করে রাখা হয়েছে কেন? কবির চৌধুরীর সঙ্গে খাতির শেষ?'

আপাদমস্তক দেখল লোকটা রানাকে। বুঝতে পারল এই লোক এইমাত্র বাইরে থেকে এসেছে, এখানে কি চলছে কিছুই জানে না। রাবার স্যুট দেখে আঁচ করে নিল প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সমুদ্রের নিচ দিয়ে এসেছে এ এখানে।

'আপনি গভমেন্টের লোক?' রানাকে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিতে দেখে বলল, 'তাহলে এক্ষুণি ট্রুপস ডাকার ব্যবস্থা করুন। অ্যাকোয়াসিটি হচ্ছে না এখানে।'

'কি হচ্ছে?'

'জানি না। মাটির নিচে কাজ চলছে। আমাকে ঢুকতে দেয়া হয় না। গত একটা বছর বন্দী জীবন যাপন করছি আমি এখানে। এতদিন হাত-পা বাঁধেনি, আশা দিয়ে রেখেছিল ওদের কাজ ফুরোলেই ছেড়ে দেয়া হবে; কিন্তু আজ আমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হয়েছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে ওদের কাছে, আজই আমার জীবনের শেষ রাত।'

'বাইরে খবর পাঠাবার কোন ব্যবস্থা আছে এখানে?'

মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। 'থাকলে এতদিন চুপচাপ বসে থাকতাম না। আপনার কাছে নিশ্চয়ই মিনি-অয়্যারলেস বা ওই জাতীয় কিছু আছে···ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে, এই মুহূর্তে আপনার খবর দেয়া উচিত—'

'আমার কাছে কিছুই নেই ওসব। আপনাদের এখানে একটা টেলিফোনও নেই বলতে চান?'

'নেই। থাকলে আমি গত একটা বছরে অন্তত একবার সুযোগ পেতাম বাইরে খবর পাঠাবার। কোন সুযোগ পাইনি। এ বাড়ি থেকে এক পা বাইরে বেরোবার উপায় নেই আমার।'

'মাটির নিচে কাজ চলছে বলছেন···ওরা আসা যাওয়া করে কোন্‌দিক দিয়ে? নিশ্চয়ই পথ আছে কোথাও?'

'আছে। কিন্তু আপনি একা কি করবেন? ওরা অনেক লোক। নিচে নামলেই ধরা পড়ে যাবেন।'

'কি ধরনের কাজ চলছে নিচে? কোন ধারণাই নেই আপনার?'

'কিচ্ছু না। চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চলেছে মাটির নিচে শুধু এইটুকু বলতে পারি। একদল যায়, একদল ফিরে আসে। এই কিছুক্ষণ হলো নিচে গেছে ডি-গ্রুপ, ফিরে আসবার সময় হয়েছে এ-গ্রুপের। আপনি নিচে নামলে—'

'তবু আমাকে নামতে হবে। জানতে হবে কি চলছে নিচে। সম্ভব হলে ঠেকাতে হবে। ইতিমধ্যে আপনার নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা? লুকোবার কোন জায়গা আছে?'

'আছে। কিন্তু কতক্ষণ? দিনের পর দিন তো আর লুকিয়ে থাকা যায় না।

এমন একটা জায়গা আছে যেখানে লুকোলে কারও সাধ্য নেই আমাকে খুঁজে বের করে, কিন্তু না খেয়ে—'

'সেইখানেই লুকিয়ে পড়ুন,' হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল রানা মাহমুদ বেগকে। 'আগে আমাকে নিচে নামার পথটা দেখিয়ে দিন। কাল সকাল দশটার মধ্যে যদি আমি উঠে না আসি, প্যারাট্রুপার নামবে এই অঞ্চলে, তখন আপনি নিশ্চিন্তে বেরিয়ে আসতে পারবেন লুকোনো জায়গা থেকে। কিন্তু সবচেয়ে আগে আমার কিছু খাওয়া দরকার···রান্না ঘরে পাওয়া যাবে না কিছু?'

'আসুন আমার সঙ্গে।' রানাকে নিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল মাহমুদ বেগ একতলায়। একটা প্লেটের ওপর ফ্রিজ থেকে কিছু ঠাণ্ডা খাবার তুলে দিয়ে বলল, 'চলুন, আপনাকে নিচে নামার জায়গাটা দেখিয়ে দিই। এখন একটু তাড়াতাড়ি না করলে এসে পড়বে এ-গ্রুপ।'

খেতে খেতে এগোল রানা। হলরুমের একটা দেয়ালের গায়ে বসানো ওয়াইন-ক্যাবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল মাহমুদ বেগ। 'এই দেয়ালটা ছিল না আগে। ওরাই বানিয়েছে! আরও ছ'ফুট লম্বা ছিল হলটা, কিন্তু বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। আর এই যে ওয়াইন-ক্যাবিনেটের কড়া দেখছেন—' ডান দিকের কড়াটা বাঁয়ে তিন প্যাঁচ, আর বাম দিকের কড়াটা ডাইনে তিন প্যাঁচ দিয়ে আস্তে টান দিতেই ফাঁক হতে শুরু করল দরজা। 'এইভাবে খুলতে হয়। ওপাশে লোহার সিঁড়ি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বন্ধ করে দিল রানা ডালা দুটো। 'এবার আপনি লুকিয়ে পড়ুন। এ-গ্রুপ ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমিও, তারপর নামব নিচে। ওরা বেরিয়ে প্রথমে কোনদিকে যাবে?'

'সোজা ডাইনিংরুম হয়ে চলে যাবে নিজেদের কোয়ার্টারে। তেতলাটা ব্যারাক বানানো হয়েছে ওদের।'

রানার খাওয়া প্রায় শেষ। উচ্ছিষ্টটুকু গারবেজ-বাস্কেটে ফেলে যথাস্থানে রেখে দিল প্লেটটা। মাহমুদ বেগকে ডাইনিং রুমের কোণে দাঁড় করানো একটা কাঠের মূর্তির দিকে এগোতে দেখে মৃদু হাসল সে। মূর্তির আড়ালে লুকোতে চায় ব্যাটা। হলরুমের দিক থেকে খটাং করে একটা আওয়াজ আসতেই একছুটে চলে গেল মাহমুদ বেগ মূর্তিটার কাছে। রান্নাঘরের চারপাশে চেয়ে লুকোবার জায়গা খুঁজল রানা। বিশাল ফ্রিজিডিয়ারের ওপাশটা মনে মনে পছন্দ করে আবার মূর্তির দিকে চেয়েই চমকে উঠল সে। মাহমুদ বেগকে দেখা যাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু তার ড্রেসিং-গাউনের একাংশ বেরিয়ে রয়েছে বাইরে। ওদিকে কারও চোখ পড়লে আর রক্ষা নেই! এখন আর সাবধান করবারও রাস্তা নেই। ডাইনিং রুমের দরজার কাছে চলে এসেছে পায়ের শব্দ—সেই সঙ্গে কথাবার্তার আওয়াজ। ওরা সংখ্যায় ক'জন জানবার কৌতূহল দমন করে সরে এল রানা ফ্রিজের আড়ালে।

তিনমিনিট পর প্রায় মিলিয়ে গেল পায়ের শব্দ আর কথাবার্তার আওয়াজ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেছে ওরা তেতলায়। দরজার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে ড্রেসিং গাউনের অংশটা দেখতে পেয়ে হাঁপ ছাড়ল রানা—যাক, চোখে পড়েনি কারও। চারপাশে চোখ বুলিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে কাঠের মূর্তির কাছে চলে এল সে, কাপড়ের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে এগোল হলরুমের দিকে।

তিনধাপ লোহার মই বেয়ে ওয়াইন-ক্যাবিনেটের দরজা লাগিয়ে দিল রানা। বারোফুট নামতেই পাওয়া গেল একটা উজ্জ্বল-আলোকিত আটফুট চওড়া প্যাসেজ। প্যাসেজ ধরে ঠিক বিশ কদম যেতে না যেতেই পেছন থেকে গর্জে উঠল কে যেন: 'হল্ট!'

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। ডান হাতে চলে এসেছে স্টিলেটো। প্রস্তুত।

চোখের সামনে যা দেখল তাতে পিন ফোটানো বেলুনের মত চুপ্‌সে গেল রানা। স্টিলেটোটা ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে মাথার ওপর তুলল দুই হাত।

বারো

যদি দু'জন হত, এমন কি যদি চারজনও হত, শেষ চেষ্টা করে দেখত রানা। কিন্তু দুই সারিতে বারো দুগুণে চব্বিশজন মাস্ক পরা লোককে কাবু করা ওর সাধ্যের অতীত। সামনের লোকটাকে নিয়ে পঁচিশজন। একটা সাবমেশিনগান রানার বুকের দিকে তাক করে ধরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা।

এতগুলো লোক হঠাৎ কোত্থেকে এসে হাজির হলো? চট করে চোখ গেল রানার দেয়ালের গায়ে আধখোলা একটা ভেন্টিলেশন টানেলের দিকে। প্যাসেজের দেয়ালগুলোর মতই পালিশ করা জিংকশীটের তৈরি ওটা—ওই ফাঁক দিয়েই বেরিয়ে এসেছে লোকগুলো।

'হাত দুটো উঁচু রেখে ধীর পায়ে এগোও আমার দিকে,' হুকুম করল সাবমেশিনগানধারী।

ধীর পায়ে এগোল রানা। অস্পষ্ট একটা টুংটাং আওয়াজ এল ওর কানে। চট করে চোখ তুলে পেছনে দাঁড়ানো দলটার দিকে চাইল সে। নিমেষে কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। লীডারের সঙ্গে পেছনের লোকগুলোর তফাৎ এতক্ষণ চোখেই পড়েনি ওর। প্রথমত, একমাত্র লীডারের কাছেই অস্ত্র রয়েছে, আর কারও কাছেই নেই। দ্বিতীয়ত, দুই সারির চব্বিশজন লোকের প্রত্যেকেরই হাত দুটো রয়েছে পেছন দিকে। তৃতীয়ত, পরনে রাবার স্যুট রয়েছে প্রত্যেকেরই, মাস্ক আঁটা রয়েছে মুখে, কিন্তু ওদের স্যুটগুলো কমলা রঙের, লীডারেরটা কালো। লীডারের কোমরের বেল্টের সাথে ঝুলছে একটা আন্ডার ওয়াটার টর্চ, একটা দেড়ফুট লম্বা হান্টার, আর একগোছা চাবি।

প্রতিটা পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের মত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে রানার কাছে অনেক কিছু, একেবারে স্পষ্ট করে বোঝার জন্যে যে সময় দরকার চিন্তা করবার—সে সময় হাতে নেই, কিন্তু মোটামুটি সুনিশ্চিত হয়ে গেল রানা, ওর সামনে পঁচিশজন শত্রু দাঁড়িয়ে নেই। শত্রু আসলে একজনই, বাকি চব্বিশজন বন্ধু যদি নাও হয়, নিরপেক্ষ থাকবে অন্তত।

কাছাকাছি এসে ইচ্ছে করেই একটা হোঁচট খেল রানা। সামলে নেয়ার ভঙ্গি করল, পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ বেগে নেমে এল ওর ডান হাত লোকটার কাঁধের কোমল নার্ভসেন্টারের ওপর। খটাং করে পড়ল সাবমেশিনগানটা মেঝের ওপর। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। গলা পর্যন্ত ঢাকা হেলমেটের ভিতর থ্রোট মাইক থাকায় বিকট শোনাল চিৎকারটা। বিন্দুমাত্র দেরি না করে দড়াম করে লাথি চালাল রানা লোকটার তলপেট লক্ষ্য করে। মাস্কের কাঁচের ওপাশে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা দাঁতে দাঁত চেপে বিকৃত করে ফেলেছে লোকটা চোখমুখ, শরীরটা বাঁকা হয়ে গেল ওর, মাথাটা ঝুঁকে এল সামনের দিকে। দ্বিধার সময় নেই। ধাঁই করে মারল রানা লোকটার খুলির ঠিক নিচেই ঘাড়ের পেছনে। কড়াৎ করে শব্দ হলো একটা, ঝপ্ করে পড়ে গেল সে মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে।

চট করে সাবমেশিনগানটা হাতে তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়াল রানা বাকি চব্বিশ জনের বিরুদ্ধে, আক্রমণের ভাব দেখলেই গুলি করবে। কয়েক সেকেন্ড কেউ নড়ল না, তারপর সামনের একজন পাশ ফিরে মাথা ঝাঁকিয়ে ওর পেছনটা লক্ষ করতে বলল রানাকে। হ্যান্ডকাফ। রানা দেখল, হ্যান্ডকাফ পরানো আছে লোকটার হাতে, শক্ত শিকল দিয়ে একজনের হ্যান্ডকাফের সঙ্গে আরেকজনেরটা জোড়া। অস্ত্রধারী গার্ডের কোমর থেকে চাবির গোছাটা নিয়ে চট করে হ্যান্ডকাফ খুলে দিল রানা লোকটার। পাশেরজনেরটাও খুলতে যাচ্ছিল, মাথা নেড়ে নিষেধ করল সে। কব্জিদুটো একটু ম্যাসাজ করে নিয়ে মাথার ওপর থেকে অক্সিজেন রিব্রিদার খুলে ফেলল প্রথম জন। বেশ বয়স্ক, স্বাস্থ্যবান। বোঝা যায় ফ্রেঞ্চ।

রানা কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, চট করে ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল লোকটা, তারপর অপর হাতের তর্জনী দিয়ে দেখাল ভেন্টিলেটার-শ্যাফটের দিকে। রানাকে নিয়ে শ্যাফটের ভিতরে গিয়ে ওর কানে কানে ফিসফিস করে বলল, 'আমার নাম রয় সান্তানা···ফ্রেঞ্চ ডাইভার। নষ্ট করবার সময় নেই। সবখানে টিভি-মনিটর রয়েছে। সামনেই রয়েছে একটা, আর এক মিনিটের মধ্যে ওর সামনে দিয়ে যদি আমরা না যাই, সার্চ পার্টি পাঠানো হবে আমাদের খুঁজে বের করার জন্যে।' এদিক ওদিক চাইল লোকটা, মনে হলো গোপন মাইক্রোফোন রয়েছে কিনা দেখছে, তারপর বলল, 'এই লোকটার রাবার স্যুটটা পরে নিন, তারপর আমাদের আগে আগে চলবেন। কোনদিকে যেতে হবে, কি করতে হবে সব বলে দেব আমি। প্রত্যেকটা ওয়ার্ক-পার্টির লীডারের সঙ্গে দলের অন্য সবার যোগাযোগ রয়েছে বেনডিক্স্যারিন রেডিও

সিসটেমের মাধ্যমে, বাইরের কেউ শুনতে পাবে না আমরা আলাপ করলে। ব্যাটারিতে চলে। থ্রোট মাইক ব্যবহার করবেন। কামন। কুইক।'

ভেন্টিলেশন শ্যাফটের মধ্যে গার্ডের লাশটা নিয়ে এল দু'জন ধরাধরি করে। হেলমেটটা খুলেই অবাক হয়ে গেল রানা—আমাদের উপমহাদেশের লোক। কোন্ দেশী বোঝা গেল না। পোশাক বদলে নিতে আধ মিনিটের বেশি লাগল না। বেল্টের ওপর দুটো বোতাম দেখিয়ে রয় সান্তানা বলল, 'এই দুটো বোতাম টিপবেন না। সাদাটা টিপলে রিব্রিদারের বাইরে অ্যামপ্লিফায়েড হয়ে শোনা যাবে আপনার গলা, আর এই লালটা টিপলে মেইন কমিউনিকেশন সার্কিটের সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে আপনার। সিগন্যাল না দিলে কিছুতেই স্পর্শ করবেন না ওই লালটা।'

এক মিনিটের মধ্যেই রওনা হয়ে গেল ওরা। স্টিলেটোটা মাটি থেকে তুলে খাপে পুরে নিতে ভুলল না রানা। গার্ডের দেহটা শ্যাফটের একটা এয়ার টানেলের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে ওরা দু'জন মিলে। চট করে চোখে পড়বে না কারও। দুই সারিতে চলেছে বারো দুগুণে চব্বিশ জন, রানা চলেছে আগে আগে সাব মেশিনগান হাতে।

'এখানেই মনিটর।' রয় সান্তানার ধাতব কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা। 'দেখতে পাবেন না। লুকোনো। ডান হাতটা ওপরে তুলুন। বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি করুন। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। এর মানে আপনি ও. কে. সাইন দিলেন, সব ঠিক আছে। এইবার ডানদিকের শ্যাফটে ঢুকে পড়ুন।'

গোল টানেল। পালিশ করা জিংকের তৈরি। রানা টের পেল ধীরে ধীরে নামছে ওরা নিচের দিকে। চলতে চলতে যতদূর সম্ভব দ্রুত তথ্য দিয়ে চলল সান্তানা। জানা গেল, ওরা কিছুক্ষণ হয় ঢুকেছে টানেলে, কাছে যাচ্ছে, ভেন্টিলেশন সিসটেমের একটা ছোট্ট দোষ রিপেয়ার করবার জন্যে থেমেছিল। এয়ার সাপ্লাই কেটে দিতে হয়েছিল বলে সবাইকে রিব্রিদার করতে হয়েছিল, ভ্যাকিয়ুম টিউবের দিকে চলেছে বলে এগুলো আর খোলার দরকার নেই এখন।

'একটা প্রশ্ন,' বলল রানা। 'আপনাদেরকে অ্যাকুয়াসিটি তৈরির জন্যে কন্ট্র্যাক্ট করা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কি তৈরি করছি জানি না, শুধু জানি—এটা অ্যাকুয়াসিটি নয়। আপনি সরকারী লোক নিশ্চয়ই?'

'এক অর্থে বলতে পারেন। যদিও আমি ফ্রেঞ্চ নই, আপনাদের সরকারের অনুমতিক্রমেই এসেছি আমি এখানে কি ঘটছে জানতে।'

'কি ঘটছে জানি, কারণ আমরাই ঘটাচ্ছি,' বলল সান্তানা। 'কিন্তু কেন কি করছি কিচ্ছু জানি না। এক বছরের ওপর হয়ে গেল, আমাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে। ছিলাম দেড়শো জন, এখন আছি একশো বিশ জন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে আমাদের চোখের সামনে মেরে ফেলা হয়েছে বাকি ত্রিশজনকে। হুকুম ছাড়া পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই। এই যে,

আরেকটা মনিটর আসছে। আগের বার যা করেছেন, ঠিক তাই করুন আবার, তারপরই বাঁয়ে ঘুরতে হবে সামনের চৌমাথায়।'

যা যা বলা হচ্ছে সেইমত করতে করতে এগিয়ে চলল রানা। ক্রমে বাতাসটা গরম হয়ে উঠেছে। সান্তানার কাছ থেকে জেনে নিয়েছে সে, শত্রুপক্ষে প্রায় চল্লিশজন লোক রয়েছে, ডাইভারদের তিনভাগের এক ভাগ; কিন্তু প্রত্যেকটা ব্যাপারে যন্ত্রপাতির সাহায্যে ওদের এমনই বাঁধা বেঁধে নিয়েছে কবির চৌধুরী যে ওর অজান্তে নিশ্চিন্তে একটা হাঁচি পর্যন্ত দেয়ার উপায় নেই।

'আমরা মেইন কন্ট্রোলরুমের কাছে চলে এসেছি,' বলল সান্তানা। 'ঘাবড়াবার কিছুই নেই। যা বলব করে যাবেন, তাহলে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। একটা জায়গা জানা আছে আমার যেখানে বসে মন খুলে আলাপ করা যেতে পারে। কিন্তু শিফট শেষ করে না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না আমি,' বলল রানা। 'আপনাদের কারও আত্মীয়স্বজন নেই, বন্দী করে রেখে দিল ওরা এতগুলো লোককে, যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করল, যাকে খুশি মেরে ফেলল—অথচ কেউ কোন খোঁজ খবর পর্যন্ত করল না বাইরে থেকে?'

'কন্ট্র্যাক্ট সই করবার সময়ই ভুলটা করেছি আমরা। দুনিয়ার সবাইকে চমকে দেয়ার জন্যে গোপনে কাজ করবার কথা, দেড় বছরের মধ্যে কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারব না সেই রকম খত দিয়েই এসেছিলাম আমরা কাজে। তাই কেউ কোন খোঁজ নেয় না। মাঝে মাঝে আমাদের চিঠি লিখতে বলা হয় বাড়িতে। সে চিঠির প্রতিটা লাইন পড়ে দেখে ওরা। প্রয়োজন হলে আবার নতুন করে লেখায়। একটা বেফাঁস শব্দ লেখার উপায় নেই।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'প্রথম দেড়টা মাস আমরা মনে করেছিলাম সত্যিই বুঝি অ্যাকোয়াসিটি তৈরি করতে যাচ্ছি আমরা…হুড়মুড় করে যন্ত্রপাতি আসছে, ধুমধাম কারবার। তারপরই টের পেয়ে গেলাম আমরা কিসের পাল্লায় পড়েছি। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে, হাত-পা বাঁধা আমাদের। এইবার, সাবধান, এসে গেছি মেইন কন্ট্রোলরুমে।'

প্রকাণ্ড একটা ঘরে ঢুকল রানা তার লোক লস্কর নিয়ে। ঘরের ঠিক মাঝখানটায় একটা পুরু কাঁচের পার্টিশন। ওপাশে মনিটর, নানান সাইজের ডায়াল, ফ্ল্যাশিং কন্ট্রোল আর কয়েক সারি পুশবাটন দেখে রানার কাছে মনে হলো বিশাল কোন প্লেনের ককপিট দেখছে সে। একপাশে মস্ত এক কমপিউটার ইউনিট দেখে চট করে মনে এল ওর মিসাইল ট্র্যাকিং স্টেশনের কথা। পাশাপাশি পাঁচটা চেয়ারে বসে রয়েছে পাঁচজন লোক সার বেঁধে।

'ওই লম্বা লোকটা দেখছেন,' চাপা গলায় কথা বলে উঠল সান্তানা, 'একেবারে বাঁয়ে বসা—ওইটাই পালের গোদা।'

'চিনি আমি।' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'ওরই নাম কবির চৌধুরী।'

ওপাশের দেয়ালের গায়ে মস্ত বড় একটা কাঁচ বসানো। তার ওপাশে একটা সাবমেরিনের বিভিন্ন অংশে কাজ করছে অনেকগুলো টেকনিশিয়ান। তাদের সঙ্গে কথা বলছে কবির চৌধুরী একটা ইন্টারকমের সাহায্যে। ভোঁতা নাকের প্রায় গোলাকার সাবমেরিন বিশাল বাথটাবের মত দেখতে একটা পাত্রে বসানো রয়েছে। চারপাশ থেকে আট দশটা ক্রেন ওটার বিভিন্ন অংশ টেনে ধরে রেখেছে।

'অ্যাটমিক পাওয়ারড্ মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঠিক ধরেছেন। দেখছেন দেখেন, কিন্তু থামবেন না। বাঁ দিকের তৃতীয় এলিভেটর-শ্যাফটের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন আপনি আমাদের। ওইখানে ঢুকে আর এক স্তর নিচে নামতে হবে আমাদের। পালের গোদার পাশে বসা এক থুত্থুড়ে বুড়ো দেখতে পাচ্ছেন?' রানা দেখেছে এবং চিনেওছে। প্রফেসার ব্র্যান্ড। 'ওই হচ্ছে এটার আবিষ্কর্তা। কি এক অ্যাটমিক রিওস্ট্যাটের জোরে অনির্দিষ্টকালের জন্যে সমুদ্রের ছ'হাজার ফুট নিচ দিয়ে অনায়াসে চলাচল করতে পারে। এটা নিয়ে গর্ব করতে শুনেছি আমি ওদের। এটার মাথার ওপর নাকি মিসাইল ছোঁড়ার জন্যে ভার্টিক্যাল লঞ্চিংটিউব আছে। যে কোন সমুদ্রের দু'হাজার ফুট গভীরে থেমে দাঁড়াবে, রেডিও ফিক্স আর স্টার-ট্র্যাকার পেরিস্কোপের সাহায্যে টার্গেট-পিন ডাউন করা কিচ্ছু না—তথ্যগুলো মিসাইলের ব্রেনে ফিড করলেই হলো। তারপর একটা বোতাম টিপলেই কম্প্রেস্ড্-এয়ারের সাহায্যে ছুটল মিসাইল পানির মধ্যে দিয়ে। যেই পানি ছেড়ে ওপরে উঠবে, ওমনি ইগনিশন হবে সলিড-ফুয়েল রকেটে, আকাশে উঠেই আপনা থেকেই কোর্স কারেকশন হবে। ব্যস···যেখানে খুশি সেখানে, ভিড়িম্!'

এলিভেটরে উঠেও বকবকানি থামল না রয় সান্তানার। ডক্টর জিমি ক্লিদারোকেও দেখেছে রানা ব্র্যান্ডের পাশে। সবাই এখানে এসে হাজির হওয়া মানে পরিকল্পনার শেষ স্তরে চলে এসেছে ওরা, ঘনিয়ে এসেছে বিপদ। কিন্তু কি সেটা? সান্তানার কথা থেকে কিছুই বোঝা গেল না। শুধু জানা গেল যে যদিও প্রত্যেকটা জিনিসের নক্সা তৈরি করে দিয়েছে প্রফেসার ব্র্যান্ড, পদে পদে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছে লোকটা এদের কাজে, বার বার গোঁ ধরেছে অসহযোগিতার, বার বার নানান ধরনের হুমকি দিয়ে পথে আনতে হয়েছে তাকে।

নীরবে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। সান্তানার কণ্ঠ ভেসে এল আবার। 'রেডিও কন্ট্যাক্ট কেটে দিন। এখুনি ঢুকব আমরা টিউবে। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য জিনিস দেখবেন আজ।'

রিব্রিদার পরা দু'জন গার্ড ইঙ্গিত করল রানাকে হাতকড়াগুলো খুলে দেয়ার জন্যে। সবাইকে মুক্ত করা হলে ছাগল তাড়ানোর মত তাড়িয়ে ঢোকানো হলো ওদের একটা গোলাকার ডিকমপ্রেশন চেম্বারে। একটা লম্বা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে সুয়েরেজ পাইপের মত দেখতে মসৃণ অ্যালুমিনিয়ামের

পাইপের মধ্যে। লম্বালম্বি ভাবে শোয়ানো হলো সবাইকে ট্রেনের ওপর, বেঁধে দেয়া হলো স্ট্র্যাপ। সবার শেষে রানা।

রানাকে বাঁধা হতেই একটা বোতামে টিপ দিল একজন গার্ড। মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল রানার সর্ব শরীর। আশ্চর্য দ্রুত বেড়ে চলেছে ট্রেনটার গতি। চোখ খোলার চেষ্টা করেও পারল না সে। বুলেটের বেগে ছুটে চলেছে ট্রেনটা। ষাট সেকেন্ডও পার হয়নি, রানা টের পেল গতি কমে আসছে ট্রেনের, ঠিক যেন বাতাস পোরা নরম বালিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে ট্রেনটা।

একে একে বাঁধন খুলে নামানো হলো সবাইকে, ডিকমপ্রেশনের পর বের করে দেয়া হলো চেম্বার থেকে। এবার আর হাতকড়া পরানো হলো না ওয়ার্কারদের হাতে। সান্তানার গলা ভেসে এল আবার 'রেডিও কন্ট্যাক্ট ঠিক আছে এখন। সামনের টানেল ধরে আগে আগে চলুন। তবে সাবধান, এখানেও মনিটর আছে।'

বেশ খাড়াভাবে উঠে গেছে গুহাটা। পাথুরে মাটি। দেয়ালের গায়ে কিছুদূর পর পর লাইট লাগানো। মাথার ওপর দিয়ে সড়সড় করে পেছন দিকে সরে যাচ্ছে একটা কনভেয়ার বেল্ট—ছোট বড় নানান আকারের পাথর বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওটা। তার মানে টানেলের কাজ চলছে এখনও। আশ্চর্য একটা ব্যাপার লক্ষ করল রানা—আওয়াজের চোটে কানে তালা লেগে যাওয়ার কথা, কিন্তু কোন শব্দ নেই কোথাও।

'আমরা কোথায় এখন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'সিসি থেকে ছাব্বিশ মাইল উত্তরে,' উত্তর এল সান্তানার। 'ভ্যাকিয়ুম টিউবটা কেমন বুঝলেন?' সান্তানার কণ্ঠে গর্বের আভাস। 'আইডিয়াটা মিস্টার বিগের ঠিকই, কিন্তু জিনিসটা তৈরি করেছি আমরা নিজের হাতে। আশ্চর্য কবির চৌধুরীর মাথা! কি সহজ একটা প্রিনসিপ্‌ল্‌কে সুন্দর কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। টিউবের একপাশ থেকে বাতাসের ধাক্কা দিয়ে ট্রেনটাকে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে আরেক পাশে। ভ্যাকিয়ুমের মধ্যে দিয়ে বুলেটের বেগে এগিয়ে শেষ মাথায় বাতাসের ধাক্কায় থামছে আবার। এর সঙ্গে লেভিটেশন প্রিনসিপ্‌ল্‌ যোগ হওয়ায় আরও বেড়েছে গতি। পুরো চারটে মাস লেগেছে আমাদের পাইপগুলো ঠিকমত সেট করতেই। ছাব্বিশ মাইল··· সোজা কথা না!'

'সমুদ্রের নিচ দিয়ে?'

'হ্যাঁ। কাজ চলছে এখনও। কোথায় চলেছে জানি না, তবে আমার মনে হয় কোন আর্মি বা এয়ার বেস অ্যাটাক করতে চায় লোকটা মাটির নিচ দিয়ে টানেল খুঁড়ে।'

চুপ করে রইল রানা। লি-বিউসে মিসাইল ইনস্টলেশনের অবস্থান ভাল করেই জানা আছে ওর। সেই বেসের তলায় রয়েছে ওরা এখন। ওপরে টহল দিচ্ছে প্রহরী, জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে কড়া পাহারা—কিন্তু ঠেকানো গেল কথায়? ঠিক জায়গা মত পৌঁছে গেছে কবির চৌধুরী!

হাইস্পীড কমপ্রেশন ড্রিল নিয়ে কাজ করে চলেছে সামনেই চব্বিশজনের

একটা দল। পাথর খুঁড়ে এগোতে হচ্ছে এখানে, অথচ শব্দ নেই, কোন ভাইব্রেশন নেই। সান্তানাকে জিজ্ঞেস করায় হেসে উঠল সে। 'এটাও সেই বিগ ব্রাদারের কারসাজি। লোকটার যে দুর্দান্ত একটা ব্রেন আছে সেকথা শত্রুরও স্বীকার না করে উপায় নেই। অডিফায়ার বলে একটা যন্ত্রের সাহায্যে সেকেন্ডে বিশ হাজার সাইক্‌ল্‌স্ রেডিও ফ্রীকোয়েন্‌সি পাওয়ার তৈরি করা হচ্ছে, তারপর সেটাকে পরিবর্তন করা হচ্ছে মেকানিক্যাল এনার্জিতে, যার ফলে শব্দটাকে খেয়ে নিচ্ছে ভাইব্রেশন। নানান কৌশলে এই ভাইব্রেশনও মেরে দেয়া হচ্ছে। ফলে দুই হাত তফাৎ থেকেও শব্দ বা ভাইব্রেশন টের পাওয়ার উপায় নেই। অনেক রকম যন্ত্র এনে টেস্ট করে দেখা হয়েছে। কোন ইন্সট্রুমেন্টেই কোন কিছু রেজিস্টার করে না। আমরা যদি কোন ফিল্ড মার্শালের চেয়ারের তলায় গিয়ে উঠি, টের পাবার রাস্তা নেই তার। এইবার ওই গার্ডটার সামনে গিয়ে বলুন: শিফ্‌ট চেঞ্জ। এটা বললেই ওরা ফিরে যাবে, আমরা কাজ ধরব। আগামী তিন ঘণ্টা আমাদের শিফট। যখন তখন হান্টার চালাতে দ্বিধা করবেন না। নইলে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

তুমুল বেগে কাজ চলল দুটো ঘণ্টা। তারপরেই রানার বেল্টে ফিট করা একটা বাযার বেজে উঠল ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের মত। ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখতে পেল সে একটা কাঁচঘেরা বুদের মধ্যে বসে হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে চীফ টেকনিশিয়ান। এতক্ষণ ড্রিলিং অপারেশন পরিচালনা করছিল লোকটা বুদে বসে। পায়ে পায়ে এগোল রানা বুদের দিকে, টিপে দিল লাল বোতামটা। পরিষ্কার ইংরেজি শুনতে পেল সে এয়ারফোনে।

'বড় সাহেব কথা বলতে চান তোমার সঙ্গে।' ইঙ্গিত করল লোকটা মনিটরের দিকে।

কবির চৌধুরী! মনিটর স্ক্রীনের মধ্যে দিয়ে সোজা চেয়ে রয়েছে রানার চোখের দিকে। ভিতর ভিতর হোঁচট খেল রানা। ওর চেহারাও কি দেখতে পাচ্ছে কবির চৌধুরী? পরমুহূর্তে মাস্কের কথা মনে পড়ায় নিশ্চিন্ত হলো, দেখতে পেলেও চিনতে না পারার সম্ভাবনাই বেশি। ধরা যদি পড়ে তাহলে পড়বে কথা বলতে গিয়ে। যথাসম্ভব হুঁ হাঁ দিয়ে কাজ সারবে বলে মনস্থির করে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল মনিটরের সামনে।

'তোমার লোকজন নিয়ে ফিরে এসো এখুনি,' পরিষ্কার বাংলায় ভেসে এল কবির চৌধুরীর নির্দেশ। 'চীফ ইঞ্জিনিয়ার জানাচ্ছে, আর দশ ইঞ্চিও নেই, মেঝে পর্যন্ত পৌঁছে গেছি আমরা। আপাতত কাজ শেষ। তোমার লোকজনকে সেল ব্লকে পুরে দিয়ে তুমি ফিরে আসবে ডিকমপ্রেশন চেম্বারে। স্পেশাল অ্যাসল্ট পার্টিতে তুমিও আছ। ইতিমধ্যে ভেতর থেকে যা ব্যবস্থা করার সেরে রাখবে ফ্রুলিন। আমরা শুধু যাব আর উঠিয়ে নিয়ে আসব। দেরি কোরো না, কুইক।' মিলিয়ে গেল কবির চৌধুরীর ছবি।

ফিরতি পথে দ্রুত চলতে শুরু করল রানার ব্রেন। লি-বিউসে মিসাইল ইনস্টলেশন থেকে কিছু একটা চুরি করবার পরিকল্পনা নিয়েছে কবির চৌধুরী।

কি সেটা? যাব আর উঠিয়ে নিয়ে আসব শুনে বোঝা যাচ্ছে গোটা পি এইচ ও মিসাইল চুরি করবার প্ল্যান নেই ওর। ভ্যাকিয়ুম টিউবের মধ্যে দিয়ে পার করা যাবে না ওটাকে। তাহলে? নিশ্চয়ই স্পেশালাইজড্ কমপিউটার ব্রেনটাই ওর লক্ষ্য। ওটা আকারে একটা মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের চেয়ে বড় হবে না। এই ব্রেনটা ফিট করবে কবির চৌধুরী ব্র্যান্ডের সুপার সাবমেরিনে। তারপর সমুদ্রের ছয় হাজার ফুট নিচ দিয়ে উধাও হয়ে যাবে—কোথায় কে জানে। কারও সাধ্য নেই ঠেকায়। সমুদ্রের অত গভীরে পৌঁছতে সময় লাগবে, কাজেই ইতোমধ্যে যেন কেউ এই চুরির ব্যাপারটা টের না পায় সেজন্যে খুব সম্ভব উড়িয়ে দেবে সে গোটা লি-বিউসে মিসাইল ইনস্টলেশন। তার মানে শেষ হয়ে যাচ্ছে সোহানা। র‍্যাডিয়েশনের ফলে কেউ ঢুকতে পারবে না ওখানে পুরো তিনটে দিন। সে সুযোগে পগার পার হয়ে যাবে কবির চৌধুরী। তারপর কতটা ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞে নামবে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে কখন ওর কি মূড হয় তার ওপর।

ফিরে এল রানা ওর দল নিয়ে সিসিতে। মোটামুটি একটা প্ল্যান ঠিক করে নিয়েছে সে। ঘড়ি দেখল। সাড়ে ন'টা। এদিকটা সামলাতে পারবে সে আশা করা যায়, কিন্তু ওদিকে সোহানা ফ্রলিন লটেনবাককে সামলাতে পারলে হয়। যাই হোক প্ল্যানটা দলের সবাইকে জানানো দরকার। ডিকমপ্রেশন চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলিভেটরের দিকে এগোতে এগোতে সান্তানাকে বলল সে, 'হাতে সময় নেই। সবাইকে কয়েকটা কথা বুঝিয়ে দিতে হবে। কাছে পিঠে মনিটর সিসটেমের কোন ব্লাইন্ড স্পট থাকলে সেইদিকে চলুন।'

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর এল। কিন্তু রয় সান্তানার কণ্ঠে নয়—কবির চৌধুরীর কণ্ঠে।

'মাসুদ রানা! বড় বেশি বেড়ে গেছ তুমি! সাত নম্বর ভেন্টিলেটিং টানেলে পাওয়া গেছে গার্ডের মৃতদেহ। চারপাশটা একবার চেয়ে দেখো, তারপর সাবধানে পায়ের কাছে নামিয়ে রাখো সাবমেশিনগান। চারদিকে নজর করলেই বুঝতে পারবে, বাধা দেয়া অর্থহীন।'

পাঁই করে ঘুরল রানা। পেছনেই একটা টানেলের স্টীলের দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। ডানধারে নেমে এসেছে একটা এলিভেটর, দরজা খুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বামধারে নামল আর একটা এলিভেটর, সেটারও দরজা খুলে যাচ্ছে। দুই খোলা দরজা দিয়ে দুই দল সাবমেশিনগানধারী এগোল ওদের দিকে।

তেরো

'জিরো আওয়ার, টোয়েন্টিনাইন মিনিট্স্, থার্টি সেকেন্ডস্... টেলিমিটার

কন্ট্যাক্ট…ট্যাঙ্ক প্রেশার ওকে…গাইরস্ ওকে…রকেট ট্যাঙ্ক প্রেশার কারেক্ট…'

ধাতব কণ্ঠস্বরে যান্ত্রিক ভঙ্গিতে কাউন্টডাউন চলেছে লি-বিউসে ইনস্টলেশনে।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মুখ করে রয়েছে রাডার স্ক্যানারগুলো। ওদিকেই রওনা হবে মিসাইল আর সাড়ে ঊনত্রিশ মিনিট পর—পড়বে গিয়ে পাঁচ হাজার মাইল দূরে আটলান্টিকের একটা নির্দিষ্ট এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শনের জন্যে আগেই পৌঁছে গেছে সেখানে একটা জাহাজ। চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে লি-বিউসের সর্বত্র। আজকের দিনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওদের সবার কাছে, এতদিনের কঠোর পরিশ্রম সার্থক হলো কি হলো না জানতে পারবে তারা আর আধঘন্টার মধ্যেই। সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের প্যানেলে লাল, নীল, সবুজ, হলুদ হরেক রঙের ছোট ছোট বাতি জ্বলছে নিভছে।

বিভিন্ন সেকশনের হেডদের কাছ থেকে মেসেজ আসছে মুহুর্মুহু ইন্টারকমিউনিকেশন সিসটেমের মাধ্যমে।

মেইন ব্লকের দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে সেঁটে দাঁড়াল সোহানা। গার্ডদের গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ফ্রলিন লটেনবাক। মোটা একটা কেবল্ দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে সিলোকে লঞ্চিং সাইটের সঙ্গে, সেটা ডিঙিয়ে এগিয়ে গেল ফ্রলিন দ্রুত পায়ে। আবার শোনা গেল কাউন্ট ডাউন। আটাশ মিনিট আছে আর।

সোহানা দেখল অটল পর্বতের মত পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ইউনিফর্ম পরা সেন্ট্রি দু'জন গায়ে গা ঠেকিয়ে। মাথা নেড়ে বারণ করছে ফ্রলিনকে। আঙুল তুলে লাল ওয়ার্নিং লাইটটা দেখাল একজন, বুড়ো আঙুল দিয়ে দেয়ালের গায়ে আঁটা একটা নোটিশ-বোর্ডের দিকে দেখাল দ্বিতীয়জন। ওতে লেখা রয়েছে: কাউন্ট-ডাউন শুরু হওয়ার পর এই গেটের ওপাশে যাওয়া নিষিদ্ধ।

হাতের ব্যাগটা খুলে অনুমতিপত্র বা ওই জাতীয় কিছু বের করবার ভঙ্গি করল ফ্রলিন। হঠাৎ চমকে উঠল সোহানা। পড়ে যাচ্ছে সেন্ট্রি দু'জন। দ্রুত একবার চারপাশে চেয়ে নিয়ে প্রায় দৌড়ে চলে গেল ফ্রলিন সিলোর দিকে।

ছায়া থেকে সরে পিছু নিল সোহানা। সেন্ট্রিদের দিকে একনজর চেয়েই বুঝতে পারল নার্ভ গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। হয়তো কোন ন্যাসাল স্প্রের বোতলে পোরা ছিল। ফ্রলিনের পিছু পিছু এক ছায়া থেকে আরেক ছায়ায় সরে সরে এগোতে শুরু করল সে। একবার ভাবল ফিরে গিয়ে সিকিউরিটি চীফকে জানাবে কিনা, পরমুহূর্তে বুঝতে পারল এখন কাউকে খবর দেয়ার সময় নেই। কি করতে চলেছে সে ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহ বা দ্বিধার ভাব নেই ফ্রলিনের চালচলনে। সব কিছুই আগে থেকে প্ল্যান করা। যা করবার অত্যন্ত দ্রুত করবে ফ্রলিন, কাজেই এখন আর কাউকে ডাকাডাকি করে সময় নষ্ট না করে বাধা দিতে হবে ওকেই।

সিলোর দেয়াল ঘিরে বাইরে থেকে গোল হয়ে ঘুরে যে লোহার মইটা নেমে গেছে নিচে সেটা ধরে নামতে শুরু করেছে ফ্রলিন। বাঁক ঘুরে অদৃশ্য

হয়ে গেল। দৌড়ে চলে এল সোহানা সিলোর পাশে। সামনে ঝুঁকে দেখল বিশাল একটা বন্দুকের ব্যারেলের মত ঝকঝক করছে ভিতরটা। পঞ্চাশ ফুট নিচ থেকে খাড়া উঠে এসেছে মসৃণ ধাতুনির্মিত ইঁদারাটা। ত্রস্তপদে নেমে যাচ্ছে ফ্রলিন। কয়েক ফুট বাকি থাকতে রেলিং টপকে দু'হাত দু'দিকে তুলে সরু একটা সাঁকোর ওপর দিয়ে ইঁদারার গায়ে বসানো একটা দরজার কাছে পৌঁছে গেল সে, তারপর দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। জুতো জোড়া খুলে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের বেগে নামতে শুরু করল সোহানা।

পাঁচটা মিনিট নষ্ট হয়ে গেল সোহানার কেবল দরজাটা খুলতেই। নানানভাবে চেষ্টার পর ভিতর থেকে হয়তো তালা লাগিয়ে দিয়েছে ভেবে যখন হাল ছেড়ে দিয়ে লোকজনকে খবর দেবে কিনা ভাবছে, এমনি সময় হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই খুলে এল দরজাটা, ফেঁসে গিয়ে আটকে ছিল। খোলা দরজা দিয়ে প্রথমেই চোখ পড়ল সোহানার মেঝের ওপর রাখা হ্যান্ডব্যাগটার ওপর। ব্যাগের চারপাশে ছড়ানো রয়েছে কয়েকটা ছোট বড় রেঞ্চ, স্ক্রু ড্রাইভার, প্লায়ার্স, আরও কিছু অদ্ভুত যন্ত্রপাতি। ভিতরে পা বাড়িয়েই দেখতে পেল সে ফ্রলিনকে। লোহার একটা মইয়ে উঠে মেঝে থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে একের পর এক জটিল তার ডিসকানেক্ট করছে সে। খুব সম্ভব নষ্ট করে দিচ্ছে ওয়ার্নিং সিসটেম। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই চমকে চাইল সে সোহানার দিকে।

'কে আপনি! কি চান আপনি এখানে? জানেন না এখানে ঢোকা নিষেধ?'

নার্ভ গ্যাসের ভয় নেই, কালো টাইটফিট জামায় পকেট নেই, ওটা রয়ে গেছে হ্যান্ডব্যাগের মধ্যেই—কাজেই ধীরে সুস্থে পিস্তলটা তাক করল সোহানা ফ্রলিনের কপাল বরাবর। 'লক্ষ্মী মেয়ের মত নেমে এসো নিচে। কোন চালাকি...'

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই সাঁই করে ছুঁড়ে মারল ফ্রলিন আধহাত লম্বা রেঞ্চ একটা, সঙ্গে সঙ্গেই লাফ দিল হ্যান্ডব্যাগটার কাছে পৌঁছবার জন্যে। হাতের তাক লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না, কিন্তু পা বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল ওর সঙ্গে। কব্জির ওপর রেঞ্চের আঘাত লাগায় সোহানার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল পিস্তলটা, এক সেকেন্ড দাঁতে দাঁত চেপে চোখ টিপে বন্ধ করে রেখে যন্ত্রণার তীব্রতা সামলে নিয়েই দেখতে পেল সে পালিশ করা মেঝের ওপর পা পিছলে চিৎ হয়ে পড়ে গেছে ফ্রলিন। সঙ্গে সঙ্গেই ব্যথা ভুলে লাফ দিল সোহানা সামনের দিকে।

গড়িয়ে সরে গেল ফ্রলিন, শুয়ে শুয়েই পা চালাল। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল সোহানাও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ল সে, ফ্রলিনকে আছড়ে পাছড়ে হ্যান্ডব্যাগটার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। অসম্ভব জোর ফ্রলিনের গায়ে, সোহানাকে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল সামনের দিকে। উপায়ান্তর না দেখে জুডোর কৌশল অবলম্বন করল সোহানা। হ্যান্ডব্যাগের ওপর দিয়ে ছিটকে কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ল ফ্রলিন। নার্ভ

গ্যাসের বোতলটা বের করে নেয়ার চেষ্টা করল সোহানা হ্যান্ডব্যাগ থেকে, কিন্তু ফ্রলিনকে পিস্তলের দিকে এগোতে দেখে দু'পা সামনে এসে কারাতে কিক্ চালাল সে ওর তলপেট লক্ষ্য করে। টাইমিং-এ সামান্য ভুল হয়ে গেল। প্রস্তুত ছিল ফ্রলিন, চট করে পেছনে সরেই চেপে ধরল সোহানার পায়ের কব্জি। খানিকটা ওপরে তুলেই মোচড় দিল সে সোহানার পায়ে। দড়াম করে আছড়ে পড়ল সোহানা, সঙ্গে সঙ্গেই ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রলিন। দুই হাতে বৃষ্টির মত কিল ঘুসি চালাল সে সোহানার চোখেমুখে, হ্যান্ডব্যাগটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করল, না পেরে চেষ্টা করল খামচি দিয়ে ওর চোখ অন্ধ করে দেয়ার। ঠিক সেই মুহূর্তে পা দুটো বাঁকিয়ে ফ্রলিনের গলায় বাধিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে পেছনের দিকে ঠেলা দিল সোহানা। ডিগবাজি খেয়ে সরে গেল ফ্রলিন সোহানার বুকের ওপর থেকে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সোহানা। প্রতিপক্ষও উঠে দাঁড়িয়েছে। গোল হয়ে ঘুরছে দু'জনই। সিলোর ভিতরটা গরম হয়ে উঠছে। ঘেমে নেয়ে উঠেছে দু'জনই, কিন্তু কেউ কাউকে আনতে পারছে না কায়দায়। হঠাৎ একটা ফল্‌স্‌স্টেপ দিয়েই আক্রমণ করে বসল ফ্রলিন। চট করে পাশ ফিরল সোহানা, এবং ওর একটা হাত ধরেই হ্যাঁচকা টান মেরে হিপ থ্রো করল। মাথার ওপর দিয়ে আছড়ে ফেলেও কিন্তু হাতটা ছাড়ল না সোহানা, বেকায়দা মত মুচড়ে ধরে টান দিল ওপর দিকে। কড়াৎ করে শব্দ হলো একটা, সঙ্গে সঙ্গেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ফ্রলিন। এইবার নিশ্চিন্তে পিস্তলটার দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। দড়াম করে খুলে গেছে দরজাটা।

এক নজরেই বুঝতে পারল সোহানা, বাইরে থেকে এসেছে এসব লোক। বারোজনের একটা দল। রাবার স্যুট আর রিব্রিদার মাস্ক পরা। সামনের জনের চেস্ট স্পীকার থেকে ভেসে এল প্রথমে চীনা, পরে ইংরেজি কয়েকটা শব্দ: 'লয় গী, আর কৃ লার! হারি আপ, গ্র্যাব দেম!'

খপ্ করে ধরে ফেলল একজন সোহানার হাত বজ্রকঠিন হাতে। হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল সোহানা, পারল না, বামহাতে দুই একটা কিল ঘুসি মারতেই সেই হাতটাও ধরে ফেলল লোকটা। যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে েগে গেছে বাকি সবাই। প্রত্যেকের জানা আছে ঠিক কোন্ নাটগুলো আলগা করতে হবে বা কোন্ স্ক্রু ঢিল দিতে হবে। মই বেয়ে উঠে গেছে কয়েকজন, দ্রুত হাতে চলেছে কাজ। একটা অ্যাসেটিলিন টর্চ জ্বলে উঠল একজনের হাতে। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছে চীনা লোকটা। ইলেকট্রিক সার্কিট ডিসকানেক্ট করতে গিয়ে এখান ওখান থেকে স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়ছে নিচে।

দুই চোখে বিষাক্ত সাপের ঘৃণা নিয়ে উঠে দাঁড়াল ফ্রলিন। ডান হাতটা ঝুলে আছে পঙ্গু ভঙ্গিতে। চীনা লোকটার দিকে ফিরে বলল, 'এখানেই ফেলে রেখে যাব হারামজাদীকে! ধ্বংস হয়ে যাবে সবকিছুর সঙ্গে!'

রিব্রিদার মাস্কের কাঁচের ওপাশে দাঁতের আভাস দেখা দিল। সোহানার

চিবুকে একটা হাত রেখে বলল, 'কিন্তু চেহারাটা যে সুন্দর লাগছে? এর সঙ্গে একটা রাত…'

মুখটা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু তার আগেই একগাদা থু থু ছিটিয়ে দিয়েছে সোহানা ওর মাস্কের কাঁচের ওপর। একটা অত্যন্ত কুৎসিত চীনা গালি মুখস্থ ছিল, সেটা উচ্চারণ করল সে এবার। 'টিউ নার মা!'

থু থু মাখা কাঁচের ওপাশে কঠোর হয়ে উঠল চীনাম্যানের বাঁকা চোখদুটো। এক পা পিছিয়ে গিয়ে ফিরল ফ্রলিনের দিকে। 'ওকে নিয়ে ফিরছি আমি। বিস্ফোরণে মৃত্যু ছাড়াও আরও অনেক ধরনের মৃত্যুর খবর জানা আছে আমার।'

'কিন্তু তাহলে এখানে রেখে যাচ্ছি আমরা কাকে? এখানে তো একজনকে ফেলে যেতে হবে।'

একটা ছোরা দেখা দিল লোকটার হাতে। আচমকা ছুঁড়ে মারল সে ছোরাটা একজন লোকের পিঠ লক্ষ্য করে। মাঝপথে একবার ঝিক করে উঠেই জায়গামত ঢুকে গেল ছোরাটা। রাবার স্যুটের বাইরে বাঁটটা দেখা যাচ্ছে কেবল। হাঁটু ভাঁজ হয়ে বসে পড়ল লোকটা, দাঁতে দাঁত চেপে পিঠের ওপর কি এসে বিঁধল দেখবার চেষ্টা করল সে হাত বাড়িয়ে, ছুরির বাঁট পর্যন্ত পৌঁছল না হাত, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেজদা দেয়ার ভঙ্গিতে মাথাটা নামাল সে মেঝের ওপর।

'ওর প্রয়োজন ফুরিয়েছে।' ঘোষণা করল চীনাম্যান স্পীকারের মাধ্যমে। 'ওর রিব্রিদারটা খুলে এই মেয়েলোকটাকে পরাও।' ঘড়ির দিকে চাইল। 'হাতে সময় নেই। কুইক এভরিবডি।'

চারজন লোক নামিয়ে নিয়ে এল মিসাইলের ইলেকট্রোনিক ব্রেনটা, সাবধানে লাশটার ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে, পরস্পরকে হুঁশিয়ার করতে করতে। রিব্রিদার পরিয়ে পেছন থেকে ঠেলা দিল সোহানাকে একজন দরজার দিকে। সাঁকোটা পেরিয়ে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ নামতে নামতে লক্ষ করল সোহানা সিলোর চারপাশে ছোটাছুটি করছে কয়েকজন লোক, ব্যস্ত হাতে তার জুড়ে চলেছে ওরা। অর্থাৎ জায়গামত ফিট করা হয়েছে বোমা। নিচেই গোল গর্তটা চোখে পড়ল ওর। মুহূর্তে বুঝতে পারল সে এত কড়া সিকিউরিটি ডিঙিয়ে কি করে এতগুলো লোক ঢুকে পড়ল এখানে। মাটির নিচ দিয়ে গর্ত খুঁড়ে উঠে এসেছে ওরা।

ঠেলে গর্তের মধ্যে নামানো হলো ওকে।

এক সেকেন্ড দ্বিধা না করে গুলি করল রানা। একবার ডানদিকে, একবার বামদিকে। সার বেঁধে এগোচ্ছিল দুটো দল। সামনে দু'জন দু'জন চারজন—অর্থাৎ, চারজন ছাড়া আর কেউ গুলি করলে নিজেদের লোকের গায়েই লাগবে। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল রানা। দুই সারিরই প্রথম দু'জন চিৎকার করে উঠল, গুলি খেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ল পেছনের

লোকের গায়ে। সেমি অটোমেটিকে দিয়ে এক গুলিতে ছাতের লাইটটা নিভিয়ে দিয়েই চিৎকার করে উঠল সে: 'শুয়ে পড়ো সবাই, শুয়ে পড়ো!'

এদিকটা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল অথচ সামনে সেল ব্লকের বাতি থাকায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা গার্ডদের সিলুয়েট।

'চাবি!' সান্তানার গলা শুনতে পেল রানা। 'আমার হাতকড়া খুলে চাবিটা দিন আমার কাছে, জলদি!'

অন্ধকার সত্ত্বেও সান্তানার হাতকড়া খুলে ওর হাতে চাবিটা ধরিয়ে দিতে পাঁচ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগল না রানার। কবির চৌধুরীর ভরাট কণ্ঠস্বর ভেসে এল: 'এসব করে কোন লাভ হবে না, মাসুদ রানা। এক্ষুণি অস্ত্র ফেলে দিয়ে সারেন্ডার করো!' কবির চৌধুরীর গলা ছাপিয়ে সান্তানার চিৎকার ভেসে এল: 'মনিটরটা খতম করেন! ওই কোনায়, ছাতে লাগানো কাঁচটা!' একগুলিতেই লক্ষ্যভেদ করল রানা, ঠুস করে কাঁচ ভেদ করে ভিতরে চলে গেল তপ্ত সীসা।

নিহত গার্ডের শরীরে ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে এগিয়ে এল দুটো দলই। আগুনের হল্কা বেরোচ্ছে সাবমেশিনগানের মুখ দিয়ে অনর্গল। আবার দুই পশলা গুলি বর্ষণ করল রানা। নিজের গলা খামচে ধরল একজন গার্ড, আরেকজন পেট চেপে ধরে বসে পড়ল বাঁকা হয়ে। আবার একপশলা গুলি চালিয়ে রিলিজ বাটন টিপে খালি ম্যাগাজিন ফেলে দিয়ে নতুন আর একটা ভরে নিল রানা। রানার পাশ থেকে কয়েকজন শৃঙ্খলমুক্ত ডাইভার নিচু হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে দৌড় দিল গার্ডদের দিকে। পাঁচ কদম গিয়েই হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল প্রথমজন গুলি খেয়ে, কিন্তু দ্বিতীয় আর তৃতীয়জন পৌঁছে গেল নিহত গার্ডদের কাছে, ডাইভ দিয়ে মেঝেতে পড়েই তুলে নিল সাবমেশিনগান। ওদের পেছনে পেছনে আরও কয়েকজন পৌঁছে গেছে। তিন দিকের আক্রমণে আধমিনিটের মধ্যে ধরাশায়ী হলো সবক'টা গার্ড। যারা বেঁচে আছে তারাও রা করছে না, ঘাপটি মেরে পড়ে আছে মড়ার মত। অস্ত্র পাওয়া গেছে যথেষ্ট পরিমাণে, ভাবল রানা, এ পক্ষের লোক ক্ষয় মাত্র দু'জন—ভালই বলতে হবে। এবার আর সব বন্দীদের মুক্ত করে এই সেল ব্লক থেকে বেরোবার একটা ফন্দি বের করতে হবে।

'বেরোবার কোন উপায় নেই,' বলল সান্তানা। 'এলিভেটরের কারেন্ট অফ করে দেয়া হয়েছে। সেল ব্লক দু'পাশ থেকে বন্ধ।'

'কোন চিন্তা নেই,' বলল রানা। 'একটা না একটা রাস্তা বেরিয়ে যাবেই।'

মেইন কন্ট্রোলরুমে বসে আছে কবির চৌধুরী। ঘড়ি দেখল। তারপর হাসিমুখে চাইল ডক্টর জিমি ক্লিদারোর চোখের দিকে।

'আর ত্রিশ সেকেন্ড। ঠিক দশটায় চাপ দেব আমি এই লাল বোতামটায়। মাটির সঙ্গে মিশে যাবে লি-বিউসের মিসাইল ইন্সটলেশন।'

চমকে উঠল রানার অন্তরাত্মা। চট করে ঘড়ির দিকে চাইল। তার মানে আধ মিনিটের মধ্যে মারা পড়ছে সোহানা। ঠেকাবার কোন রাস্তা নেই! পরিষ্কার বুঝতে পারল, মনিটর নষ্ট করে দেয়ার পরেও কেন রেডিও কন্ট্যাক্ট বজায় রাখছে কবির চৌধুরী ওর সঙ্গে। যা যা ঘটছে বা ঘটতে চলেছে জানিয়ে মানসিক কষ্ট দিতে চাইছে ওকে কবির চৌধুরী। প্রচ্ছন্নভাবে জানিয়ে দিচ্ছে, ওর তুলনায় রানা কিছুই না, এত চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারেনি সে কবির চৌধুরীকে, পারবেও না। পরাজয়টা মনে মনে উপলব্ধি করিয়ে চরম শাস্তি দিতে চায় ওকে লোকটা। বুঝিয়ে দিতে চায় ওর কাছে মাসুদ রানা স্টীমরোলারের তুলনায় বিষ পিঁপড়ের চেয়ে বেশি কিছুই নয়—যদি চেপে মারতে চায়, ঠেকাবার সাধ্য নেই রানার।

লাল বোতামটার ওপর আলতো করে একবার হাত বুলাল কবির চৌধুরী। নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটের কোণে। শুরু করল কাউন্টডাউন। দশ থেকে নামতে নামতে থামল এসে শূন্যে।

চোখমুখ কুঁচকে গেল রানার। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল সে শব্দ বা ঝাঁকুনি টের পাবে মনে করে। কিন্তু কোন শব্দ এল না। ঝাঁকুনিও না। এতদূর থেকে আসতে সময় লাগবে। সোহানার মুখটা ফুটে উঠল মানসপটে। এই মুহূর্তে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারল রানা ঠিক কতটা ভালবাসে সে সোহানাকে। মনে হচ্ছে কলজেটা মুচড়ে ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলছে কেউ।

'একটা পাট চুকল,' বলল কবির চৌধুরী। 'এবার দ্রুত সারতে হবে আমাদের বাকি সব কাজ।' এলিভেটরের দরজা খুলে যেতেই চারজনে মিলে মিসাইল ব্রেনটাকে সাবধানে বয়ে নিয়ে উঠে পড়ল ওতে গার্ডরা। 'এটাকে সাবমেরিনে তোলা হয়ে গেলেই কাজ আমাদের শেষ।'

'সেল ব্লকে কি চলছে এখন?' জিজ্ঞেস করল ক্লিদারো।

'জানি না।' জবাব দিল কবির চৌধুরী। 'আপাতত ওদের নিয়ে কোন চিন্তা নেই। দু'পাশ থেকে আটকে দেয়া হয়েছে। তুমি ব্যান্ডের খবর নাও, সাবমেরিনের ভেতর ব্রেন রিসিভ করবার প্রস্তুতি সব সারা হয়েছে কিনা জেনে জানাও আমাকে।'

'আর এ মেয়েটার কি ব্যবস্থা করব?'

'ওকে আটকে রাখো কোন ঘরে। লি স্যুর বোধহয় খুব পছন্দ হয়েছে ওকে। কিন্তু সাবধান, এখনই সুযোগ দিয়ো না যেন—অনেক কাজ পড়ে রয়েছে ওর।'

একটা মাইক্রোফোন হাতে তুলে নিয়ে তড়বড় করে নানাদিকে নির্দেশ দিতে শুরু করল ক্লিদারো।

কবির চৌধুরীর কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে রানা। কেমন যেন খটকা লাগল ওর মনে। কাকে পছন্দ হয়েছে লি স্যুর? সোহানা নয়তো? কিন্তু এই আশাকে মনে স্থান দিতে ভরসা পেল না সে। মন থেকে সব দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়ে এখান থেকে বেরোবার ব্যবস্থা করতে হবে এখন।

সবকিছু রেডি আছে জানতে পেরে প্রফেসার ব্র্যান্ডকে সাবমেরিন থেকে বেরিয়ে আসবার নির্দেশ দিল কবির চৌধুরী। মিনিট খানেক পর দেখা গেল হ্যাচের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসছেন বৃদ্ধ ছড়িতে ভর দিয়ে। দুজন গার্ড দুপাশ থেকে সাহায্য করছে তাঁকে। টলোমলো পায়ে স্টীলের গ্যাঙওয়ে বেয়ে এগিয়ে আসছেন তিনি। ধৈর্য হারিয়ে ফেলল কবির চৌধুরী দেরি দেখে। হুকুম করল, 'বয়ে নিয়ে এসো ওকে। দেরি করিয়ে দিচ্ছে অনর্থক। এত সময় নেই আমাদের হাতে।'

প্রফেসার ব্র্যান্ড এসে কন্ট্রোল রুমে ঢুকতেই একটা বোতামে চাপ দিল কবির চৌধুরী। হড়হড় করে সাগর থেকে পানি এসে ভর্তি হয়ে গেল বিশাল বাথটাব। আরেকটা বোতাম টিপতেই ঢিল দিতে শুরু করল ক্রেনগুলো।

'ডাইভিং টীম রেডি?' জিজ্ঞেস করল চৌধুরী নিচু গলায়।

'রেডি, স্যার।' উত্তর এল কাঁচের ওপাশ থেকে।

ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে চাইল কবির চৌধুরী। পঁচিশজন মাস্ক, ফ্লিপার আর অক্সিজেন রিব্রিদার পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তুত হয়ে।

'মিসাইল ব্রেন নামাবার জন্যে তৈরি হয়েছে?'

'ওয়াটারপ্রুফিং কমপ্লিট, স্যার। আমরা রেডি।'

'ভেরি গুড। এবার স্লেডের ওপর তুলে ফেলো ওটাকে।' চট করে পাশ ফিরে ব্র্যান্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'প্রেশার কত এখন?'

'প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে সাঁইত্রিশ পাউন্ড,' বলল প্রফেসার দুর্বল কণ্ঠে। 'বাইরের সমুদ্রেও এই একই প্রেশার। গেট খুলে দিতে পারেন, ইচ্ছে করলেই।'

একটা সুইচে টিপ দিল কবির চৌধুরী। দু'পাশে সরে গেল একটা মস্ত লোহার গেট। সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলো কৌতূহলী মাছ ঢুকে পড়ল ভিতরে। সামনে ঝুঁকে আরেকটা সুইচ টিপে যোগাযোগ স্থাপন করল চৌধুরী সাবমেরিনের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। 'সব ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন? আর ইউ রেডি?'

সঙ্গে সঙ্গেই একটা মনিটরে ভেসে উঠল চুরুট কামড়ে ধরা একটা বাঁকা মুখ। চুরুটটা দাঁতে চেপে রেখেই উত্তর দিল সে, 'এভরিথিং রেডি, স্যার। অ্যাওয়েটিং ইয়োর অর্ডার।'

'ও. কে.। এখান থেকে বের করে সাগরের ফ্লোরে নিয়ে যাও সাবমেরিন। ফরওয়ার্ড হ্যাচ খুলে মিসাইল টিউবে পানি ভর্তি করে তৈরি হয়ে যাও। ইলেকট্রোনিক ব্রেনসহ স্লেডটা আমি রওনা করে দিচ্ছি এক্ষুণি।'

সেল ব্লকের সমস্ত বন্দীকে মুক্ত করা হয়েছে হাতকড়া খুলে দিয়ে। বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতি। অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল ওরা রানাকে। সবাই অপেক্ষা করছে পরবর্তী নির্দেশের।

রানা বুঝতে পারল এখান থেকে বেরোবার উপায় উদ্ভাবন করতে হলে সবার সাহায্য নিতে হবে ওকে। কাজেই শুরু করল প্রশ্ন।

'এখান থেকে আমাদের কথাবার্তা বাইরে থেকে শোনার কোন ব্যবস্থা আছে?'

মাথা নাড়ল সামনের কয়েকজন।

'ক'টা দরজা এই সেলের?'

'মেইন গেট ছাড়াও আরও চারপাঁচটা দরজা আছে, কিন্তু সব তালা মারা।' জবাব দিল রয় সান্তানা।

'তালা কোন সমস্যা নয়, প্রশ্ন হচ্ছে ওই দরজা দিয়ে বেরোলে কোন্ অংশে পৌঁছুচ্ছি আমরা। আন্ডারগ্রাউন্ডের মোটামুটি একটা নকশা এঁকে দেখাতে পারবেন কেউ আমাকে?'

একজন ছুঁচোমুখো লম্বা লোককে ঠেলে এগিয়ে দেয়া হলো সামনে। একটা সাদা কাগজের ওপর ঘ্যাসঘ্যাস করে এঁকে ফেলল লোকটা চমৎকার একটা নকশা। গোড়া থেকে ব্যাখ্যা শুরু করতে যাচ্ছিল লোকটা, ওকে বাধা দিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল: 'নক্সার মধ্যে এই সেলটা কোথায়, দেখান।' একটা লম্বাটে জায়গায় লোকটা আঙুল রাখতেই পাঁচ সেকেন্ড নক্সাটার দিকে চেয়ে থেকে মনের মধ্যে গেঁথে নিল। তারপর বলল, 'এবার দরজাগুলো এঁকে দেখান।' চারটে দাগ দিল লোকটা দু'পাশের দেয়ালে। 'এসব দরজার ওপাশে কি?'

'এখন কি আছে জানি না। আগে ছিল স্টোর। মাস ছয়েক হলো পড়ে আছে বন্ধ অবস্থায়।'

'বেশ। দেখে নেয়া যাক আগে।' চার মিনিটও লাগল না স্টিলেটোর সাহায্যে চারটে দরজার তালা খুলতে। একটা সম্পূর্ণ খালি, বাকি তিনটেয় ভাঙাচোরা বাতিল জিনিসপত্র ঠাসা—কোনটাতেই বাইরে বেরোবার কোন দরজা নেই। স্টোরের প্রত্যেকটা জিনিস উল্টেপাল্টে দেখল রানা—অকেজো অক্সিঅ্যাসেটিলিন টর্চ, হ্যান্ড ড্রিল, রিব্রিদার, অক্সিজেন সিলিন্ডার, একগাদা ফ্লিপার, হাঙর মারা ছোরা, আন্ডার-ওয়াটার সিওটু গান, স্পিয়ার, আরও কত কি। ফিরে এসে এই নক্সার ওপরেই ভেন্টিলেশন সিস্টেম এঁকে দেখাতে বলল রানা। এগিয়ে এল রয় সান্তানা—ওরই জানা আছে ভাল। আবার পাঁচ সেকেন্ড একদৃষ্টে নক্সার দিকে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করল, 'এই সেল ব্লক পশ্চিমে খালি কেন? কি আছে ওদিকটায়?'

'সমুদ্র। দেখছেন না, কেমন স্যাঁৎসেঁতে হয়ে আছে ঘরটা?'

'এখান থেকে সরাসরি সমুদ্রে বেরোবার কোন পথ নেই? ভ্যাকিয়ুম টিউব বসাবার সময় ব্যবহার করেছেন, এমন কোন পথ?'

কয়েক মুহূর্ত ভ্রূ কুঁচকে চুপ করে থাকল সান্তানা, তারপর অনেকটা আপন মনেই বলল, 'টেরিফিক প্রেশার হবে। সেবলের কাছে যা বারুদ আছে তাই দিয়ে ধসিয়ে দেয়া অসম্ভব নয়। উইক পয়েন্ট আছে ওটার। ইচ্ছে করেই অ্যাকসেস ডোরটা শোলডারিঙের সময় দুর্বল রাখা হয়েছিল, কবির চৌধুরীর নির্দেশে। মাই গড!' হঠাৎ গলার স্বর চড়ে গেল ওর কয়েক পর্দা। 'আমাদের

বলা হয়েছিল, যদি কখনও আবার দরকার হয়, সেইজন্যে পাকাপাকিভাবে বন্ধ করা হচ্ছে না দরজাটা! জেসাস! আসলে ডুবিয়ে মারবে ও আমাদের! আমাদের প্রয়োজন ফুরোলেই লিম্পেট মাইনটা ফাটিয়ে দেয়ার প্ল্যান ছিল ওর আসলে। নিজের হাতে ফিট করেছিলাম আমি মাইনটা। একটা বোতামে চাপ দিলেই শেষ হয়ে যাব আমরা সব!'

'তার আগে আমরাই ফাটাব ওটাকে,' বলল রানা। 'এখন ও ব্যস্ত আছে অন্য কাজে। যা করার জলদি করতে হবে আমাদের।'

'কি করব?' সমবেত কণ্ঠে প্রশ্ন করল কয়েকজন। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওদের মুখের রঙ।

'মরার ভয় দূর করুন প্রথমে। প্যাঁকে পড়েছি যখন, যেমন খুশি তেমনিভাবে মারতে পারে ও আমাদের। যদি প্যাঁকেই রয়ে যাই, মারবেও। ভেন্টিলেশন যদি ক্লোজ করে দেয়, কি করবেন দম আটকে মরা ছাড়া?'

'সত্যিই তো, কি করব?'

'দুটো রাস্তা আছে।' ছাতের দিকে চাইল রানা। অস্বাভাবিক উঁচু ছাত। কম করে হলেও বিশ ফুট হবে। ঠিক মাঝখানটায় দুইফুট ব্যাসের একটা বৃত্ত দেখা যাচ্ছে। ভেন্টিলেশন শ্যাফ্‌টের চোঙ একটা।

রানাকে ওপর দিকে চাইতে দেখে নক্সা-শিল্পী বলল, 'ওটার কথা ভেবে দেখেছি আমরা কয়েক মাস আগেই। ওই পথ দিয়ে টানেল ধরে মনিটর বাঁচিয়ে এই গোলক ধাঁধা থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব—যদি অস্ত্র থাকে। অস্ত্র আছে এখন আমাদের কাছে কিন্তু চিন্তা করে দেখুন, ওই উঁচুতে পৌঁছতে হলে একমাত্র পথ হচ্ছে একজনের কাঁধে আরেকজন, তার কাঁধে আরেকজন এই ভাবে উঠে যাওয়া। সবাইকে বের করে দেয়া যায় এইভাবে, কিন্তু বাকি ক'জন? যারা কাঁধ দিয়ে সাহায্য করল সবাইকে ওপরে উঠে যেতে, তারা বেরোবে কি করে?'

'ঠিকই বলেছেন,' বলল রানা। 'অন্তত বিশজনকে দাঁড়াতে হবে নিচে আর সবাইকে পার করতে হলে। এরা আর ওই পথে বেরোতে পারছে না। কিন্তু আবার সমুদ্র পথে যদি বেরোবার চেষ্টা করা যায়, যাদের রিব্রিদার নেই তারা সব মারা পড়বে। কাজেই দুইভাগ হয়ে গিয়ে দু'দিক থেকেই বেরোব আমরা—কেউ পড়ে থাকব না এখানে। বুঝতে পেরেছেন? দুই দলের ওপর দুই ধরনের দায়িত্ব থাকবে। যারা ভেন্টিলেশন টানেল বেয়ে উঠবে তারা পঁচিশটা সাব-মেশিনগান পাচ্ছে, কোথাও বাধা পেলেই গুলি ছুঁড়ে পথ করে নিতে পারছে—কাজেই আশা করা যায় উঠে যেতে পারবে তারা ওপরে। তাদের কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটা স্পীডবোট, হাইড্রোফয়েল, বার্জ দখল করে স্টার্ট দিয়ে বাকি ক'জনের জন্যে অপেক্ষা করা। আর যারা সমুদ্রপথে বেরোবে তাদের কাজ হচ্ছে পি এইচ ও মিসাইল ব্রেনটা দখল করে নিয়ে ওপরে ভেসে ওঠা। একটা আন্ডার-ওয়াটার স্লেডে করে ওটাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে ওরা সাবমেরিনের উদ্দেশে। সঙ্গে গার্ড আছে। যুদ্ধ করে কেড়ে নিতে হবে

আমাদের ব্রেনটা।' সবার মুখের দিকে চাইল রানা। 'আমি যাচ্ছি সমুদ্রপথে। আমার সঙ্গে কারা কারা যাবেন হাত তুলুন।'

প্রথমেই হাত তুলল রয় সান্তানা। দেখাদেখি ওর দলের আর সবাই তুলল হাত। শুরু হয়ে গেল কাজ।

স্টোর থেকে যতগুলো দরকার ফ্লিপার, ছোরা আর সিওটু গান বের করে নেয়া হলো। খুঁজতে গিয়ে গোটা কয়েক কমপ্রেস্‌ড্ এয়ার-স্পীড প্যাকও পাওয়া গেল। এদিকে বিস্ফোরণের ব্যবস্থায় লেগে গেছে সান্তানা আর সেব্‌ল্, ওদিকে সাবমেশিনগান পিঠে ঝুলিয়ে টপাটপ একজনের পর আরেকজন উঠে যাচ্ছে ওপরে, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ভেন্টিলেশন শ্যাফটের চোঙের ভিতর। শেষের দিকে সমুদ্রপথযাত্রীদের দাঁড়াতে হলো কাঁধ দেবার জন্যে—চারজন মেঝের ওপর, তাদের কাঁধে তিনজন, সেই তিনজনের কাঁধে দু'জন, এবং শেষজন তাদের কাঁধে। পিরামিডের মত। এইভাবে মুখোমুখি দুই সারিতে দাঁড়িয়ে দু'দিক থেকে চার হাত-পা ধরে টেনে তুলে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে এক এক জনকে গর্তের মুখে।

সবাইকে পার করে দিয়ে নিজেরা তৈরি হয়ে নিল ওরা একুশজন। চারভাগে ভাগ হয়ে ঢুকে পড়ল চারটে স্টোর রূমে।

'প্রচণ্ড চাপ হবে কিন্তু পানির,' বলল রানা। 'প্রথমটায় হতবুদ্ধি হয়ে যেতে হবে আমাদের সবাইকে। তারপর যত শীঘ্রি সম্ভব সামলে নিয়ে ছুটব আমরা সামনের দিকে। কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে সাবমেরিনটা, খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না। নিন, তৈরি হয়ে নিন সবাই।'

'সবাই রেডি?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল রয় সান্তানা।

রানা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিতেই ফাঁৎ করে ম্যাচ জ্বেলে ধরিয়ে দিল সলতের গায়ে, তারপর একলাফে চলে এল রানার পাশে, স্টোর রূমের ভিতর।

চোদ্দ

বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই হড়হড় করে টন-কে-টন পানি এসে ঢুকল সেল ব্লকের মধ্যে। স্টোররূমের ভিতর থাকায় আসল ধাক্কাটা যদিও এড়ানো সম্ভব হলো, নকল ধাক্কাও আসলের চেয়ে কোনদিক থেকে কম গেল না। রানার মনে হলো চাপের চোটে ভেঙে যাবে ওর হাড়গোড়। বিস্ফোরণের বিঙ্‌ঙ্ শব্দটা রয়ে গেছে কানের মধ্যে, সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে তীক্ষ্ণ ব্যথা। মনে হলো প্রচণ্ড ধাক্কা দিল কেউ ওর পিঠে, ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে ছুটল ওর দেহটা উন্মুক্ত অ্যাকসেস ডোরের দিকে। মস্ত একটা বেলুনের মত একরাশ বাতাস সাঁ করে উঠে গেল ওপর দিকে, গতি কমাবার চেষ্টা করল সে চার হাত

পায়ের সাহায্যে। নিচের দিকে চেয়ে দেখল পেছনে পেছনে উঠে আসছে বাকি সবাই, চেষ্টা করছে ঊর্ধ্বগতি রোধ করবার।

রয় সান্তানার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'আর ইউ অল্ রাইট, লীডার? দেখতে পাচ্ছেন সাবমেরিনটা?'

ডান পাশে চাইতেই রুপোলী সাবমেরিনটা দেখতে পেল রানা। স্থির হয়ে বসে রয়েছে সাগরের নিচে। বিশ-পঁচিশ জন লোক দেখতে পেল সে, স্লেড নিয়ে প্রায় পৌঁছে গেছে সাবমেরিনের কাছে। প্রত্যেকের ওপর কমপ্রেস্ড এয়ার প্যাকের সিলিন্ডার, কিন্তু ব্যাটারিচালিত স্লেডকে ঠেলতে হচ্ছে বলে চলছে ওরা অপেক্ষাকৃত শ্লথ গতিতে।

'আমরা সাতজন চললাম আগে,' বলল রানা মাউথপিসে। 'স্লেডের কাছে পৌঁছেই আমরা সবাই কমপ্রেস্ড্ এয়ার প্যাক খুলে ফেলে দেব। ফলে সিলিন্ডারওয়ালা যাকে পাওয়া যাবে তাকেই খুন করতে পারব আমরা নিশ্চিন্তে—সেইম সাইড হয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। বাদ বাকি সবাই আসুন পেছনে পেছনে।'

ছোট্ট একটা চাবি ঘোরাতেই দ্বিগুণ হয়ে গেল সাতজনের চলার গতি। গোলাবর্ষণে উদ্যত মিগ টোয়েন্টিওয়ানের মত তেরছাভাবে নেমে আসতে শুরু করল ওরা। প্রত্যেকের হাতে সিওটু গান প্রস্তুত।

বিশগজের মধ্যে পৌঁছতেই টের পেয়ে গেল ওরা। প্রায় একই সঙ্গে ঝট করে চাইল সবাই ওপর দিকে। ওপরে এবং পেছন দিকে থাকায় আন্ডারওয়াটার কমব্যাটে অনেক সুবিধে হবে ওদের, জানে রানা, কিন্তু এই মুহূর্তে আরও একটা সুবিধের কথা ভেবে খুশি হলো সে মনে মনে—মাথার ওপর প্রখর রোদ থাকায় ওপর দিকে চাইলেই চোখ ধাঁধিয়ে যাবে ওদের, নির্ভুলভাবে লক্ষ্যস্থির করা সম্ভব হবে না।

কয়েক গজ ওপর থেকে বর্শাগুলো মেরেই বন্দুকটা ফেলে ডাইভ দিয়ে নিচে নেমে এল রানা। ডান হাতে হাঙর মারার ছোরা, বামহাতে স্টিলেটো। পিঠের ওপর থেকে এয়ার প্যাকের সিলিন্ডার ফেলে দিয়েছে সে। প্রথমেই একটা গার্ডের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিয়ে ওর সিওটু গান কেড়ে নিয়ে আরেকজনের কণ্ঠনালী ছিদ্র করে দিল সে। বাঁ পাশে চেয়ে দেখল, একজনকে জাপটে ধরে তার মাস্ক খুলে ফেলবার চেষ্টা করছে রয় সান্তানা। স্লেড ছেড়ে দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে গার্ডরা চারপাশে। রানার দলের বাকি সবাই পৌঁছে গেছে ইতোমধ্যে। একমিনিটের মধ্যে হুলস্থূল কাণ্ড বেধে গেল পানির নিচে। নিজের দলের একজনকে দেখতে পেল রানা, ঘাড়ের পেছন দিয়ে রেল ইঞ্জিনের মত রক্তের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তলিয়ে যাচ্ছে।

পাথুরে মাটির ওপর নেমে এল রানা। স্লেডের দুইপাশে সিওটু গানে বর্শা ফিট করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজন গার্ড। ওপর থেকে বর্শা লাগানো একটা সিওটু গান এসে পড়ল পায়ের কাছে। ছোরাটা ফেলে দিয়ে চট করে বসে তুলে নিল রানা ওটা, তারপর বসে থাকা অবস্থা থেকেই লাফ দিল ওপর দিকে মাটি

থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করে। কয়েকটা বুদ্বুদ দেখা দিল একজন গার্ডের হাতে বন্দুকের মাথায়। কাঁধের কাছে রাবার চিরে দিয়ে বেরিয়ে গেল বর্শাটা। তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা অনুভব করল রানা কাঁধে, ভেজা ভেজা ঠেকল—রক্ত না পানি বোঝা গেল না ঠিক। চট করে ঘুরেই পাঁচফুট দূরে দাঁড়ানো দ্বিতীয় গার্ডের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে টিপে দিল সে ট্রিগার, কারণ হিসেব করে দেখেছে সে, দ্বিতীয় বর্শা পুরে তৈরি হওয়ার আগেই পৌঁছে যাবে সে প্রথম জনের কাছে, কাজেই ট্রিগার টেপার আগেই দ্বিতীয়জনকে খতম করে দিতে পারলে বর্শার ভয় আর থাকে না। ঘ্যাচ করে বিঁধল রানার বর্শাটা ঠিক জায়গা মত। পেছন দিকে বাঁকা হয়ে গেল দ্বিতীয় গার্ড। ট্রিগার সে টিপল ঠিকই, কিন্তু রানার মাথার দুইহাত উঁচু দিয়ে চলে গেল বর্শাটা। এবার প্রথমজনকে সামলাবার জন্যে পাশ ফিরতেই প্রচণ্ড একটা আঘাত খেল সে কানের পাশে। বোঁ করে ঘুরে উঠল রানার মাথা। আবার চালাল গার্ড বন্দুকের বাঁট, ঠিক একই জায়গায়। রানার রিব্রিদার ধরে টানছে সে এবার, কনুই দিয়ে বার বার মেরে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে মাস্কের কাঁচ। বাঁ হাতে ধরা স্টিলেটো চালাল রানা অন্ধের মত। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে, লোকটার শরীরের কোথায় গিয়ে বিঁধছে ছুরিটা, আদৌ বিঁধছে কিনা, ঠিকমত ঠাহর করতে পারছে না রানা। যখন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল, দেখল অনর্থক মোরব্বা-কাচা করছে সে মরা লোকটাকে। মরে গেছে আগেই।

চারপাশে চাইল রানা। যুদ্ধ প্রায় শেষ। শত্রুপক্ষের বেশির ভাগই মারা পড়েছে, কয়েকজন রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়েছে, এখনও যে দু'একজন গার্ড রয়েছে, তাদের একেকজনকে ঘিরে ধরেছে তিন চারজন করে ডাইভার। সান্তানা ও তার চারজন সহকারী মিসাইল ব্রেনসহ স্লেডটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওপর দিকে। রানা ছুটল দলের কারও কোন সাহায্য দরকার কিনা দেখতে। চারপাশে মৃতদেহ, রক্ত, আর ঘোলা পানি দেখে বুঝতে পারল সে, যত শীঘ্রি সম্ভব কেটে পড়া দরকার এখান থেকে। রক্তের গন্ধ পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবে হাঙরের দল।

ওপরে উঠতে উঠতে হাঁক ছাড়ল রানা, 'কারও কোন সাহায্য দরকার?'

কোন জবাব এল না কারও কাছ থেকে। শত্রুপক্ষের দুটো লাশ নেমে গেল নিচে রানার গা ঘেঁষে। ওপর দিকে চেয়ে টের পেল সে, সবাই উঠে যাচ্ছে, কেউ কোথাও আর থেমে নেই। তার মানে সব বাধা দূর হয়ে গেছে, নাকি অনতিক্রম্য কোন বাধার আভাস পেয়ে ভাগছে সবাই? বেশ অনেকটা উঠে গেছে রয় সান্তানা আর তার চারজন সঙ্গী স্লেড নিয়ে। নিচে চেয়ে দেখল তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রুপোলী সাবমেরিনটা। কবির চৌধুরীর সঙ্গে ক্যাপ্টেনের কি কথাবার্তা হচ্ছে আঁচ করে নিয়ে মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে।

ঠিক এমনি সময়ে দেখতে পেল রানা সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। টাইগার শার্ক! এসে গেছে! একসঙ্গে দুটো! রাজকীয় চালে চলতে চলতে হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে

গেল একটার শরীরে। অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়ে গিয়ে কপ্ করে কামড়ে ধরল একজন ডুবন্ত লোকের হাত। সঙ্গেরটাও কম যায় না। সেও ছুটে গিয়ে একটা পা কামড়ে ধরল আরও কত লাশ রয়েছে, মনের সুখে খা যত খুশি, তা না, একটা নিয়েই কামড়াকামড়ি টানাহেঁচড়া শুরু করল দু'জনে মিলে। ভিতরে ভিতরে একবার শিউরে নিয়ে দ্রুত হাত-পা চালাল রানা ওপরে উঠে যাওয়ার জন্যে। ঠিক এমননি সময়ে কানে এল ওর ক্ষীণ একটা অপরিচিত কণ্ঠস্বর: 'বাঁচাও! হেল্প, হেল্প মি!'

রানা থেমে দাঁড়াতেই আরেকটা পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওর কানে। রয় সান্তানা। 'খবরদার! নামবেন না এখন! উঠে আসুন, লীডার! জলদি! নিচে শার্ক এসে গেছে···আরও আসছে!'

'প্লী···জ! প্লীজ হেল্প মি!'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ডিগবাজি খেয়ে নামতে শুরু করল রানা। বাঁ হাতে ধরা স্টিলেটোর দিকে চেয়ে হাসি পেল ওর। টাইগার শার্কের বিরুদ্ধে স্টিলেটো হচ্ছে সিংহের বিরুদ্ধে বানরের খামচি। কিন্তু উপায় কি? নিজেদের একজনকে এইভাবে ফেলে রেখে যেতে সে পারে না। হাঁক ছাড়ল, 'কোথায়? কোনদিকে আপনি?'

'হ্যামারহেড! হ্যামারহেডের পাশে।'

বিশগজ দূরে হ্যামারহেডটাকে দেখতে পেল রানা এবার। একটা মৃতদেহ ধারাল দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরে ওটাকে গিলে ফেলবার জন্যে কায়দায় আনবার চেষ্টা করছে মাথা ঝাঁকিয়ে। স্টিলেটো বাঁকিয়ে ধরে ছুটল রানা বাঁদিকে। হ্যামারহেড মনে করল ওর সঙ্গে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে আসছে আরেক হাঙর—পাঁই পাঁই ছুটল সে এঁকেবেঁকে।

পেট চেপে ধরে বাঁকা হয়ে কুঁকড়ে শুয়ে আছে একজন। কাঁচের ওপাশে চোখমুখ ব্যথায় বিকৃত। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে লোকটা একখণ্ড বড় পাথরের দিকে। মুহূর্তে বুঝে ফেলল রানা ব্যাপারটা। চট করে মাটি থেকে একহাত লম্বা একটা হাঙর-ছোরা তুলে নিল সে হাতে। কোপ দেয়ার ভঙ্গিতে চালাল সে ছোরাটা। অক্টোপাস একটা হাত কাটা পড়তেই আরও দুটো হাত আহত লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে সাপের ফণার মত বাঁকা হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড ওই রকম বিস্ময় বিমূঢ় ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থেকে সড়াৎ করে ঢুকে পড়ল বিশাল অক্টোপাসটা তার গর্তের ভিতর।

লোকটার জখম পরীক্ষা করে বুঝতে পারল রানা, বাঁচবে—অবশ্য যদি জীবন্ত অবস্থায় ওপরে ভেসে ওঠা সম্ভব হয়। পিঠের এমন একটা জায়গায় বিঁধে রয়েছে বর্শাটা যেখানে অভ্যন্তরীণ মারাত্মক কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। উপযুক্ত চিকিৎসা পেলে খুব সম্ভব বেঁচে যাবে। হ্যাঁচকা টান দিতেই খুলে এল বর্শাটা।

এদিক ওদিক চেয়ে একটা লাশের পিঠ থেকে কমপ্রেস্ড্ এয়ার প্যাক খুলে নিয়ে বেঁধে নিল রানা নিজের পিঠে, তারপরই বাঁ হাতে লোকটাকে

জড়িয়ে ধরে কমপ্রেস্‌ড্ এয়ার আর পায়ের ফ্লিপার দুটোর তাড়নায় উঠতে শুরু করল ওপর দিকে। ডান হাতে বাগিয়ে ধরে আছে সে ছোরাটা, সদা সতর্ক দৃষ্টি। প্রাণপণে চালাচ্ছে পা।

ওপরে উঠেই দেখতে পেল রানা একটা হাইড্রোফয়েলের ওপর স্লেডসহ ইলেকট্রোনিক ব্রেনটা তুলছে সান্তানা আর তার কয়েকজন সঙ্গী টানাহেঁচড়া করে। এত সূক্ষ্ম একটা জিনিস নিয়ে এরা সবাই মিলে যা করছে দেখলে নির্ঘাত হার্টফেল করত লি-বিউসের বৈজ্ঞানিকরা।

এদিকে বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ করতে করতে তীর থেকে এগিয়ে আসছে একটা হাইড্রোফয়েল। এরা স্টার্ট নেয়ার আগেই পৌঁছে যাবে। বাধা দেয়ার কেউ নেই। মুক্তি পেয়ে সব ডাইভার পালিয়েছে।

'বাজুকা!' চিৎকার করে উঠল রানা। 'আমাকে তুলবেন পরে। কেউ পারেন চালাতে? পেছনের ডেকে।'

'পারি,' উত্তর দিল রয় সান্তানা। এক লাফে চলে গেল সে পেছনের ডেকে।

প্রথমে আহত ডাইভার, এবং তারপর রানাকে টেনে তুলে ফেলা হলো হাইড্রোফয়েলে। ডাইভারদের নিজেদের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করতে দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে জানতে চাইল রানা, কি ব্যাপার। কেউ কোন উত্তর দেয়ার আগেই বুম করে ফুটল বাজুকা। ঝট্ করে চাইল সবাই অগ্রসরমান হাইড্রোফয়েলটার দিকে। চোখের সামনে চুরমার হয়ে গেল ওটা, দপ্ করে জ্বলে উঠল, পরমুহূর্তে তলিয়ে গেল নিচে।

'ওয়েল ডান!' ফিরে আসতেই পিঠ চাপড়ে দিল রানা রয় সান্তানার। 'একসেলেন্ট শট!'

কানে গিয়ে ঠেকল সান্তানার হাসি। হঠাৎ ডেকের ওপর চোখ পড়তেই মিলিয়ে গেল ওর মুখের হাসিটা। একলাফে চলে গেল সে আহত লোকটার পাশে। লোক না বলে একে ছোকরা বলাই উচিত। মাস্কটা খসিয়ে নেয়ায় দেখা যাচ্ছে বড়জোর আঠারো কি উনিশ বছর বয়স। জখমটা পরীক্ষা করেই উঠে দাঁড়াল সান্তানা। 'একেই তুলে আনতে নিষেধ করেছিলাম আমি আপনাকে! আমার ছেলে! হি ইজ মাই সান!' ঝাঁপিয়ে পড়ল সান্তানা রানার বুকের ওপর। দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল হাউমাউ করে। 'আজ থেকে আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে গেলাম, লীডার!'

একটা ফার্স্ট এইড বক্স জোগাড় করে ছোকরার জখম মেরামতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দু'জন ডাইভার। রানা চলে এল কন্ট্রোল ককপিটে। 'স্টার্ট বোথ' লেখা একটা সুইচ টান দিতেই চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন। ঠিক সেই সময়ে প্যানেলের একপাশে ফিট করা একটা ছোট্ট টিভি স্ক্রীনে ভেসে উঠল কবির চৌধুরীর মুখটা।

'ফিরে না এসে কোন উপায় নেই তোমার, মাসুদ রানা।' গমগম করে উঠল গম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'মিসাইল ব্রেনটা ফেরত না দিলে সোহানা চৌধুরীকে

তুলে দেব আমি লি স্যুর হাতে।'

চমকে উঠল রানা। সোহানা কি বেঁচে আছে তাহলে! বেল্টের লাল বোতামটায় চাপ দিল সে।

'মিথ্যে বলার আর জায়গা পাওনি, কবির চৌধুরী! লি-বিউসের বিস্ফোরণে মারা গেছে সোহানা আজ দশটার সময়।'

'ওকে আগেই ধরে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে।'

'মিথ্যে কথা!'

কবির চৌধুরীর ছবিটা সরে গেল স্ক্রীন থেকে। ঠিক তিন সেকেন্ড পর ফুটে উঠল পরিষ্কার সোহানার ছবি। একটা লম্বা টেবিলের ওপর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে সোহানা। নগ্ন। পাশেই একটা ডাক্তারী ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে কুৎসিত হাসি হাসছে একটা বেলমাথা চীনাম্যান। সোহানার বুকের ওপর ছুরি দিয়ে ছোট্ট একটা খোঁচা দিল লোকটা, দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরে মুখ বিকৃত করল সোহানা, ধনুকের মত বাঁকা হয়ে বুক বেয়ে নেমে এল একফোঁটা রক্ত। আবার শোনা গেল কবির চৌধুরীর গলা।

'ভীষণ কৌতূহল লি স্যুর। ও দেখতে চায় সত্যি সত্যিই মেয়েমানুষের হৃদয় বলে কিছু আছে কিনা। ব্রেনটা ফেরত দিলে, কথা দিচ্ছি, ছেড়ে দেব আমি সোহানাকে। নইলে…'

'তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না আমি!' বলল রানা। 'এই মহিলা আর কেউ। সোহানা নয়। সোহানা মারা গেছে। মুখোশ। প্রফেসার ব্যান্ডের বাড়িতে আমার চেহারার একটা মুখোশ দেখেছি আমি। এটা সোহানার চেহারার অনুকরণে তৈরি মুখোশ পরা আর কোন মহিলা।'

'বোকার মত কথা বলছ তুমি, রানা। মুখোশ থাকলে মুখের ভাব পরিবর্তন সম্ভব নয়। তুমি দেখোনি…'

'ওসব ভাব-টাব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। তবে বেনিফিট অভ ডাউট পেতে পারো তুমি। আসছি আমি! কিন্তু মিসাইল ব্রেন নিয়ে নয়। একা। ব্রেন যেখানে আছে সেখানেই থাকবে আপাতত। আমি এদের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি, যে মুহূর্তে আমাদের দু'জনকে সুস্থ শরীরে মাহমুদ বেগের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে তীরের দিকে এগোতে দেখা যাবে, এরাও ধীরে ধীরে এগোবে তীরের দিকে। মিসাইল ব্রেন নামিয়ে দিয়ে উঠে পড়ব আমরা হাইড্রোফয়েলে।'

'যদি ব্রেন না নামিয়েই পালাবার চেষ্টা করো?'

'শূটিং রেঞ্জের মধ্যে অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে তোমার লোক। আমরা কোনরকম চালাকির চেষ্টা করলেই গুলি করে মেরে ফেলবে আমাদের। আর তোমরা যদি চালাকির চেষ্টা কর মিসাইল ব্রেন নিয়ে চলে যাবে আমার লোকেরা।'

'ফেয়ার এনাফ।' বলল কবির চৌধুরী। 'ঠিক আছে, এসো তুমি। আমি অপেক্ষা করছি।'

পনেরো

'মেইন গট্ (মাই গড)! তুমিও এদের দলে!'

প্রফেসার ব্র্যান্ডের কাঁপা গলা শোনা গেল কাঁচের ওপাশ থেকে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছেন তিনি ফ্রলিনের দিকে ওকে প্যাট্রিসিয়া মনে করে।

ওয়াইন ক্যাবিনেটের মধ্যে দিয়ে মই বেয়ে নিচে নেমেই ঘাড়ের পেছনে পিস্তলের ঠাণ্ডা নলের স্পর্শে টের পেয়েছে রানা, বন্দী করা হয়েছে ওকে। পিস্তলধারিণী আর কেউ নয়, ফ্রলিন লটেনবাক। লিফটে করে নামিয়ে আনা হয়েছে ওকে আনব্রেকেবল্ গ্লাস দিয়ে তৈরি মেইন কন্ট্রোল রুমের বাইরে। লিফটের দরজা খুলে যেতেই আঁৎকে উঠে চেঁচিয়ে উঠেছেন প্রফেসার ব্র্যান্ড।

পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে আছে কবির চৌধুরী আর প্রফেসার আর্থার ব্র্যান্ড। একটা স্ক্রীনে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সাবমেরিনটাকে। আরেকটায় হাইড্রোফয়েলের স্পষ্ট ছবি—ডাঙার দিকে মেশিনগান তাক করে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে রয় সান্তানা। কাঁচের এপাশে, লিফট থেকে বিশফুট মত দূরে একটা টেবিলের ওপর হাত-পা বাঁধা সোহানা। তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে লি স্যু—হাতে স্ক্যালপেল।

ঘাড়টা একবার এপাশ থেকে ওপাশে ফিরিয়ে সবই দেখল রানা, কিন্তু মনটা রয়েছে ওর প্রফেসারের এইমাত্র উচ্চারণ করা কথা ক'টায়। তাহলে কি ফ্রলিনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানা নেই প্রফেসারের? এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করতে পারে, কাজেই ব্যাপারটা একটু বুঝে নেয়া দরকার।

'ও আসলে ট্রিসা নয়, প্রফেসার!' বলে উঠল রানা। মনে মনে প্রার্থনা করল যেন বুড়ো শুনতে পায় ওর কথা। 'ট্রিসার যমজ বোন, ফ্রলিন লটেনবাক। ওর কথা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার, প্রফেসার? ট্রিসাকে যখন আপনি পালক-কন্যা হিসেবে নিয়েছিলেন, তখন আপনার ধারণা ছিল বাংকারের ওপর বোমা পড়ায় মারা গেছে ওর বাবা আর বোন। পরে নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিলেন যে মারা যায়নি ওরা?'

শুনতে পেয়েছেন প্রফেসার রানার কথা। ঝট করে মাথা তুলে চাইলেন তিনি রানার দিকে। কাঁপা গলায় বললেন, 'হ্যাঁ। সব মনে আছে। কিন্তু ট্রিসাকে কোনদিন জানতে দিইনি আমি এসব কথা। জানতে দিইনি যে ও আসলে লটেনবাকের মত একজন বিকৃতমস্তিষ্ক পথভ্রষ্ট বৈজ্ঞানিকের মেয়ে। আমার নিজের মেয়ের মত মানুষ করেছি আমি ওকে। নকল বার্থ-সার্টিফিকেট জোগাড় করে নিতে সে সময়ে আমার তেমন কোনই অসুবিধে হয়নি। কিন্তু একথা তুমি জানলে কি করে? কোথায় আমার প্যাট্রিসিয়া?'

এক সেকেন্ড দ্বিধা করল রানা খবরটা বুড়োকে দেয়া ঠিক হবে কিনা ভেবে, তারপর সিদ্ধান্ত নিল—বলাই উচিত। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এখন, প্যাট্রিসিয়াকে বাঁচাতে গিয়েই এদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছেন প্রফেসার। ওর ক্ষতি করবার হুমকি দেখিয়েই তাঁকে বশে এনেছে কবির চৌধুরী। দুঃসংবাদটা দিলে বুড়ো আঘাত পাবেন ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুক্ত হয়ে যাবেন কবির চৌধুরীর নাগপাশ থেকে।

'ট্রিসা মারা গেছে, প্রফেসার,' বলল রানা। 'প্রয়োজন ফুরোতেই খুন করেছে ওরা ওকে।'

'মারা গেছে! ট্রিসা! আমার ট্রিসা মারা গেছে···খুন···' মাতালের মত টলে উঠলেন বৃদ্ধ। চোট খেয়ে লোকটা হার্টফেল না করে, সেই ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রানা মনে মনে।

'লি স্যু, থামাও তো গর্দভটাকে।' গর্জে উঠল কবির চৌধুরী। 'মুখ বন্ধ করো ওর।'

ঝট করে লি স্যুর দিকে ফিরল রানা। বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছে লি স্যুর ঠোঁটের কোণে। কিভাবে রানার মুখ বন্ধ করতে হবে ভাল করেই জানা আছে ওর। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ছটফট করে উঠল সোহানা। গাল দুটো কুঁচকে গেছে ব্যথায়। ঠোঁট কামড়ে ধরে আটকে রেখেছে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। পাকা শিল্পীর মত যেন তুলি বুলোচ্ছে, এমনি ভঙ্গিতে আলতো করে ছুরিটা ধরে নিজের নামটা লিখতে শুরু করেছে সে সোহানার তলপেটে। আঁচড়ের সঙ্গে সঙ্গেই সরু রক্তের রেখা দেখা দিচ্ছে একের পর এক। শরীরের সমস্ত পেশী শক্ত হয়ে উঠল রানার। এক্ষুণি তিন লাফে লি স্যুর কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করবে রানা টের পেয়ে কথা বলে উঠল ফ্লিন।

'এক পা সামনে বাড়ালেই মারা পড়বে, মাসুদ রানা। তুমি আমার পিতৃহন্তা। বাধ্য কোরো না আমাকে। খুশি মনে ট্রিগার টিপব আমি।'

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাওয়ার ভঙ্গি করল রানা, যেন ত্যাগ করেছে সামনে ঝাঁপ দেয়ার মতলব। কবির চৌধুরীর দিকে ফিরল সে। আলগোছে টেবিল টেনিস বলের মত দেখতে গ্যাস-বম্বটা বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। বলল, 'এসবের কি অর্থ, কবির চৌধুরী? ইলেকট্রোনিক ব্রেনটা তোমার দরকার নেই?'

'আছে।' জবাব দিল কবির চৌধুরী। 'কিন্তু তার জন্যে তোমাদের ছেড়ে দেয়ার কোন দরকার নেই। এক্ষুণি দেখতে পাবে, চলতে শুরু করবে সাবমেরিন। আস্তে করে ডুবিয়ে দেয়া হবে হাইড্রোফয়েলটা। তারপর ব্রেনটা সাবমেরিনে তুলে নিতে কোনই অসুবিধে হবে না আমাদের।'

'তাহলে আমাকে ডেকে আনার কি অর্থ?'

'এখনও বুঝতে পারোনি?' হা হা করে হেসে উঠল কবির চৌধুরী। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল আবার। 'তোমার মৃত্যু দেখতে চাই আমি, রানা। নিজের চোখে। অনেক জ্বালাতন করেছ তুমি আমাকে গত কয়েকটা বছর।

যতবারই তোমার সাথে টক্কর লেগেছে আমার, দেখেছি, তোমার চেয়ে শতগুণ বেশি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পরাজয় হয়েছে আমার, ধ্বংস হয়ে গেছে আমার মহামূল্যবান সব সাধনার ধন। এবার তাই তোমাকে এড়িয়ে চলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। হরেক রকম ফন্দি-ফিকির করে তুমি উস্কাবার চেষ্টা করেছ আমাকে, গায়ে মাখিনি। ভেবেছিলাম পাশ কাটিয়ে যাব এবার তোমাকে। কিন্তু নিজে থেকে গায়ে পড়ে আমার গর্তে ঢুকেছ তুমি। ইতিমধ্যেই অনেক ক্ষতি করে দিয়েছ আমার। এবার আমি সব কিছুর শেষ দেখতে চাই।'

বেপরোয়া হাসি হেসে উঠল রানা হঠাৎ। টিটকারির ভঙ্গিতে বলল, 'শেষে আবার গোল্লা খাবে না তো?' কথাটা বলেই আড়চোখে চাইল সে সোহানার দিকে। ইঙ্গিতটা ঠিকই বুঝেছে সোহানা। গ্যাসবম্বটাকে রসিকতা করে গোল্লা বলে ওরা অফিসের সবাই। সামান্য একটু মাথা নাড়তে দেখল রানা ওকে। দেখল লম্বা করে দম নিল সে একটা। রানা নিজেও দম নিয়েছে মস্ত একটা। দমটা আটকে রেখেই সবার অলক্ষ্যে পিংপং বলের গায়ে ছোট্ট একটা বোতামে চাপ দিল সে। অস্পষ্ট একটা হিস্ স্ স্ শব্দ করে অত্যন্ত দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে বিষাক্ত গ্যাস।

'না। এবার আর গোল্লা খাব না, রানা। এবার আমি এমন একটা জায়গায় রয়েছি যেখানে হাজার চেষ্টা করেও কিছুতেই ঢুকতে পারবে না তুমি। কোন ক্ষতি করতে পারবে না তুমি আমার। অথচ···আরে! কি হলো, ফ্রলিন!'

পাঁই করে ঘুরে এক থাবা দিয়ে কেড়ে নিল রানা ফ্রলিনের হাতে ধরা পিস্তলটা। বুকে হাত চেপে বসে পড়েছে ফ্রলিন ততক্ষণে, শুয়ে পড়ল এবার। বার কয়েক হাত-পা খিঁচিয়েই স্থির হয়ে গেল। ঝট করে পাশ ফিরেই গুলি করল রানা। প্রয়োজন ছিল না। চোখমুখ বিকৃত করে টলছিল লি স্যু, গুলি খেয়েই দড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর।

একছুটে সোহানার পাশে চলে এল রানা। লি স্যুর হাত থেকে খসে পড়ে যাওয়া ছুরিটা তুলে নিয়ে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে কাটতে শুরু করল সে ওর বাঁধন। সেই ফাঁকে চট করে চোখ তুলে দেখল ভয়ঙ্কর আকার ধারণা করেছে কবির চৌধুরীর মুখটা। জ্বলছে চোখজোড়া।

'এভাবে নিস্তার পাবে না তুমি, মাসুদ রানা!' দাঁতে দাঁত চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে, 'দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি!'

সামনে ঝুঁকে হাত বাড়াল সে একটা বোতামের দিকে। হঠাৎ খটাস করে প্রফেসার ব্র্যান্ডের ছড়িটা এসে পড়ল ওর হাতের কব্জির ওপর। চমকে উঠেই বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল কবির চৌধুরী ব্র্যান্ডের মুখের দিকে, কিন্তু সামলে নিয়ে বাধা দেয়ার আগেই বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরল প্রফেসার একটা লাল বোতাম। পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল কবির চৌধুরীর চেহারাটা। স্পীকারের মাধ্যমে ভেসে এল প্রফেসারের কাঁপা গলা: 'আঙুলটা সরাতে বাধ্য কোরো না আমাকে, চৌধুরী। তুমি জানো, বোতাম ছেড়ে দিলেই ধ্বংস হয়ে যাবে সবকিছু, মায় তোমার এত সাধের

সাবমেরিনটাও।'

হাতের বাঁধন মুক্ত হতেই উঠে বসল সোহানা, ডানপাশে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে একটা চেয়ারের ওপর থেকে তুলে নিল জামাকাপড়গুলো। পায়ের বাঁধন মুক্ত করেই টেনে নামাল ওকে রানা টেবিল থেকে, ঠেলে নিয়ে চলল এলিভেটরের দিকে।

'জলদি করো, ইয়ংম্যান!' বললেন প্রফেসার ব্যান্ড। 'আর বেশিক্ষণ টিপে রাখতে পারব না বোতামটা। যত তাড়াতাড়ি পারো বেরিয়ে যাও প্রাসাদ ছেড়ে—সব ধসে পড়বে আমি এই বোতামটা ছেড়ে দিলেই।' তাহলে প্রফেসারের ভাগ্যে কি হবে ভেবে রানা থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই ধমকে উঠলেন বৃদ্ধ। 'তোমাকে যা বলছি তাই করো হে, ছোকরা! আমার জন্যে ভাবতে হবে না তোমাকে। এই কাঁচের ঘরটা ধ্বংস হবে না কোন অবস্থাতেই। পরে মাটি খুঁড়ে বের করতে পারবে আমাদের।' হঠাৎ গলার স্বর পরিবর্তন হয়ে গেল প্রফেসারের। 'সাবধান! ওয়াচ আউট! তোমার পেছনে!'

এক ধাক্কায় সোহানাকে লিফটের ভিতর পাঠিয়ে দিয়ে এক হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হয়ে গেল রানা। সেই অবস্থায় বিদ্যুৎবেগে পেছন ফিরেই গুলি করল। জিমি ক্লিদারো। গর্জে উঠল জিমির হাতের রিভলভারটাও। প্রায় একই সঙ্গে গুলি করেছে দু'জন। প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে কেঁপে উঠল রানার শরীরটা। হাত থেকে ছিটকে মেঝেতে পড়ল পিস্তলটা। বগলের দুই ইঞ্চি ওপরে ঢুকেছে গরম সীসা। মুহূর্তে অবশ হয়ে গেছে গোটা হাত। আঁধার দেখছে সে চোখে। ধড়াস্ আওয়াজ পেয়ে বুঝতে পারল মেঝেতে পড়ল ক্লিদারোর লাশ।

'আর পারছি না…বোতাম…জলদি!'

প্রফেসার ব্যান্ডের কণ্ঠস্বর শুনে সংবিৎ ফিরে পেয়ে টলতে টলতে ঢুকে পড়ল রানা লিফটের ভিতর। ওপরে উঠতে শুরু করল সেটা। ত্রস্তহাতে কাপড় পরে নিল সোহানা।

'বোকামি করছেন আপনি, প্রফেসার!' লিফটের ভিতরেও শোনা যাচ্ছে কবির চৌধুরীর কথাগুলো স্পীকারের মাধ্যমে! 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? বাজে লোকের একটা মিথ্যে কথায় কি পাগলামি শুরু করেছেন! মারা যায়নি ট্রিসা। মিথ্যে কথা বলেছে ও। ওকে সরিয়ে রেখেছি আমরা নিরাপদ দূরত্বে।'

'ভালই করেছ। যেটুকু দ্বিধা ছিল সেটুকুও দূর হয়ে গেল এবার আমার। মেয়ের জীবনের মায়া না করে কাজটা আগেই করা উচিত ছিল আমার। এখন যখন জানলাম হয় ট্রিসা মারা গেছে, নয়তো নিরাপদ দূরত্বে আছে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা কর্তব্য সম্পাদন, যাই বলো, করতেই হবে আমাকে।'

'এর ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে আমাদের, তা জানেন?'

'কিছু এসে যায় না। জীবনটা আসলে খুব একটা দামী কিছু নয়, চৌধুরী। ইস্স্ অবশ হয়ে আসছে…'

থামল লিফট। ছুটতে শুরু করল ওরা দু'জন। ডাইনিং হলে এসেই হাঁক

ছাড়ল রানা মাহমুদ বেগের উদ্দেশে: 'শিগ্‌গির বেরিয়ে আসুন। এক্ষুণি ধসে পড়বে বাড়িটা!'

নড়ে উঠল ঘরের কোণে দাঁড়ানো মূর্তিটা। পেছন থেকে বেরিয়ে এল ভীত সন্ত্রস্ত মাহমুদ বেগ আবার ছুটল ওরা। রানার হাত বেয়ে কলকল করে নেমে আসছে তাজা রক্ত, টপটপ ঝরছে আঙুলের আগা থেকে।

প্রাসাদ আর সমুদ্র তীরের মাঝামাঝি এসেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল ওরা মাটির ওপর। ভূমিকম্পের মত ঝাঁকুনি খেল গোটা সিসি এলাকাটা। গুড়ুম গুড়ুম মেঘ গর্জনের মত আওয়াজ হলো মাটির নিচে। প্রাসাদের একটা অংশ ধসে পড়ল প্রচণ্ড শব্দে। তারপরেই স্থির।

যেমন আকস্মিক ভাবে শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ থেমে গেল সব। একেবারে নিস্তব্ধ। যেন কিছুই হয়নি, যেন চিরকালই এমনি ভাঙা ছিল প্রাসাদটা।

উঠে দাঁড়াতেই আকাশের দিকে চোখ পড়ল ওদের।

'হেলিকপ্টার!' চেঁচিয়ে উঠল মাহমুদ বেগ।

টুলনের দিক থেকে সার বেঁধে বিশ-ত্রিশটা হেলিকপ্টার এগিয়ে আসছে এইদিকে। টপাটপ নামতে শুরু করল ওগুলো এখানে-ওখানে সেখানে। রানাদের সবচেয়ে কাছে যেটা নামল তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন ফিলিপ কার্টারেট। তার পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলেন—আরে, স্বপ্ন দেখছে নাকি রানা।—মেজর জেনারেল রাহাত খান!

রানা লক্ষ করল, উদ্বেগ ভারাক্রান্ত মুখ নিয়ে নামলেন মেজর জেনারেল প্লেন থেকে। কয়েক পা এগিয়েই রানা ও সোহানা দু'জনই বেঁচে আছে দেখতে পেয়ে মুহূর্তে উড়ে গেল তাঁর চেহারা থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তার ছাপ। হাসি হাসি হয়ে উঠল মুখটা। কিন্তু আরও কয়েক পা এগিয়েই, যাতে কোনরকম দুর্বলতা প্রকাশ না পেয়ে যায় সেজন্যে, কঠোর করে ফেললেন তিনি চোখমুখ। আর কয়েক কদম এগিয়ে রক্ত দেখতে পেলেন তিনি রানার হাতে। মুহূর্তে স্পষ্ট উদ্বেগ ফুটে উঠল আবার বৃদ্ধের চেহারায়, নিজের অজান্তেই প্রায় দৌড়ে ছুটে এলেন তিনি রানার সামনে। বোঝার চেষ্টা করছেন জখমটা ঠিক কতখানি মারাত্মক।

বুঝল রানা সবই। মনে মনে হাসল সে। কিন্তু মুখটা নির্বিকার রেখে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল কড়া এক ধমকের প্রতীক্ষায়।

* * *